তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যম্ | ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট | কলিকাতা-৭৩

গল্প ক্রম :

নারী বিচিত্ররূপিণী। সেই বিচিত্ররূপিণী নারী-হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালবাসা, এমন কি যা রমণীয় আর যা পঙ্কিল তা সবই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই গ্রন্থের গল্প ক'টির মধ্যে উন্মোচিত হয়েছে। 'বিচিত্ররূপিণী' গ্রন্থকে জীবন-সন্ধানী শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহের নামান্তরও বলা যায়। —সম্পাদক

হিন্দু আমলের অক্ষয়পুণ্য-মহিমান্বিত একটি স্নানঘাট। গঙ্গা এখানে দক্ষিণ-বাহিনী। রাঢ়ের বিখ্যাত বাদশাহী সড়কটা বরাবর পূর্বমুখে আসিয়া এই ঘাটেই শেষ হইয়াছে।

সড়কটির দুই পাশে ঘাটের ঠিক উপরেই ছোট্ট একটি বাজার। বাজার মানে খান কুড়ি-বাইশ দোকান—খান কয় মিষ্টির, দুখানা মুদীর, ছ-সাতখানা কুমোরের—মণিহারী, পানবিড়ি তো আছেই ঘাটের একেবারে উপরে জন-দুই গঙ্গাফল, অর্থাৎ কলা ও ডাব বিক্রয় করে।

বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর সমাগমে ছোট বাজারটিতে তিলধারণেরও স্থান থাকে না। চীৎকারে, গুঞ্জনে সারা বাজারটা গম গম করে, যেন একটা মেলা। অস্তায়মান সূর্যের সঙ্গে যাত্রীরা যে যাহার পথে চলিয়া যায়। অন্ধকার জনহীন বাজার খাঁ-খাঁ করে। তখন দু-দশজন আগন্তুক যাহারা আসে—তাহারা শ্রান্ত শব-বাহকের দল। শব সংকার করিয়া ভাগ্যহীনেরা ভাড়াটে ঘরের বারান্দায় আসিয়া দেহ এলাইয়া দেয়। ক্লান্তিতে, শোকে কেহ বা ঘুমায়, কেহ বা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়, ফোঁটাকয় জলও কাহারও চোখ হইতে হয়ত গড়াইয়া পড়ে। আকস্মিক দুই-চারিটা কথা মাঝে মাঝে উঠিয়া পড়ে, মৃত কিংবা মৃত্যুকে লইয়া। ঠিক যেন জলবুদ্বুদের মত, দুই-চারিটা পর পর উঠে, মিলাইয়া যায়, আবার নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ থম থম করে।

মোটকথা বাজারের কোলাহল তাহারা বাড়ায় না।

তখন যা-কিছু সাড়া, যা-কিছু চাঞ্চল্য, সে শুধু দোকান কয়টির। দোকানীরা আপন আপন দোকানে বসিয়া সমস্ত দিনের লাভ লোকসান কষে, মুখে হাসি-গল্প চলে, হাতে কাজ করিয়া যায়।

শেষ কার্তিকের একটি শীতকাতর সন্ধ্যা।

বিড়ির দোকানদার ছকু বিড়ি পাকাইতেছে। কোথাকার মেলা-ফেরৎ কালীচরণ আপন দোকান সাজাইতে ব্যস্ত। পাশে কুমোর বুড়ো কি একটা গড়িতেছিল, হাতে ময়দার মত মাটির নেচী। নেচী হইয়া উঠিল ডম্বরু। নিপুণ আঙুলের চাপে দেখিতে দেখিতে সেই ডম্বরুটির

প্রান্তে গড়িয়া তুলিল দুটি কান, মধ্যে লম্বা চেপ্টা মুখ, পিছনে বাঁকানো লেজ, নিচের দিকে চারটি পা। সমস্ত মিলিয়া হইয়া উঠিল একটি ঘোড়া। পাশের লম্বা পিঁড়িখানার উপর একটির পর একটি করিয়া পক্ষিরাজের বাহিনী সাজাইয়া তোলা হইতেছিল।

কুমোর বুড়োর দোকানের সম্মুখেই রাস্তার ওপর বামুনদের মেয়ে কুসুমের ঘর। আপন চালাঘরের বারান্দায় হ্যারিকেনের আলোয় মাদুর বুনিতে বুনিতে কুসুম গল্প করিতেছিল কুমোর বুড়োর সঙ্গে। মেয়েটি অল্পবয়সী, বেশ শ্রীমতী, কিন্তু ভাগ্য বড় মন্দ। তিনকুলে কেহ নাই, বাউণ্ডুলে স্বামী। মাদুর বোনা-ই বেচারীর জীবিকা। রোজই এমন গল্প চলে—সুখ-দুঃখের কথা, হাসির কথাও দুই-চারিটা হয়। এক-একদিন কুমোর বুড়ো উপকথা বলে, কুসুম কাজ করিতে করিতে হুঁ-হাঁ করিয়া যায়। কুমোড় বুড়ো থামিলে বলে—তারপর?

পাল বলে—তারপর বুড়ো কর্তার বকে বকে গলা শুকোয়, তার তামাক খেতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু নাতনীর তা সহ্য হয় না।

নাতনী কৌতুকে হাসিয়া উঠে।

ও-পাশে মুদীর দোকানে একটা দাবা টাকা লইয়া সেদিন বাজনা পরীক্ষা চলিতেছিল। খরিদ্দারের ভিড়ে কে কখন ঠকাইয়া গিয়াছে। পাশের দোকানীরা কেহ বলিতেছিল, চলিবে, কেহ বলিতেছিল, না। মুদী বার বার টাকাটা সজোরে আছড়াইয়া আওয়াজ বাড়াইতে চাহিতেছিল, কিন্তু সেটা ঠন করিয়া সাড়া আর দেয় না।

পাশের দোকানী বিড়িওয়ালা ছকুর বাবা দ্বিজদাস কহিল—ঠ্যাঙালে চীৎকার বেরোয়, সুর বের হয় না ভাই, ও তুমি গঙ্গার নামে খরচ লিখে হাত ধুয়ে বস।

দ্বিজদাসের কথাটা মুদীর ভালো লাগিল না। সে আপন মনেই গালি দিল বঞ্চককে—কোন্ শালা গঙ্গাতীরে এমন বঞ্চনা করে গেল বল দেখি—পুণ্যি করতে এসে?

রসান দিয়া দ্বিজদাস কহিল—ফস হাতে হাতে পেয়েছে·সে, টাকার ষোলো আনাই তার লাভ।

ওদিকে কান দিতে গেলে দুঃখের বোঝা ভারী হয়। মুদী শাপ-শাপান্ত করিয়া আত্মপ্রবোধ দিল,—যা—যা, গঙ্গাতীরে বঞ্চনা যেমন করলি, তেমনি নরকে যাবি, নরক হবে তোর। আমার না হয় ষোলো আনাই গেল।

আবার ক্ষণপরে কহিল—তা বারো আনায় চলে যাবে, রানীমার্কা বটে, কি বল দাস?

দাস নীরবে হাসিল, সেদিন তারও ঠিক এমনি হইয়াছিল।

সম্মুখে মেঘলা আকাশের বুক হইতে মাটির কোল পর্যন্ত অখণ্ড নিবিড় অন্ধকার। নিম্নে আপনার গর্ভে মৃদুস্বরা গঙ্গা রূপার পাতের মত চকচক করিতেছে। ঘাটের উপরই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটার কোনও কোটরে বসিয়া একটি পেঁচা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। তার তীক্ষ্ণ কর্কশ রবে সর্বাঙ্গ শিরশির করে।

গঙ্গার মৃদুধ্বনি ছাপাইয়া কখনও কখনও দাঁড় ছপছপ করিয়া নৌকা চলে কাটোয়ার বাজারের দিকে। নৌকার সঙ্গে চলে তার বুকের ক্ষীণ আলোক, গঙ্গার বুকে চলে তার তরঙ্গকম্পিত প্রতিবিম্ব। দূর শ্মশানঘাটে রোল শোনা যায়,—বল হরি, হরি বো—ল।

মুদী কহিল—আর এক নম্বর এল, দাস।

দাস গম্ভীরমুখে কহিল—খাতাটা কই রে ছকু?

ছকু খাতাখানা বাপের হাতে দিল। খাতা ল য়া দাস শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল।

শ্মাশান-ঘাট এবার দ্বিজদাস ডাকিয়া লইয়াছে। জমিদারকে বার্ষিক জমা দিতে হইবে এগারোশো টাকা—সে নিজে আদায় করে প্রতি শবে শ্মশান-জমা দু'টাকা এক আনা।

মুদী কহিল—তোদের কপাল ভালো রে ছকু। এবার আসছে খুব।

কথাটা ছকুর তত ভালো লাগিল না, সে উত্তর দিল না, বিড়ির তাড়াগুলো লইয়া অকারণে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ওপাশে কুমোর বুড়ো ঘোড়ার লেজ বাঁকাইয়া দিতে দিতে বলিতেছিল—আজকাল সবই উল্টো হয়েছে গো, আজকাল হয়েছে কি জান—

নাই ধন যার হরষ বদন সুখে নিদ্দে যাচ্ছে।

আছে ধন যার বিরস বদন ভাবনায় শির ফাটছে।

গল্প হইতেছিল ডাকাতির।

টানার সুতার ফাঁকে ফাঁকে মাদুরের পাতি সুকৌশলে পরাইতে পরাইতে কুসুম হাসিয়া কহিল—তাহলে পাল-কত্তা, বল রাত্রে ঘুমোও না?

পাল-কর্তা কোনো উত্তর দিবার আগেই ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া হঠাৎ কেনারাম চাটুজ্জে পিছনের অন্ধকার হইতে দোকানের আলোর সম্মুখে যেন উদয় হইয়াই কহিল—কি রে, কার ঘুম হয় না রে বাপু?

পাল কহিল—নাতজামাই যে! এস, এস। কবে এলে?

কুসুম অবগুণ্ঠনটা বাড়াইয়া দিল। কেনারামই কুসুমের স্বামী।

গ্রামে গ্রামেই বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু কেনারাম কাহারও কড়ি ধারে না, বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ সে। মাও নাই, বাপও নাই। বন্ধনের মধ্যে ওই কুসুম, সে বাঁধনও কেনারাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। আগে তবু ঘরে থাকিত, তখন সত্যকার একটি বন্ধন ছিল—তিন-চার বছরের কন্যা সন্ধ্যামণি। মাস তিনেক হইল মেয়েটির মৃত্যুর পর সে সব ছাড়িয়াছে। এ-পাড়ায় বড় একটা আসেও না, কুসুমকে একটা কথাও বলে না। কোথায় যায়—দশদিন বিশদিন কোথায় থাকে, আবার একদিন আসে।

পাল-কর্তার সাদর অভ্যর্থনায় চাটুজ্জে কান দিল না—কার ঘুম হয় না সে লইয়াও মাথা ঘামাইল না। ওদিকে কালীর দোকানে তখন তাহার নজর পড়িয়াছে, কালীকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল—আরে কালী যে! তুই কবে ফিরলি মেলা থেকে, এ্যাঁ?

দু'পা আগাইয়া কালীর দোকানে চাপিয়া বসিয়া আবার কালীকে প্রশ্ন করিল—তারপর মেলা কেমন দেখলি—বল দেখি? কই, বিড়ি দে রে বাপু।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে বিড়ি-দেশলাই টানিয়া লইল।

কালী সংক্ষেপে কহিল—বেশ মেলা, খুব ভিড়, বেচা-কেনাও বেশ।

ঠাকুর তখন সদ্য বিড়িটা ধরাইয়াছে, মুখে তার একরাশ ধোঁয়া। কেরোসিনের টবের আলমারিতে খালি সিগারেটের বাক্স সাজাইতে সাজাইতে কালী কহিল—এবার ওখানে মেলাতে বেশ্যে বসতে দিলে না, দাদাঠাকুর! তুলে দিলে সব।

চাটুজ্জের মুখের ধোঁয়াটা অকস্মাৎ হুস্ করিয়া বাহির হইয়া গেল, সে কহিল—সে কি রে—কে তুলে দিলে?

—গবরমেন্টার হতে সাহেব এসেছিল যে। দারোগা পুলিস চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন সব। তারাই দিলে। উঃ—দারোগাটা কী সাংঘাতিক মোটা, মাইরি! ঠিক যেন গঙ্গার শুশুক, বুঝলি ছকু?

কেনারাম নীরবে কি যেন ভাবিতেছিল, হঠাৎ কহিল—বসতে দিলে না?—কি হ'ল তাদের, কালী?

ওপাশে পালের গলা শোনা গেল—উঠলে যে ভাই নাতনী, এত সকালেই?

কুসুমের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ঠিক এই সময়টিতে সমস্ত বাজারটা হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। এমন হয়, বহু লোক, বহু কোলাহলের মধ্যেও এমন এক-একটি আকস্মিক নিস্তব্ধ মুহূর্ত আসিয়া যায়।

চাটুজ্জেই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল—তারা খুব গরিব, নয় রে কালী?

নতমুখে কালী কহিল—খু—ব।

ওপাশ হইতে ছকু ডাকিল—যাত্রা করতে হবে চাটুজ্জেমশায়—আমরা যাত্রার দল খুলছি।

চাটুজ্জে সাড়া দিল না।

ছকু আবার ডাকিল—শুনছেন দাদাঠাকুর?

বিরক্ত হইয়া চাটুজ্জে গঙ্গার ঘাটে অন্ধকারে গিয়া দাঁড়াইল।

কালী হাসিয়া কহিল—মেয়েগুলোর ভাবনা ভাবতে বসেছে।

একটা ইঙ্গিত করিয়া ছকু কহিল—এদিকে নিজের পরিবারের ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নাই!

মৃদুস্বরে কালী কহিল—কেন, পাল-কত্তা!

দু'জনেই হাসিয়া উঠিল।

চাটুজ্জে কিন্তু আবার তখনই ফিরিল—গালে হাত দিয়া বসিয়া মহা দুশ্চিন্তার সহিত সে কহিল—মেয়েগুলোর শেষ পর্যন্ত কি হ'ল কালী?

—আর দাদা, সেইখানে সব না খেয়ে শুকিয়ে বেচারীরা—

বাধা দিয়া ছকু কহিল— না দাদাঠাকুর, ও ফাজিলটার কথা শোনেন কেন? তাদের সব ভাড়া দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

চাটুজ্জে মহাখুশী। কহিল—না, সে বেশ হয়েছে, এ খুব ভালো বন্দোবস্ত হয়েছে। সায়েবের মাথা রে বাপু!—তারপর একগাল হাসিয়া বলিল—তুই কি যেন বলছিলি ছকু?

—আমরা যাত্রার দল খুলছি। হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান-মিলন পালা হবে, তোমাকে কিন্তু হরিশ্চন্দ্র সাজতে হবে।

অমনি গায়ের কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া লইয়া চাটুজ্জে কহিল

—হরিশ্চন্দ্র তো আমি সেজেই আছি রে, দেখবি!—শৈব্যা শৈব্যা, রোহিতাশ্ব রোহিতাশ্ব! কিন্তু খালি গায়ে যে শীত করছে রে!

—হ্যাঁ, বামুনের আবার শীত, বলে যার মুখের ফুঁয়ে আগুন! কিন্তু ও বক্তৃতায় তো হবে না দাদাঠাকুর, বই থেকে বক্তৃতা করতে হবে। এই দেখ বই কিনেছি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাটুজ্জে ছকুর মুখের দিকে একবার চাহিল। তারপর অল্প একটু হাসির সহিত কহিল—সত্যি বলছিস ছকু?

—কবে তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছি, বল তো?

—দে, তবে বই দে তোর। কি বক্তৃতা করতে হবে দেখি।

ছকু তাহাকে বইখানা আগাইয়া দিল। চাটুজ্জে বই লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা জুড়িয়া দিল—রাণী, রাণী, তুমি যে কখনও কোমল শয্যা ভিন্ন শয়ন কর নি, ও-হো-হো। বাপ রোহিতাশ্ব রে, সোনার পুতুল আমার—( রোহিতাশ্বের গলা জড়াইয়া ধরিলেন )।

ও পাশে কালী ভ্যাঙ্‌চাইয়া উঠিল—বাপ যুধিষ্ঠির রে, ( হনুমান কলা খাইতে লাগিলেন )।

এ পরিহাস চাটুজ্জে বুঝিল। বইখানা ছকুর দোকানে ফেলিয়া দিয়া সরোষে সে কহিল,—দেখ কেলে, তোর না হয় পয়সাই হয়েছে; তাই বলে লঘু-গুরু মানামানি নাই তোর?

কালী দমিল না, সে অঙ্গভঙ্গি করিয়া কহিল—ওয়ান মর্ণ আই মেট এ লেম ম্যান ইন এ লেন কোলোজ টু মাই ফারম।।

ইংরেজীর কথা উঠলেই চাটুজ্জে সদম্ভে এই লাইন ক'টি ঝর ঝর করিয়া আবৃত্তি করিয়া থাকে।

চাটুজ্জে আগুন হইয়া কহিল—আমি যদি বামুন হই তবে তোর—কি হবে জানিস?

—কি হবে শুনি?

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া চাটুজ্জে কহিল—জানি না, যা। আর সেখানে সে দাঁড়াইল না, হনহন করিয়া গঙ্গার ঘাটে নামিয়া গেল। কালীর পরিহাসটা তাহার বুকে বড় বাজিয়াছিল। যাইতে যাইতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই সে যেন কহিল—যা তুই বললি বললি, আমি শাপ দেব না তোকে। ফেটে মরে যাবি শেষে!

পাল-কর্তার মজলিশে তখন উপকথা জমিয়া উঠিয়াছে। কুসুম কখন আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছে কেহ লক্ষ্য করে নাই। উপকথা

বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাহাকে দেখিয়া পাল কহিল—এস এস, নাতনী এস! রাত বেশি হয় নি, বস। তুমি নইলে আসর জমছে না।

ভারী গলায় কুসুম উত্তর দিল—না কত্তা, দেহ বেশ ভালো নাই আমার।

তারপর অনাবশ্যকভাবে কৈফিয়ৎ দিয়াই যেন সে কহিল—আলোটা আবার নিবে গেল, তেল নিয়ে আসি।

নির্বাপিত হ্যারিকেনটা লইয়া সে ঘাটের নিকটবর্তী মুদীর দোকানটায় গিয়া উঠিল।

চাপা গলায় ছকু কালীকে কহিল—শরীর ভালো নাই। চাটুজ্জে আজ এ পাড়ায় এসেছে কিনা!

মালী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। দোকানে হ্যারিকেনটা নামাইয়া দিয়া কুসুম কহিল—এক পয়সার তেল পুরে দাও তো।

মাপের হাতলওয়ালা বাটিতে ভরিয়া তেল পুরিতে পুরিতে দোকানী কহিল—তেল যে রয়েছে গো।

কুসুম গঙ্গার ঘাটের দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, দাঁড়াইয়াই রহিল; কোনো উত্তর দিল না।

আলোর মুখটা লাগাইয়া দিয়া মুদী আবার কহিল—আলো জ্বেলে দেব, মা-ঠাকরুন?

সচকিত কুসুম কহিল—এ্যাঁ?

—আলো জ্বেলে দেব?

—না, থাক, বাড়িতে জ্বেলে নেব আমি। হ্যারিকেনটা লইয়া সে চলিয়া গেল।

পাল-কর্তার মজলিশে তখন পক্ষিরাজ ঘোড়া আকাশ-পথে উড়িয়াছে।

চাটুজ্জে ঘাট হইতে ফিরিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

ছকু তাহাকে ডাকিয়া কহিল—উঠে বসুন চাটুজ্জে মশায়। রাগ করলেন?

চাটুজ্জে কহিল—নাঃ, আর বসব না। ও পাড়ায় যাচ্ছি।

পাল তখন কহিতেছিল—পক্ষিরাজের পিঠে রাজপুত্তুর চড়লেন, আর পক্ষিরাজ শোঁ শোঁ করে আকাশে উড়ল—

চাটুজ্জের আর যাওয়া হইল না। তৎক্ষণাৎ পালের দোকানে ঢুকিয়া প্রতিবাদ করিয়া কহিল—বুড়ো বয়সে গঙ্গাতীরে বসে এত মিথ্যা

কথা কেন বল, বল দেখি? শোঁ শোঁ—করে আকাশে উড়ল। ঘোড়া আবার আকাশে ওড়ে!

ঘোড়ার কান গড়িতে গড়িতে পাল হাসিয়া কহিল—এস—এস ভাই নাতজামাই, এস। দে-রে দে, বসতে দে মোড়াটা। নাও তামাক খাও।

চাটুজ্জে মোড়ায় বসিল। ব্রাহ্মণের হুঁকায় কলিকা বসাইয়া চাটুজ্জের হাতে দিয়া পাল কহিল—তবে আর উপকথা কাকে বলেছে ভাই!

হুঁকা টানিতে টানিতে চাটুজ্জে কহিল—তাই বলে যত সব মিছে কথা বলতে হবে নাকি?

দড়ি-বাঁধা চশমার ফাঁক দিয়া চাটুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়া বুড়া কহিল—যত সব নাতি-নাতনীতে এসে ধরে, কি করি বল?

—তবে তুমি বল, যত পার—পেট ভরে মিছে কথা বল। হুঃ, ঘোড়া নাকি আবার আকাশে ওড়ে।

উপকথা আগাইয়া চলিল—প্রবালদ্বীপের চিলে-কোঠা দেখা যাইতেছে; রাজকন্যার এলানো চুল বাতাসে উড়িতেছে। পদ্মফুল-ভিজানো জলে স্নানকরা তাঁর চুলে উজাড় করা পদ্মবনের গন্ধ; সেই গন্ধে মৌমাছিরা দলে দলে চারিপাশে গুন গুন করিয়া বেড়ায়। উজান বাতাসে সে গন্ধ রাজপুত্রের বুকে আসিয়া পশিল। গন্ধে মাতাল রাজপুত্র বলেন, আরও জোরে পক্ষিরাজ, আরও জোরে।

হঠাৎ বাধা পড়িল ময়রা বুড়ীর হাসিতে—ও মাগো, এ-কে-গো! ই—হিঃ—হিঃ—হিঃ, কাতুকুতু কে দেয় গো!

কাতুকুতু যে দিতেছিল তাহারও সাড়া পাওয়া গেল—কেঁউ কেঁউ কুঁ-কুঁ।

একটা কুকুরছানা! কোথা হইতে আসিয়া সেটা বুড়ীর পিঠ চাটিতে শুরু করিয়া দিয়াছে!

বুড়ী চটিয়া আগুন, কহিল—আ-মর, মর মুখপোড়া কুকুর! আমি বলি কে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।

উপকথা ছাড়িয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া পাল কহিল—তাড়াও হে তাড়াও! দোকানে ঢুকলে সর্বনাশ হবে, ভেঙে ফেলবে। লাঠিগাছটা কই, লাঠিগাছটা?

বুড়ী খোঁজে ঝাঁটা, পাল খোঁজে লাঠি। চাটুজ্জে তাড়াতাড়ি

ছুঁকাটা নামাইয়া কুকুরছানাটিকে কোলে তুলিয়া লইল। তারপর আলোয় আনিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সেটাকে দেখিয়া কহিল—আরে তুই কোত্থেকে এলি? এ যে শ্মশান-ভৈরবীর বাচ্চা হ্যাদাটা! শ্মশান ছেড়ে এখানে কি করতে এলি মরতে? চল হতভাগা তোকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি। যত সব অখাদ্য কাণ্ড, হুঁঃ!—চাটুজ্জে উঠিয়া পড়িল।

পাল কহিল—শোন শোন, যেয়ো না। ডাকছে, তোমায় ডাকছে ও—।

সম্মুখে কুসুমের আলোকিত মুক্ত দ্বার, দুয়ারের কাছে মেঝেয় কুসুম দাঁড়াইয়া, চাটুজ্জে সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কুকুরছানাটা কোলে করিয়া পথের অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

পাল কহিল—শরীর খারাপ, বেশি রাত করে না; তুমি দোর দিয়ে শোও নাতনী।

কুসুম ততক্ষণ আলো হাতে বাহিরে আসিয়াছে। আবার সে বারান্দায় মাদুর বুনিতে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে।

পাল কহিল—শরীর খারাপ বলছিলে না নাতনী?

নতমুখে কুসুম কহিল—এটা কালই দিতে হবে কত্তা। গরিবের শরীর খারাপ হলে চলবে কেন বল? বল, তোমার উপকথা বল, কাজ করি আর শুনি।

কে একজন কহিল—কি যে করে গেল বামুন মা!

পালেদের ছিরু-চরণ কহিল—আহা সোনার প্রতিমা!

একজন কহিল—চাটুজ্জে তো ভালোই ছিল। মেয়েটি মরেই—

প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া পাল উচ্চকণ্ঠে কহিল—চুপ চুপ, সব চুপ কর। উপকথা শোন, হ্যাঁ তারপর হ'ল কি, পক্ষিরাজ এসে পড়ল আর কি, পা তার ছাদ ছোঁয় ছোঁয়—

কিন্তু একটা কলরোলের মধ্যে পালের কথাটা ঢাকা পড়িয়া গেল। দূরে শ্মশান-ঘাটে আবার রোল উঠিল—বল হরি—হরি বোল।

গঙ্গার তীরভূমির ঘন বন-সন্নিবেশের পশ্চিম পাড় ঘেঁষিয়া একটি স্বল্প-পরিসর পথ। পথটি গঙ্গার সহিত সমান্তরাল রেখায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে। স্নানঘাটের উত্তরে কিছু দূরে একফালি পায়ে-চলার পথ গঙ্গার গর্ভমুখে নামিয়াছে। ইহার দু'ধারে বুক-ভরা উঁচু আগাছার জঙ্গল। মাথার উপরে বড় বড় গাছের শাখা-প্রশাখা আকাশ ছাইয়া

ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্থানটার একটা তীব্র বিকট গন্ধে বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় খাইয়া উঠে।

দগ্ধ নরদেহের গন্ধ। এইটিই শ্মশান-ঘাট।

চাটুজ্জে উপর হইতে এই পথে নামিল।

খানিকটা আসিয়াই গঙ্গার কোলে এক টুকরা সমতল জায়গা পাওয়া যায়। একদিকে রাশীকৃত বাঁশ জড়ো হইয়া আছে ; পাশেই তালপাতার চাটাই ও কতকগুলা খাটিয়ার বোঝা। এখানে-ওখানে তুই চারিটা নর-কপাল পড়িয়া আছে, হাড়ের টুকরায় মাটির বুক আচ্ছন্ন।

একটু অগ্রসর হইয়া চাটুজ্জে একখানি জীর্ণ টিনের চালায় আসিয়া উঠিল। চালাটার উত্তর দিকে রাজ্যের ছেঁড়া বিছানা গাদা হইয়া আছে। মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ধুনি। ধুনিটার কোল ঘেঁষিয়া একটা খাটিয়ায় বিছানা পাতা, চালাটার কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো লম্বা তারে বাঁধা একটা হ্যারিকেন মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিমে বাঁশে-চাটাইয়ে তৈয়ারী একখানা ছোট ঘর।

নিচে গঙ্গার ঢালু বালুচরের উপর কয়টা শিখাহীন জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপ নিশীথ-অন্ধকারের বুকে ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে। মানুষের দেহ নিঃশেষে আহার করিয়াও আগুনের যেন তৃপ্তি হয় নাই—এখনও সে হা-হা করিতেছে। একটা নূতন চিতায় আগুন দেওয়া হইয়াছে। অগ্নিশিখা সবে আশেপাশে উঁকি মারিতেছে। সেই শিখার প্রভায় দেখা যাইতেছিল, রাশি রাশি ধূম পাক খাইয়া-খাইয়া উপরে উঠিতেছে, নিচে নামিতেছে। চিতার বুকে অনাবৃত একটি শিশুদেহ, বুকে তাহার একখানি কাঠ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শবটির মুখ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল—দশ-এগারো বছরের কচি মেয়ে। ছোট ছোট চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে—কতক তাহার পুড়িয়াছে—কতক এখনও পোড়ে নাই। শবের পায়ের দিকে একটা মানুষ একটা বাঁশের উপর ভর দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পুরা জোয়ান, নিকষকালো বর্ণ, মাথায় দীর্ঘ বাবরী-চুল অগ্নিতপ্ত বায়ুতাড়নায় মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

সে শ্মশান-প্রহরী চণ্ডাল।

চালার উপরে দাঁড়াইয়া চাটুজ্জে ডাকিল—পৈরু !

মুখ ফিরাইয়া সাগ্রহে পৈরু বলিল—ঠাকুর মহারাজ, আসেন আসেন। কবে আসলেন দেশে ?

—এই বিকেল বেলা রে। তারপর, ভালো আছিস তো ?

—আপনার কিরপা মহারাজ।

—ছেলে-পুলে তোর ?

—সবহি ভালো দেওতা।

কাপড়ে ঢাকা কুকুরছানাটাকে বাহির করিয়া চাটুজ্জে কহিল—আরে তোর ন্যাদা বাচ্চাটা যে বাজারে গিয়ে পড়েছিল। শেয়ালে নিত আর একটু হলেই—। গলা চড়াইয়া চাটুজ্জে হাঁকিল—ভৈরবী, ভৈরবী। কাল্লু। কাল্লু—মহাদেও।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের সেই চালা-ঘরটা হইতে একপাল কুকুর আসিয়া চাটুজ্জেকে ঘিরিয়া লেজ নাড়িতে শুরু করিল। একটা আবার চিৎ হইয়া শুইয়া থাবা দিয়া চাটুজ্জের পায়ে আঁচড়াইতে লাগিল।

কোল হইতে চাটুজ্জে ন্যাদাকে নামাইয়া দিল, সেটা লেজ নাড়িতে লাগিল। খুঁজিয়া বাছিয়া চাটুজ্জে ভৈরবীর কান মলিয়া দিয়া কহিল—মা হয়ে ছেলের খোঁজ নাই হারামজাদী!

ভৈরবী কাতর মৃদু আর্তনাদ করিল, যেন অপরাধের মার্জনা চাহিতেছে।

চাটুজ্জে হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া কহিল—যা যা, সব শুগে যা—খুব আদর হয়েছে। যা—সব যা।

কুকুরের দল তবুও যায় না।

পৈরু হাসিল—হঠাৎ কুকুরের দল চীৎকার করিয়া জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেল। পলায়নপর জন্তুর পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শৃগালের কর্কশ কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল—খ্যাক খ্যাক। টিনের চালায় খাটিয়াটার বিছানার ভিতরে কে যেন নড়িয়া উঠিল। কম্বলের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া একটি শিশু মুখ বাড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল—বাবা—এ—বাবা।

পৈরু উত্তর দিল—যাই, যাই হো মায়া,—ঘুম যাও—শো যাও হো বিটিয়া।

শিশুটি বিছানায় মুখ লুকাইল।

চাটুজ্জে কহিল—তোর সেই খুকীটা,—না রে পৈরু?

—হাঁ মহারাজ, কিছুতে ছাড়ল না হামাকে আজ।

চিতাটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পৈরু হাত-মুখ ধুইয়া উপরে আসিয়া কন্যাটিকে সযত্নে কম্বল ঢাকিয়া দিল। তারপর মাথার চুলগুলি তাহার হাতে করিয়া সাজাইয়া দিতে দিতে কহিল—বেটী হামার বহুত ভালা দেওতা, হামাকে বড়া পিয়ার করে।

চাটুজ্জে চিতার দিকে চাহিয়া ছিল, কথা কহিল না। বিড়ি বাহির করিয়া পৈরু কহিল—বিড়ি পিবেন মহারাজ ?

চিতার আগুনের পানে চাহিয়া চাহিয়া চাটুজ্জে কহিল—দে। ধুনির আগুনে বিড়ি ধরাইয়া চাটুজ্জে চিতার পানেই চাহিয়া রহিল।

পৈরু কহিল—থোড়া বসবেন মহারাজ ?

—হুঁ।

—তব, বসেন আপনি, হামি খাইয়ে লিই।

পৈরু একটা ঝাঁটা লইয়া ওই কুকুরের ঘরের মেঝেয় গিয়া ঢুকিল। চারিটা পাশ ময়লায় ভর্তি। তারই একটা প্রান্ত ঝাঁটা বুলাইয়া পৈরু জল ছিটাইয়া দিল। এবং ঐখানেই সে গামলা-ঢাকা খাবার লইয়া গিয়া বসিয়া পড়িল।

এদিকে জ্বলন্ত চিতাটা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছিল।

চাটুজ্জে কহিল—চিতাটা যে নিবে এল পৈরু, আগুর ঝাড়তে হবে।

খাইতে খাইতে পৈরু কহিল—যাই হামি মহারাজ।

—খাবার দেরি কত তোর ?

—দের থোড়া আছে। থাক, আমি যাই।

—থাক, তুই খা,—আমিই দিচ্ছি ঝেড়ে।

চাটুজ্জে কাপড় সাঁটিতে সাঁটিতে চড়ায় নামিয়া পড়িল।

পৈরু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল—না না দেওতা, বাড়ি যাবে তুমি। শীতকা রাত, আস্নান করতে হবে—।

অর্ধদগ্ধ শবটাকে নাড়াচাড়া দিতে দিতে চাটুজ্জে কহিল—তোর ওই ধুনির পাশেই শোব না হয় আজ।

একান্ত দুঃখের সহিত পৈরু কহিল—নেহি দেওতা, ই চণ্ডালকে কাম। হামার পাপ হোবে দেওতা—

—দূর বেটা। শিব নিজে একাজ করে জানিস ? তোরা হচ্ছিস নন্দীর বাচ্চা।

পৈরু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। বাহিরের পথের উপর হইতে কে তাহাকে ডাকিল—পৈরু!

তাড়াতাড়ি পৈরু বাহির হইয়া আসিল এবং আহ্বানকারীকে দেখিয়া একান্ত অপরাধীর মতই কহিল—মাইজী!

রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কুসুম।

কুসুম কহিল—একবার ডেকে দাও পৈরু।

পৈরু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—মহারাজ, মহারাজ, এ ঠাকুর-জী!

মহারাজ তখন চিতাগ্নিটাকে প্রজ্বলিত করিতে করিতে বক্তৃতা শুরু করিয়া দিয়াছে—শৈব্যা, শৈব্যা।

জোর গলায় পৈরু আবার ডাকিল—ঠাকুর-জী!

চিতাগ্নি হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহারই লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া পরমানন্দে চাটুজ্জে পৈরুকে ডাকিয়া কহিল—দেখে যা বেটা, দেখে যা, চিতা যার নাম, এ নইলে মানাবে কেন? জানিস পৈরু, এমনিধারা চিতা সারা দিনরাত যদি জ্বালিয়ে রাখতে পারিস—তবে ঠিক রাত্রে শ্মশান-কালীকে আসতে হবে। এ একটা যজ্ঞ রে!

পৈরু আবার ডাকিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুম বাধা দিয়া কহিল—থাক পৈরু, আমি খাবারটা দিয়ে যাই, তুমি খাইয়ো, বল না যেন আমি দিয়ে গেছি।

চালার একটা প্রান্ত কুসুম এক হাতে পরিষ্কার করিয়া লইল। তারপর অঞ্চলতলে ঢাকা খাবার, জলের ঘটি রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। পিছন হইতে পৈরু কহিল—সাথমে যাই হামি, মাইজী।

কুসুম একটু হাসিল, কহিল—না বাবা, তুমি যাও, খাবারটা হয়ত কিছুতে খেয়ে দেবে। আমি একাই যেতে পারব।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কুসুম ডুবিয়া গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পৈরু ফিরিল।

চিতাটা নাড়িতে নাড়িতে চাটুজ্জে কহিল—কি?

—হাত-মুখ ধুয়ে আসেন। বেশ জ্বলেছে উ।

—তোর হ'ল?

—হাঁ, আপনি শিগ্রি আসেন। ফেলেন, বাঁশ ফেলেন।

পৈরুর কণ্ঠস্বরে একটা দৃঢ়তা ছিল, চাটুজ্জে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না, উঠিয়া আসিল।

অঙ্গুলিনির্দেশে খাবার দেখাইয়া দিয়া পৈরু কহিল—ভোজন করেন।—হামি আনাইলাম গো ওহি চাষাদের ছোকরাকে দিয়ে।

পৈরুর মুখপানে চাটুজ্জে তাকাইয়া কহিল—কুসুম দিয়ে গেল, নয় পৈরু?

—হাঁ, এতনা রাতমে মাইজী আসবে হিঁয়া!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চাটুজ্জে খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে

সে কহিল—সত্যি বড় ক্ষিদে পেয়েছিল পৈরু, এই জন্মেই তোকে এত ভালবাসি।

পৈরু উত্তর দিল না, সে ভাবিতেছিল মাইজীর কথা। শ্মশানের চণ্ডাল সে, দুঃখের উচ্ছ্বাস সে অনেক দেখিয়াছে, বুক-ফাটা কান্না সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু দুঃখের এমন নীরব প্রকাশ সে আর দেখে নাই।

চাটুজ্জে আপন মনেই কহিতেছিল—আমাক আর কেউ ভালবাসে পৈরু, তুই ছাড়া?

পৈরুর মনে হইল, মাইজী যেদিন চিতায় চড়িবে সেদিন হয়ত বুকের জমা-করা কান্নায় চিতার আগুন জ্বলিবে না, নিবিয়া যাইবে।

চাটুজ্জে আবার কহিল—কুসুমও আমায় ভালবাসে পৈরু। কিন্তু —কথাটা তাহার অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

পৈরু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছিলেন মহারাজ-জী?

চাটুজ্জে উত্তর দিল না।

পৈরু ডাকিল—দেওতা!

চাটুজ্জে মুখ তুলিয়া চাহিল। চিতার দীপ্ত আলোকে পৈরু দেখিল চাটুজ্জের চোখ বাহিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। অপ্রস্তুতের মত চাটুজ্জে কহিল—মেয়েটাকে মনে পড়ে গেল পৈরু। কুসুমের কথা হলেই তাকে আমার মনে পড়ে যায়। জানিস পৈরু, কুসুমের মুখের দিকে চাইলে আমার কান্না পায়। মা-মণির, আমার সন্ধ্যামণির মুখ যেন ওর মুখের মধ্যে জ্বল জ্বল করে ভাসে।

পৈরুর চোখ দিয়াও এবার জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

চাটুজ্জে আবার কহিল—কিন্তু জানিস পৈরু, খুকুমণির জন্মে ওর একটুও দুঃখ হয় নি; ও তার জন্য কাঁদে না।

বাধা দিয়া পৈরু কহিল—মৎ বোল-না, ই বাত মৎ বোল-না, ঠাকুর-জী! মাইজীর আঁখের পানিতে দরিয়া বেড়ে গেল দেওতা। তুমহার আঁখ নেহি; তুমি দেখলে না।

সচকিতভাবে চাটুজ্জে পৈরুর মুখপানে চাহিয়া কহিল—সত্যি পৈরু?

দৃঢ়কণ্ঠে পৈরু কহিল—সামনা মে গঙ্গাজী যেমন সাচ মহারাজ, ই বাত হামার তেমন। ঝুট হোয় তো শিরমে হামার বাঁজ গিরবে, দেওতা।

কতক্ষণ পর চাটুজ্জে ধীরে ধীরে কহিল—লোকে কত কি বলে ওই বুড়ো পালকে নিয়ে; কিন্তু সে মিথ্যে, আমি জানি। কিন্তু কুসুম কাঁদে খুকুমণির জন্যে। সারাদিনই যে মাতুর বোনে ও, দিনরাতই যে ওর পয়সা-পয়সা!

পৈরু এ কথার কোনো জবাব দিল না।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রোল উঠিল—বল হরি, হরি বো—ল। নূতন কে মহাপথ-যাত্রী আসিল।

সে রোলের প্রতিধ্বনি বনে বনে, গঙ্গার বাঁকে বাঁকে ধ্বনিয়া দূর-দূরান্তে মিলাইয়া গেল। চকিত শৃগালের দল কলরব করিয়া উঠিল। গাছের মাথায় শকুনিরা পাখা ঝটপট করিয়া নড়িয়া বসিল।

টিনের চালায় মানুষ দুটি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। হাত-মুখ ধুইয়া চাটুজ্জে বিড়ি ধরায়, পৈরু শবের লকড়ি সংগ্রহ করিতে নিচে নামিয়া যায়।

নূতন কাঠ বহিয়া আনিয়া পৈরু আবার চিতা সাজাইল।

শববাহকের দল চিতায় শব তুলিয়া দিতে গেল।

পৈরু ডাকিল—ঠাকুর-জী!

কেহ উত্তর দিল না, চাটুজ্জে কখন চলিয়া গিয়াছে।

শবের কাপড় বিছানা ভাঁজ করিয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া পৈরু শবের পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাসমত বাঁশে ভর দিয়া পৈরু গঙ্গার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

—পৈরু!—চাটুজ্জে ফিরিয়া আসিল।

—মহারাজ!

—এ কেমন মড়া রে?

—ই যানেওলা হ্যায় মহারাজ,—সাদা মাথা।

চিতাটা জ্বলিয়া উঠিতেই পৈরু উপরে আসিয়া বসিল।

চাটুজ্জে চুপি চুপি কহিল—পৈরু!

—মহারাজ!

—কুসুম কাঁদছে। আমি শুনে এলাম চুপি চুপি গিয়ে।

চিতার আগুনে পৈরুর মুখখানি বেশ দেখা যাইতেছিল; সে মুখ তাহার হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কহিল—গঙ্গাজী সাচ হ্যায় দেওতা; ঝুটা তো নেহি। ধুনির পাশে একখানা কম্বল বিছাইয়া

চাটুজ্জে শুইয়া পড়িল; চিতাটার নির্বাণ অপেক্ষায় শ্মশানের বুকে চণ্ডাল জাগিয়া রহিল।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্নান-ঘাটের রূপ একেবারে পাল্টাইয়া গেছে। ঘাটে বাজারে লোক আর ধরে না। স্তব-গানের রোলে পাখীর কলরবও ঢাকা পড়িয়াছে। গঙ্গায় বুকে নৌকার মেলা; মহাজনী নৌকাগুলো উজানে গুনের টানে চলিয়াছে; জেলে-ডিঙিগুলা মোচার খোলার মত হেলিয়া দুলিয়া একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ওপারের খেয়াঘাটে যাত্রীর দল, মাল-বোঝাই গাড়ির সারি, গরু-মহিষের পাল আবার ভিড় করিয়াছে। পথের পাশে কানা-খোঁড়ার সারি বসিয়া গিয়াছে।

—অন্ধজনে দয়া কর রানী-মা!

—খোঁড়াকে একটা পয়সা দিয়ে যান মা!

একদল বাউল দুটি ছেলেকে রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। বাঁধা-ঘাটের পাশে পল্লীবাসিনীরা স্নান করিতেছে। কুসুমকেও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। ও-পাড়ার বিশ্বাস-গিন্নি, কুসুমের সই-মা, কুসুমকে দেখিয়া কহিলেন—তাই তো মা কুসুম, কাল বাড়ি এসে সব শুনলাম; এখানে তো ছিলাম না। কি করবি বল মা—গাছের সব ফুল ক'টি কি থাকে? মনে কর ও তোর নয়।

কুসুমের চোখ দিয়া দর দর ধারে জল গড়াইয়া পড়িল। চোখের জল মুছিয়া সে কহিল—ওকথা বল না সই-মা, সে আমার—সে আমার ছাড়া আর কারও নয়। সে আমার আবার ফিরে আসবে, দেখো তুমি, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কথা, সেই সব।

—তাই হোক মা, তাই হোক, আশীর্বাদ করি তাই হোক। সে তোর খেলতে গিয়েছে, আবার ফিরে তোর কোলে আসুক।

স্নান-ঘাটের মাথায় বসিয়া চাটুজ্জে ওপারের দিকে চাহিয়া ছিল; গত বছরে ওপারের সেই ভাঙনটা নামিয়া আসায় সেখানে নতুন চর জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে লাঙলের কল্যাণে শ্যামল ফসলে ভরিয়া গিয়াছে। কোনো একটা ফসলে ফুলও দেখা গিয়াছে।

চাটুজ্জে উঠিয়া বাড়ির দিকে চলিল।

দ্বিজদাসের দোকানে তখন অনেক ভিড়, সেখানে রাত্রের পাওনা-গণ্ডার হিসাব চলিয়াছে। মুদীর দোকানে কলাই না কিসের একটা ওজন হইতেছে—রামে-রাম—রামে-রাম—রামে-দুই—দুই রাম।

পাল-কর্তার দোকানে রঙ-বেরঙের পুতুলের সারি।

চাটুজ্জে কুসুমের দাওয়ায় গিয়া উঠিল। কিন্তু থমকিয়া সে দাঁড়াইল। দাওয়ার নিচে সন্ধ্যামণির একটা কচি-গাছ, সেটা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কুসুম বোধ হয় দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়াছিল, ঘর হইতে ডাকিল—এস।

চাটুজ্জে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া ছিল।

কুসুম আবার ডাকিল—এস।

সঙ্কোচভরে চাটুজ্জে কহিল—তেল দাও তো, আগে স্নান করে আসি, রাত্রে শ্মশানে—

হাসিয়া কুসুম কহিল—তা হোক।

চাটুজ্জে বলিল—সন্ধ্যামণি ফুল ফুটেছে—খুকু গাছ পুঁতেছিল।

দোকানে দোকানে তখন হাঁক উঠিয়াছে—

—তুফানী বিড়ি, মিঠা পান—

—গঙ্গাফল নিয়ে যান মা।

—পুতুল মা, পুতুল।

কুসুম সজল চক্ষে প্রত্যাশার হাসি হাসিয়া বলিল—সে আবার আসবে।

## প্রত্যাবর্তন

পুকুরের মাছ বর্ষায় বাহিরের জলস্রোতের সংযোগে বাহির হইয়া যায়। নালা নদী নদ সমুদ্র ঘুরিয়া সে অবশ্য আর পুকুরে ফিরিয়া আসে না; কিন্তু ফিরিয়া আসিলে যা ঘটে, তাই ঘটিল। আত্মীয় জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ দূরের কথা—মা পর্যন্ত চিনিতে পারিল না।

পরনে নীল রঙের পাতলুন, ফুলহাতা কোমরটুকু অবধি খাটো জামা, জামার পিছনে পিঠের উপর আবার একটা চৌকা ফালি, মাথায় বিচিত্র টুপি—এই পোশাকপরা লোকটিকে দেখিয়া জেলে-পাড়ার সকলে

ভাবিয়াছিল কোনো অদ্ভুত দেশের মানুষ। লোকটি পরম আরামে সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া জেলেদের বিপিন অর্থাৎ বিপিনের বাড়ির দুয়ারে দাঁড়াইল। পিছনে একপাল ছেলে জুটিয়াছিল, সে দাঁড়াইতেই ছেলেগুলিও দাঁড়াইয়া গেল। বিচিত্র পোশাকপরা লোকটির দৃষ্টি জীর্ণ পতনোন্মুখ বাড়িটার দিকে পড়িতেই সে-দৃষ্টি চকিত হইয়া উঠিল—ভ্রূর কুঞ্চনে জাগিয়া উঠিল নীরব প্রশ্ন। পিছন ফিরিয়া ছেলেদের দিকে চাহিয়া হাতের একটি মাত্র আঙুল নাড়িয়া সে ডাকিল, এই, কাম হিয়ার—ইধার আও! শুন শুন—ইখানে শুন। এ-ই ছো-ক-রা!

যে ছেলেটি সম্মুখে ছিল সে চট করিয়া পিছু হটিয়া চার-পাঁচজনকে আড়াল রাখিয়া দাঁড়াইল। সে চার-পাঁচজনও পিছনে যাইবার জন্য একটা ঠেলাঠেলি শুরু করিয়া দিল। লোকটি কৌতুক বোধ করিয়াও ঘৃণার সহিত বলিল—শুয়ার-কি-বাচ্চা!

তারপর সে বাড়ির ভাঙা দরজাটা ঠেলিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইল। চারিদিক ভাঙা-ভগ্ন, উহারই মধ্যে ভালো অবস্থার ঘরখানার দাওয়ার উপর বসিয়াছিল এক প্রৌঢ়া; খাটো ছেঁড়া একখানা কাপড় পরিয়া কতকগুলি গুগলি-শামুকের খোলা ভাঙিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। সে সন্ত্রস্ত হইয়া রূঢ় শঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করিল—কে, কে গো তুমি?

আগন্তুক একমুখ হাসিয়া বলিল—মা!

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রৌঢ়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এবার মাথার টুপিটা খুলিয়া আগন্তুক বলিল—চিনতে পারছিস না মা? হামি পশুপতি!—কথাগুলিতে অদ্ভুত একটি টান—'শ'-কারগুলি সব কেমন শিসের মত তীক্ষ্ণ, উচ্চারণে শব্দগুলি যেন কেমন বাঁকা।

পশুপতি? পশু? পশো? প্রৌঢ়ার হাত দুইটি নিষ্ক্রিয় স্তব্ধ হইয়া গেল; ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আকুল প্রশ্নভরা চোখে আগন্তুকের দিকে প্রৌঢ়া নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার হারানো ছেলে পশো, পশুপতি? লম্বা, রোগা, দুরন্ত—পনর বছরের ছেলে দশ বৎসর আগে পলাইয়া গিয়াছিল জগন্নাথের পাণ্ডার সঙ্গে—সেই পশুপতি? পশো?

আগন্তুক আগাইয়া আসিয়া বলিল—চিনতে পারছিস না মা ?

সত্যই প্রৌঢ়া চিনিতে পারিতেছিল না ; পরনে অদ্ভুত পোশাক —সায়েবদের পোশাকও সে দেখিয়াছে—এ পোশাক এই ধরনের হইলেও ঠিক তেমন নয় ; নীলবর্ণ এ এক অদ্ভুত পোশাক। জেলের ছেলে পশুপতি—যে কেবল নেংটির মত এক ফালি কাপড় পরিয়া থাকিত, কালো রঙ, নির্বোধ বোকা চেহারা, জলে থাকিয়া থাকিয়া যাহার সর্বাঙ্গ চুলকনায় ভরিয়া থাকিত, সেই পশুপতি—পশো ? মাথার পিছন দিকটা একেবারে কামানো—সামনের বড় বড় চুলগুলা আইবুড়ো মেয়েদের মত পিছনের দিকে আঁচড়ানো, চোখে-মুখে এমন একটা চালাক-চতুর ভাব—এই কি সেই ?

আগন্তুক এবার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দাওয়াটা বার দুয়েক ঝাড়িয়া লইয়া বসিল, হাসিয়া বলিল—বহুত মুল্লুক ঘুরে এলম, মা। জাপান চীন বিলাত মার্কিন মুল্লুক ঘুরলম। জাহাজে খালাসী হইয়েছিলম।

সে আবার একটা সিগারেট ধরাইল।

দশ বৎসর আগের কিশোর একখানি মুখের ছবির সহিত এই মুখখানি ক্রমশ মিলিয়া এক হইয়া আসিতেছিল—এক বিচিত্র জ্যামিতি ও পরিমিতির আঙ্কিক নিয়মে বিভিন্ন কালে পরিবর্তিত একখানা জমির মত। নাকের বাঁকা ভাবটি ঠিক তো—সেই তো! ঠোঁটের কোণ দুইটার ঠিক তেমনিই নীচের দিকে টান। ভ্রূ দুইটা তো তেমনি মোটা।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া আগন্তুক বলিল—বুঢ্ঢা কাঁহা ?—শুয়ার-কি-বাচ্চা ?

বুঢ্ঢা—বিপিন জেলে—এই বাড়ির মালিক, প্রৌঢ়ার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। পশুপতির সৎ-বাপ।

প্রৌঢ়া এবার কাঁদিয়া ফেলিল—বুড়ো মইছে বাবা—আমাকে মেরে যেইছে। পথে বসিয়ে গেল বাবা, সব দিয়ে যেইছে বেটীদিগে।

বিপিন মরিবার সময় সব দিয়া গিয়াছে তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাদের।

পশুপতি হাসিয়া বলিল—মর গেয়া বুঢ্ঢা, শুয়ার-কি-বাচ্চা ?

দশ বৎসর পূর্বে পশুপতি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। দুরন্ত নির্বোধ জেলের ছেলে, সৎ-বাপ বিপিনের পোষ্য ছিল। বিপিন ছিল

এখানকার মধ্যে অবস্থাপন্ন জেলে—এ অঞ্চলের ভালো ভালো পুকুর সে জমা করিয়া লইত, অদূরবর্তী নদীটার খানিকটা অংশও সে খোদ সরকারের কাছে জমা লইত একা। বিপিন মাছ ধরিতে যাইত, পশুপতিকে সঙ্গে যাইতে হইত; জলের তলায় কোনো কিছুতে জাল আটকাইলে বিপিন পশুপতিকে জলে ডুবিতে বাধ্য করিত। জলের তলায় বুক যেন ফাটিয়া যাইত। পশুপতি জলের তলায় হাতড়াইয়া ফিরিত কোথায় কিসে আটকাইয়াছে জাল। কতবার যে বোয়াল চিতলের কামড় সে খাইয়াছে তাহার হিসাব নাই। মাছ ধরিয়া ফিরিয়া বিপিন পশুকে পাঠাইত কাঠ-সংগ্রহে। সন্ধ্যায় আকণ্ঠ মদ গিলিয়া পশুকে সে নিয়মিত প্রহার দিত। সেবার জগন্নাথের পাণ্ডার লোক আসিয়াছিল রথযাত্রার পূর্বে যাত্রী সংগ্রহে। কেমন করিয়া জানি না এই বিদেশবাসীর সহিত পশুর আলাপ জমিয়া যায়। তাহার এটা ওটা কাজকর্ম করিয়া দিত, এঁটো বিড়ি প্রসাদ পাইত, আর গল্প শুনিত। জগন্নাথের মন্দির, তাঁহার রথ, সে রথ নাকি আকাশ ছোঁয়, রথের উপর জগন্নাথ নাকি হাঁটিয়া আসিয়া চড়েন, লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হয়, মধ্যে মধ্যে সে রথ নাকি আটকাইয়া যায়, লক্ষ লোকে টানিলেও সে রথ চলে না, তখন পাণ্ডারা জগন্নাথকে তিরস্কার করে—তবে সে রথ আবার চলে। সেখানে নাকি সমুদ্র আছে, তালগাছের সমান উঁচু এক একটা ঢেউ—নীলবর্ণ জল, সমুদ্রের নাকি ওপার নাই।

পাণ্ডার লোক যাত্রী লইয়া ট্রেনে চড়িয়া কিছুদূর আসিয়া সন্ধান পাইল, ট্রেনের বেঞ্চের তলায় লুকাইয়া শুইয়া আছে—পশুপতি; ট্রেনটা এক্সপ্রেস ট্রেন। বর্ধমান তখন পার হইয়া গিয়াছে। হাওড়ায় পৌঁছিয়া ট্রেন থামিল। নির্বিকার পাণ্ডা হাওড়ায় রেলকর্মচারীর হাতে পশুকে সমর্পণ করিয়া যাত্রীর দল লইয়া চলিয়া গেল। নিঃসম্বল পশু, একখানি মাত্র জীর্ণ কাপড় তাহার পরনে, রেলকর্মচারী তাহাকে সঁপিয়া দিল কনস্টেবলের হাতে। কিল, চড় ও কয়েকটা গুঁতা দিয়া কনস্টেবলটা তাহাকে আনিয়া পুরিল হাজতে। হাজত হইতে কোর্ট—কোর্টের বিচারে কয়েকদিনের জন্য তাহার জেল হইয়া গেল। প্রকাণ্ড কালো রঙের ঢাকা একখানা গাড়িতে তুলিয়া তাহাকে আনিয়া জেলে পুরিয়া দিল। আশ্চর্যের কথা, অতিক্রান্ত এতগুলি অবস্থান্তরের মধ্যেও পশু কোনোদিন কাঁদে নাই। একটা সভয় বিস্ময়ের অতিরিক্ত আর কিছু সে অনুভব করে নাই।

যে কষ্টে মানুষের কান্না আসে তেমন কষ্ট, এই অবস্থান্তরের মধ্যে ছিল না। অন্ততঃ তাহার কাছে ছিল না। কষ্ট অনুভব করিল সে বরং জেলখানা হইতে বাহির হইবার পর। বিরাট শহর—বড় বড় বাড়ি—অসংখ্য পথ—যে পথ পিছনে ফেলিয়া আসে সে পথ খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, গাড়ি—গাড়ি আর গাড়ি, মানুষ আর মানুষ। জেলখানা হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া সে যখন অকস্মাৎ অনুভব করিল সে হারাইয়া গিয়াছে, যে পথ ফেলিয়া আসিয়াছে সে পথ আর বাহির করা যাইবে না—তখন তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। সমস্ত দিনটা সে কাঁদিয়াছিল। মায়ের জন্য কাঁদিয়াছিল, গাঁয়ের জন্য কাঁদিয়াছিল। তারপর সব সহিয়া গেল। ভিক্ষা করিয়া মোট বহিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল অদ্ভুত একটা স্থানে। চারিদিকে বড় বড় বাড়ি—মধ্যে প্রকাণ্ড বাঁধানো নদী—নদীর উপরও বড় বড় বাড়ি ভাসিতেছে। বাড়ি নয় —জাহাজ। আশেপাশের লোকজনের কাছেই সে শুনিল ওগুলা জাহাজ। বড় বড় মই লাগাইয়া মোট মাথায় লোক উঠিতেছে, নামিতেছে; আকাশের উপরে একটা মই লোহার দড়িতে প্রকাণ্ড বোঝাগুলোকে বাঁধিয়া লইয়া জাহাজের উপর আপনি তুলিয়া লইতেছে। জাহাজের মাথায় বড় বড় চোঙা—মধ্যে মধ্যে চোঙা হইতে কী ভীষণ ধোঁয়ার রাশি! অদ্ভুত লাগিয়া গেল পশুপতির। জায়গাটার নাম শুনিল—খিদিরপুরের ডক। কত মানুষ—কত রকমের সায়েব। সুন্দর নীল পোশাক। খাটো মাথার সায়েবগুলার ছোট ছোট চোখ, খাঁদা নাক—পশুপতির বেশ লাগিল। পরে শুনিল উহারা জাপানী সাহেব। পশু ওইখানেই থাকিয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই সে অনেক শিখিয়া ফেলিল। আকাশে যে মইগুলা জিনিস টানিয়া তোলে, ওগুলা 'কেরেন'। জাহাজের গোল চোঙাগুলা চিমনি। জাহাজের উপরের ঘরগুলি কেবিন। জাহাজের ভিতরে—পাতালের মত গহ্বরটাও ক্রমশ তাহার পরিচিত হইয়া উঠিল। কল-ঘরের ভিতরও সে দেখিল; সেদিন সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। বাপ রে! চারিপাশে রেলিং-ঘেরা পিছল সিঁড়ি নীচে ওই পাতালে নামিয়া গিয়াছে; মধ্যে ঝকঝকে বিরাট যন্ত্রপাতি। সে কী উত্তাপ—আর সে কী শব্দ!

খিদিরপুরের একটা খোলার পল্লীতে সে থাকিত। সেখানে কত

লোক, কত জাতি, চীনম্যান, মগের মুলুকের লোক, চাটগাঁয়ের খালাসীর দল, গোয়ানী, মধ্যে মধ্যে সায়েব-খালাসীর দু-চারজনও মাতাল হইয়া আসিয়া জুটিত। কত প্রহারই সে প্রথম প্রথম খাইয়াছে। বড় হইয়া অবশ্য সেও কতজনকে প্রহার দিয়াছে। কতক গল্প সে শুনিত, দেশ-দেশান্তরের কথা—বার্মা মুলুক, সিঙ্গাপুর, হংকং, চীন, জাপান, মার্কিন, বিলাত, ফেরান্স—কত দেশ কত শহর। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতার অধিকাংশই নারী-সংক্রান্ত; পশুপতির পায়ের রক্ত মাথার দিকে উঠিত। সমুদ্রের গল্প—কূল নাই, দিক্ নাই, শুধু সমুদ্র আর আকাশ, আকাশে ওড়ে কত পাখী—জাহাজের আশে-পাশে ঘোরে হাঙ্গর, করাতের মত সারি সরি দাঁত, মধ্যে মধ্যে তিমিও দেখা যায়; আর ঝড়—আকাশভরা কালো মেঘের কোল হইতে ঝড় নামিয়া আসে, সমুদ্রে তুফান উঠে, সে তুফানে সমুদ্র যেন জাহাজ লইয়া লুফিতে থাকে। জাহাজের ডেক ভাসাইয়া জল চলিয়া, যায় কত সময় সেই ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া যায় কত জন। 'কালাপানি' আর 'মাডারিনে' (মেডিটেরেনিয়ান) নাকি ঢেউ খুব বেশী। পশুপতি স্তব্ধ হইয়া শুনিত। একদা ঐ খালাসীদের সঙ্গেই জাহাজের অফিসে নাম লিখাইয়া একটা জাহাজে করিয়া সে ভাসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর কতবার সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে, কতবার গিয়াছে; এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে—এক মুলুক হইতে অন্য মুলুকে।

দীর্ঘ দশ বৎসর পর সহসা কি মনে হইয়াছে কেমন করিয়া জানি না। মনে পড়িয়াছে মাকে, গাঁকে। সে কলিকাতা হইতে গ্রামে আসিয়াছে।

সন্ধ্যায় জেলেপাড়ায় প্রকাণ্ড মদের মজলিস বসিল। পশুপতি কুড়ি টাকা দিয়াছে। মদ নহিলে জেলেদের মজলিস হয় না, বিনা মদে বিচার হয় না, বিনা মদে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অপরাধ যাহাই হউক, মদ্যদণ্ডই একমাত্র শাস্তি। আবালবৃদ্ধবনিতা ধর্মরাজতলায় জমিয়াছিল। প্রকাণ্ড জালায় মদ ও একটা মাটির পাত্রে প্রচুর মাংসের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই মদ ও মাংসের সহিত মজলিস চলিতেছিল।

একটা বড় বাঁশের ঝুড়ি উপুড় করিয়া সেইটার উপর বসিয়াছে পশু, তাহার পরনে সেই পোশাক। সে নিজে এক বোতল পাকিমদ আনিয়া প্রায় অর্ধেকটা ইহারই মধ্যে খাইয়া ফেলিয়াছে। মজলিসে চলিতেছে হুঁকা—সে টানিতেছে সিগারেট। দুই পয়সা দামের সিগারেটের বাক্স অনেকগুলিই সে সঙ্গে আনিয়াছে।

এক ছোকরা উঠিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল—জাত মশাইরা গো!

সমস্বরে দশ-বারো জনে বলিল—চুপ-চুপ-চুপ! তাহারা মজলিসের গোলমাল থামাইতেছিল।

—নিবেদন পাই।

—বল। বল।

—আজ্ঞে, পশু আমাদের খুব বাহাদুর।

—নিচ্চয়! একশো বার।

—কিন্তুক বেলাত যেয়েছিল।

—হাঁ-হাঁ, ঠিক কথা!

—তা বেলাত গেলে আর জাত যায় না। এই আমাদের গেরামের ছোট হুজুরের ছেলে যেয়েছিল বেলাত, দেখেন তার জাত যায় নাই।

—ঠিক। ঠিক। বটে!

—তা পশুর কেনে জাত যাবে?

—নিচ্চয়।

—কুড়ি টাকা জরিমানা দিয়েছে—

একজন বলিল—আরও দশ টাকা লাগিবে। তা না দিলে—যাবে, উয়োর জাত যাবে। আমি বলছি যাবে।

পশু বলিল—দশ রূপেয়াই দিবে হামি।

সঙ্গে সঙ্গে বক্তা বলিল—একবার হরি হরি বল!

সমস্বরে সকলে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। তারপর আরম্ভ হইল গল্প। পশু গল্প আরম্ভ করিল, দেশ-দেশান্তরের লৌকিক-অলৌকিক গল্প। একবার একজন আরব দেশের সেখকে তাহারা সমুদ্র হইতে তুলিয়াছিল।—বুঝলি—জাহাজের ছামুতে মানুষটা এই ভেসে উঠছে—ব্যস, ফিন ডুবে যাচ্ছে। তিনবার-চারবার। তখুনি সারং বলল—নামাও বোট। নৌকো! নৌকো! বোট হল নৌকো। বাপরে সেখানে কী হাঙ্গর—মাছের পোনার ঝাঁকের মতুন কিলবিল করছে হাঙ্গর, তারই অন্দরমে মানুষ। তাজ্জব রে বাবা!

মজলিসসুদ্ধ মেয়ে পুরুষ স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। পশুপতি বলিয়া গেল বাঁকা বাঁকা উচ্চারণে—লোকটাকে যখন তুললম রে ভাই, তখুন বলব কি, তাজ্জব কি বাত—লোকটাকে ছোঁয় নাই হাঙ্গরে। জাহাজ-সুদ্ধ লোকের তাজ্জব লেগে গেল। বাপ রে! বাপ রে! মানুষটার জ্ঞান হল—সারং উকে পুছলো—কেয়া নাম, কাঁহাকে আদমী,

দরিয়াওমে গিরলে ক্যায়সে। আদমীঠো বলল, অরবী সেখ উ। দুসরা একটা জাহাজমে বম্বই যাচ্ছিল। নামাজ পড়তে পড়তে গিরে যায় সমুদ্দরে। বলল কি জানিস? বলল—পড়ল তো ছুটে আইলো হাঙ্গর দশঠো, বিশঠো। তো, উ বলল—দুহাই আল্লাকে, দুহাই পয়গম্বরকে—মৎ কাটো হামকো। ব্যস, হাঙ্গর ছুঁতে পারলে না। তারপর তো ভই, সারং তার করল—উ লোকটার জাহাজে। তারসে ফিন খবর আইলো—বাত ঠিক। উ জাহাজ তখুন একশ মাইল চলা গিয়া।

এমনি কত গল্প।

তারপর আরম্ভ হয় গান—নাচ। পুরুষেরাই নাচে গায়, মেয়েরা দেখে।

পশুপতি নিজে নাচে—পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া অদ্ভুত নাচ। বিচিত্র সুরে শিস দিয়া গান করে। মত্ত মজলিসে খুব বাহবা পড়িয়া গেল। পশুপতি নাচ শেষ করিয়া বলিল—সবসে ভাল নাচ জোড়া মিলকে নাচ। বড়া বড়া ঘর, শালা, আলো কত—আসবাব কি, বাজনা কি—আঃ হায়-হায়!—সুদূর দেশের আলোকোজ্জ্বল আনন্দোৎসবের স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সে হায়-হায় করিয়া সারা হইল। সহসা উৎসাহিত হইয়া সে প্রশ্ন করিল—দেখবি সি নাচ, দেখবি?

—হাঁ হাঁ। নিচ্চয়।

পশুপতি বোতল হইতে আর এক চুমুক মদ গিলিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া লইল—একটা সিগারেট ধরাইয়া বার কয়েক টানিয়া এক-জনকে দিয়া সে করিয়া বসিল একটা কাণ্ড। খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া বসিয়াছিল মেয়ের দল। পশুপতি ব্যবধানের সেইখানি জায়গায়। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া মেয়েদের দেখিয়া নবীন জেলের যুবতী মেয়েটার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—ই ঠিক পারবে, আয়—উঠে আয়।

মজলিসে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল।

পশুপতি মত্তদৃষ্টিতেও নৃত্যসঙ্গিনী পছন্দ করিতে ভুল করে নাই। নবীনের মেয়েটি সুশ্রী তন্বী তরুণী।

মজলিসে হৈ-চৈ উঠিল; নবীন ক্রোধে ফুলিয়া গর্জন আরম্ভ করিয়া দিল—মেরেই ফেলাব শালাকে।

নবীনের ছেলেটা অতিরিক্ত মদ খাইয়াছিল। সে একস্থানে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে চীৎকার করিতেছিল—না না না, উ হবে না। ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, উকে আমি ছাড়ব না—ছেড়ে দাও

বলছি। অবশ্য তাহাকে কেহই ধরিয়া ছিল না, বারণও তাহাকে কেহ করে নাই।

নবীন বলিল—আমার মেয়েকে উকে সাঙা করতে হবে।

পশুপতি ইয়া বড় একটা ছুরি হাতে নির্ভয় কৌতুকে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সে বলিল—ব্যস্, মাৎ চিল্লাও, সাঙা করব হামি। ই বাত আছে—কসুর হইছে, সাঙা করব হামি।

তন্বী তরুণী মেয়েটি শুধু সুশ্রী নয়, রূপবতী। জেলেদের মেয়েদের মধ্যে শ্রী আছে, কিন্তু নবীনের মেয়ের মত মেয়ে দেখা যায় না। পরদিন সুস্থ-দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিয়াও পশু আপসোস করিল না। জেলের মেয়েরা মাছের পসরা লইয়া বিকিকিনি করিয়া বেড়ায়—তাহারা স্বভাবে একটু উচ্ছলা, কিন্তু এই মেয়েটি শান্ত নিরুচ্ছ্বসিত। কাচঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের শিখার মত স্থির ও ধীর।

পশুর মা কিন্তু আপত্তি তুলিল।—উ মেয়ে সর্বনেশে মেয়ে বাবা। বেউলো রাঁড়ী, তিনবার বিয়ে হয়েছে—তিনটে মরদের মাথা উ খেয়েছে; উ হবে না বাবা।

মিথ্যা নয়, এই বয়সে তিনবার বিধবা হইয়াছে নবীনের মেয়ে। প্রথম বিবাহ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়সে, বিধবা হইয়াছিল পাঁচ বৎসরে। দ্বিতীয়বার সাঙা হয় এক বৎসর পরে—ছয় বৎসরে, ছয় মাসের মধ্যে সে স্বামী মারা যায়। তারপর ছয় বৎসর তাহার আর বিবাহ হয় নাই। বৎসর দুয়েক আগে তাহার নিষ্কম্প দীপশিখায় আকৃষ্ট হইয়া আসিল এক পতঙ্গ—সতেরো-আঠারো বৎসরের এক কাঁচা জোয়ান। মাসখানেকের মধ্যে সেও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিল; জালখানা ফেলিয়া আর তুলিতে পারিল না। জালের ভিতর কি বজবজ করিয়া বুটবুটি কাটিয়া পাঁকের ভিতর বসিয়া গেল; প্রকাণ্ড মাছ বুঝিয়া সে ডুব মারিল। তারপর একবার সে ভাসিয়া উঠিয়াছিল—প্রকাণ্ড একটা কুমীরের সঙ্গে আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায়। পর মুহূর্তে সে ডুবিল, আর উঠিল না।

এই কারণে মেয়েটার আসল নাম পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। নাম তাহার রমাদাসী—লোকে এখন ডাকে তাহাকে 'বেউলো' অর্থাৎ বেহুলা বলিয়া। মেয়েটি অস্বাভাবিক শান্ত—কিন্তু কঠিন; তাহার

বড় চোখ দুইটির স্থির দৃষ্টি মেলিয়া সে যখন চায়, তখন মনে হয় সে যেন তিরস্কার করিতেছে। পশুপতির বড় ভালো লাগিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে নবীনের বাড়ি গেল। নবীন, নবীনের ছেলে মাছ ধরিতে গিয়াছে—নবীনের স্ত্রী, পুত্রবধূ গিয়াছে ভোররাত্রের চুরি করিয়া ধরা মাছ বেচিতে, বাড়িতে ছিল কেবল রমা। সে স্থির শান্ত দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভাবী বধূত্ব স্মরণ করিয়াও সে একবার হাসিল না, চোখ নত করিল না।

পশুপতি বলিল—রাগ করেছিস?

শান্তভাবে মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

—গোস্ত রাঁধতে জানিস? মান্‌সো?

ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটি জানাইল—হ্যাঁ।

—তু মদ খাস? মদ?

এবার মেয়েটি সেই দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভবঘুরে উচ্ছৃঙ্খল পশুপতিকেও সে দৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করিতে হইল। কিন্তু পশুপতি ইহাতেই বেশী মুগ্ধ হইয়া গেল। শান্ত স্নিগ্ধ মেয়েটি, ছোট একখানি ঘর, ছেলে-মেয়ে—পশুপতি কল্পনা করিল অনেক। পুলকিত প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সে বিবাহের দৃঢ় সংকল্প লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মা আপত্তি করিল, কিন্তু সে কানেই তুলিল না। শিস দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল—একখানি ঘর তাহাকে কিনিতে হইবে। মাকে শুদ্ধ লইয়া সংসার করা তাহার পোষাইবে না। সে পাড়ার প্রান্তে খানিকটা জমি জমিদারের গোমস্তার কাছে বন্দোবস্ত লইয়া সেই দিনই ঘর আরম্ভ করিয়া দিল।

ঘর তৈয়ারি হইলে সে নবীনকে বলিল—ঠিক কর দিন।

সাতদিন পর দিন ঠিক হইয়া গেল। পশু বলিল—অল্‌রাইট, হামি কলকাত্তা যাবে—চিজ-বিজ কিনতে।

পথে নির্জন একটা গলির ভিতর কে ডাকিল—শোন।

রমাদাসী। সে আজ মৃদু হাসিয়া ডাকিতেছিল—শোন!

রমার মুখে হাসি আজ নূতন দেখিল পশুপতি, সে দ্রুত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। রমা আতঙ্কভরে বলিয়া উঠিল—না-না-না।

সে কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে পশুও তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

রমা বিবর্ণ মুখে বলিল—এই কবচটি তুমি পর। মা-চণ্ডীর কবচ, আমি এনেছি তোমার লেগে। একদিন উপোস করে থেকে কবচ এনেছি। সেই কি অসুখ করেছিল একদিন—অসুখ মিছে কথা, উপোস করেছিলাম।

সে নিজেই পরাইয়া দিল—লাল সুতায় বাঁধা তামার একটি কবচ। হাসিয়া রমা বলিল—আমার কপাল যাই হোক, মা তো মিথ্যে নয়, রণে বনে অরণ্যে মা তোমাকে রক্ষে করবেন!

ইহার পর পশুপতির সন্ধানই নাই। কলিকাতায় বাজার করিতে গিয়া সে আর ফিরিল না।

উপরের কাহিনীটুকু আমার গ্রামের ঘটনা, আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম—জেলেপাড়ার একটি বিচলিত বিহ্বল মুহূর্তে। পশুপতি নিরুদ্দেশের কিছুদিন পরেই পশুপতির ওই নূতন ঘরে রমা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল। দারোগা সুরতহাল রিপোর্ট লিখিতেছিল, আমি পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। দারোগা কি বুঝিয়াছিল, কি লিখিয়াছিল জানি না, আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা এই। যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহাও মিথ্যা নয়—সে কথা, শুনিলাম আরও মাস কয়েক পর, পশুপতির কাছে।

রেডিও অফিসে একটা ছোট নাটিকা দিবার কথা ছিল। সেখানে গিয়া শুনিলাম—এক অভিনব প্রোগ্রামের ব্যবস্থা। জার্মান সাবমেরিনের গুপ্ত আক্রমণে একখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের একমাত্র উদ্ধারপ্রাপ্ত ভারতীয় নাবিক আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবে।

রোমঞ্চকর অভিজ্ঞতা চমৎকার লাগিল।

বন্ধুবর হীরেন থিয়েটারী ঢঙে প্রশ্ন করিল—শুনলে?

দাদা কমলবিলাস গম্ভীর মুখে বলিলেন—শুক্রাচার্য করে দিলে তোমাদের।

—মানে?

—কা-কা-কানা করে দিলে তোমাদের লেখাকে।—মধ্যে মধ্যে কমলদাদার কথা ঠেকিয়া যায়।

স্বীকার করিয়া নীচে নামিয়া দেখিলেন—সেলারের পোশাক পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে পশুপতি। সেও আমাকে চিনিল—বাবু!

—হ্যাঁ। তোর গল্প শুনলাম। খুব বেঁচেছিস।

সে হাসিল।

রমার সংবাদ দিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিলাম—তুই চলে গেলি কেন?

—আজ্ঞে খিদিরপুরে গেলাম বেড়াতে। জাহাজ দেখলাম—বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল; আমোদ-টামোদ করলাম রেতে; কি হয়ে গেল, মনে হল কি হবে বিয়ে করে? ছ্যাশ বিষ্যাশে কত—সে লজ্জায় থামিয়া গেল।

আমি বুঝিলাম—দেশ-বিদেশের বিচিত্রতার মধ্যে বিচিত্র বিলাসিনী-দের আকর্ষণ সেদিন তাহাকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম। ছোট একটি নীড়, রমার মধ্যেকার নারীত্বের শান্ত বিকাশ তাহাকে ভুলাইতে পারিবার তো কথা নয়, সুতরাং তাহার দোষ কি? প্রেম তো তাহার মধ্যে সম্ভব নয়। তাহার জন্য প্রয়োজন ছিল অপরিমেয় আনন্দের—

চিন্তায় বাধা দিয়া পশুপতি বলিল—কিন্তু ভুল হইছিল, মতিচ্ছন্ন হইছিল আমার বাবু। আজ মরে গেলে কি হত? রমাদাসীর কবচই আমাকে বাঁচায়া বাবু। নইলে কেউ বাঁচল না—আমি বাঁচলাম। আর—

পশুপতি বলিল—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জাহাজ ফাটিয়া গেল, বিকট শব্দ, দুরন্ত আঘাত, ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকার। কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল, সে জানে না। জ্ঞান ছিল না তাহার। যখন জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল কে যেন তাহাকে একখানা ভাসমান কাঠের উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছে। তাহার মাথা ছিল হাতের উপর—রমার কবচটাই তাহার কপালে ঠেকিয়া ছিল।

কবচটা বাহির করিয়া সে কপালে ঠেকাইল। বলিল—ই কবচ যত দিন রহেগা, তত দিন হামার কিছু হবে না বাবু।

আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম রমার কথা।

স্তম্ভিত হইয়া গেল পশুপতি। তাহার সে-মূর্তি আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

কয়েক মুহূর্ত পর সিগারেট ধরাইয়া হাসিয়া সে বলিল—চললাম। সেলাম বাবু!

তাহাকে ডাকিলাম—শোন শোন।

—আজ্ঞে!

—কি করবি এখন?

পিছনে গঙ্গায় ষ্টীমারের তীব্র সার্চলাইট আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চাকার জলকাটার আলোড়ন শোনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে রকমারি আওয়াজে সিটি বাজিতেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পশুপতি হাসিল, তারপর বলিল—নতুন জাহাজমে চলে যায়েগা। আজকাল খালাসীর ভারি আদর। কেউ যেতে চাইছে না। হাম যায়েগা।

সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় পথের উপরেই কি একটা ফেলিয়া দিয়া গেল; ছোট শক্ত একটা কিছু। অগ্রসর হইতেই সেটা আমার নজরে পড়িল, বিবর্ণ সুতায় বাঁধা একটা তামার কবচ।

## নারী ও নাগিনী

ইটের পাঁজা হইতে খোঁড়া শেখ ইট ছাড়াইতেছিল। খোঁড়া শেখের নাম যে কি, তাহা কেহ জানে না; বোধ করি খোঁড়ার নিজেরও মনে নাই। কোন্ শৈশবে তাহার বাঁ-পাখানি ভাঙার পর হইতেই সে খোঁড়া নামেই চলিয়া আসিতেছে। শুধু পাখানি তাহার খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে, সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর। তারপর হয় তাহার বসন্ত, সেই বসন্তের দাগে কুৎসিত খোঁড়া দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার মনেই খোঁড়া ইট ছাড়াইতেছিল।

অদূরে অদাই ওরফে ওয়াহেদ শেখ গাড়ি লইয়া আসিতেছিল। গরু দুইটার লেজ দুমড়াইয়া সে গান ধরিয়া দিল—একটা অশ্লীল গান। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার তালভঙ্গ হইয়া গেল। গরু দুইটা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অদাই একটা ঝাঁকানি খাইয়া গান ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল—শালার গরু, কিছু না বলেছি—

প্রচণ্ড ক্রোধে পাঁচন-ছড়িটা সে তুলিল, গরু দুইটার অবাধ্যতার শাস্তি দিতে। গরু দুইটাও ক্রমাগত ফোঁস-ফোঁস করিয়া গর্জন

করিতেছিল। অদাইয়ের কিন্তু প্রহার করা হইল না, সে চীৎকার করিয়া উঠিল—খোঁড়া খোঁড়া, সাপ—সাপ।

অদাইয়ের গাড়ির সম্মুখেই একটি কিশোর সাপ ফণা তুলিয়া অল্প অল্প দুলিতেছিল। অদাই গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটা ইট উঠাইল।

ওদিক হইতে খোঁড়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল—মারিস না অদাই, মারিস না। যাই, আমি যাই।

অদাইয়ের হাতের ইট তোলাই রহিল, সে বলিল—কি বাহারের সাপ মাইরি! মুখখানা সিঁদুরের মত টকটকে লাল। মাথায় চক্করই বা কি বাহারের! কিন্তু পালাল—পালাল যে, শিগগির আয়।

সাপটা এইবার দ্রুতবেগে পলাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু চলিয়াছিল খোঁড়ার দিকেই, অদাইকে পিছনে ফেলিয়া পলায়নই তাহার উদ্দেশ্য। খোঁড়াকে সে দেখে নাই।

খোঁড়া হাঁকিল—দে তো অদাই, তোর পাঁচখানা ছুঁড়ে। যাঃ, সে ঢুকে পড়ল পাঁজার ভেতর। উদয়নাগ রে সাপটা, এ সাপ পাওয়া যায় না। ধরতে পারলে কিছু রোজগার হ'ত রে!

খোঁড়া সাপের ওঝা। শুধু ওঝা নয়, সাঁপ লইয়া খেলাও সে করে। ঘরের চালের কানাচে বড় বড় মুখ-বন্ধ হাঁড়ি তাহার খাটানোই আছে। তাহারই মধ্যে সাপগুলোকে সে বন্দী করিয়া রাখে। জীর্ণ হইলে দূরে মাঠে গিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া আসে। কত সাপ মরিয়াও যায়। সাপ যখন থাকে তখন খোঁড়া মজুর খাটে না। তখন দেখা যায়, বিষম-ঢাকি ও তুবড়ি-বাঁশি লইয়া খোঁড়া সাপের খেলা দেখাইতে চলিয়াছে। রোজগারও মন্দ হয় না। কিন্তু গাঁজা-আফিঙের বরাদ্দ তখন বাড়িয়া যায়। কখনো কখনো মদও চলে। ফলে সাপগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়া আবার ঝুড়ি ও বিড়া লইয়া বাহির হয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে বীভৎস মুখখানি ঈষৎ বাড়াইয়া বলে—মজুর খাটাবে গো—মজুর?

তোষামোদ করিয়া সে হাসে, বীভৎস মুখ আরও বীভৎস আর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে; মজুরি মিলিলে সে প্রাণপণে খাটে, সেখানে সে ফাঁকি দেয় না। যেদিন না মেলে, সেদিন ঝুড়ি কাঁধেই ভিক্ষা আরম্ভ করে। যাহা পায়, তাই ফিরাই খানিকটা গাঁজা-আফিঙ কেনে। কিনিয়াও যদি কিছু থাকে, তবে খানিকটা পচাই-মদ গিলিয়া বাড়ি

ফিরিয়া জোবেদা বিবির পা ধরিয়া কাঁদিতে বসে, বলে, আমার হাতে পড়ে তোর দুর্দশার আর সীমা থাকল না। না খেতে দিয়ে মেরে ফেললাম।

জোবেদা হাসিতে হাসিতে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলে—লে লে, ক্ষেপামি করিস না, ছাড় আমাকে—দুটো চাল দেখে আনি।

খোঁড়ার কান্না বাড়িয়া যায়, সে এবার জোবেদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে—এক জেরা লতুন কানি কখনো দিতে লারলাম। পুরানো তেনা পরেই তোর দিন গেল।

যাক ওসব কথা। পরদিন অতি প্রত্যূষে খোঁড়া ইটের পাঁজাটার কাছে আসিয়া হাজির হইল। হাতে ছোট একটা লাঠি। বগলে একটা ঝাঁপি। সম্মুখে পূর্ব-দিকচক্রবালে সবে রক্তাভা দেখা দিতে শুরু করিয়াছে। গাছের বুকের মধ্যে বসিয়া পাখিরা মুহুর্মুহু কলরব করিতেছিল। গ্রামের মধ্যে কোনো হিন্দু দেব-মন্দিরে মঙ্গলারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে। একটা উঁচু ঢিবির উপর বসিয়া খোঁড়া চারিদিকে সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল।

পূর্বাচলের রাঙা রঙ ক্রমশঃ গাঢ় হহয়া পরিধিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। সে রঙের আভায় পাঁজার পোড়া ইটগুলো আরও রাঙা হইয়া উঠিল। খোঁড়ার ময়লা কাপড়খানায় পর্যন্ত লাল রঙের ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। খোঁড়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওই—ওই না?

ঈষদ্দূরের প্রান্তরের বুকে বোধহয় সেই কিশোর সাপটিই পূর্বাকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ফণা নাচাইয়া খেলা করিতেছিল। প্রাতঃসূর্যের রক্তাভায় তাহার রঙ দেখাইতেছিল যেন গাঢ় লাল। সেই লাল রঙের মধ্যে ফণার ঘন কালো চক্রচিহ্ন অপূর্ব শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতির রাঙা পাখার মধ্যে বর্ণলেখার মতই সে মনোরম। খোঁড়া মুগ্ধ হইয়া গেল। আপনার মনেই মৃদুস্বরে সে বলিয়া উঠিল—বাঃ!

তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সর্পশিশু উদীয়মান সূর্যের অভিনন্দনে এত মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, খোঁড়ার পদশব্দেও তাহার খেলা ভাঙিল না। অতি সন্নিকটে আসিতেই সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। পর-মুহূর্তে সে গর্জন করিয়া ছোবল মারিল। কিন্তু ফণা আর সে তুলিতে পারিল না। খোঁড়া ক্ষিপ্রহস্তে বাঁ হাতের লাঠিখানি দিয়া তখন তাহার মাথা চাপিয়া ধরিয়াছে। ডান হাতে সাপের লেজ ধরিয়া

গোটা-দুই ঝাঁক দিয়া খোঁড়া বেশ করিয়া সাপটাকে দেখিয়া বলিল—সাপিনী।

মাস ছয়েক পর। গাঁজার দোকান হইতে ফিরিয়া খোঁড়া জোবেদাকে বলিল—কি এনেছি দেখ।

উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে বুলাইতে জোবেদা বলিল—কি ?

কাপড়ের খুঁট খুলিয়া খোঁড়া ছোট চিকচিকে একটি বস্তু বাহির করিয়া হাতের তালুর উপর রাখিয়া জোবেদার সম্মুখে ধরিল। বস্তুটি ছোট একটি মিনি—নাকে পরিবার অলঙ্কার।

জোবেদা প্রশ্ন করিল—এত ছোট মিনি কি হবে ?

হাসিয়া খোঁড়া বলিল—বিবিকে পরিয়ে দেব।

জোবেদা অবাক হয়ে গেল, হাসিতে হাসিতে খোঁড়া ঘরে প্রবেশ করিল। তারপর গলায় একটি সাপ জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। সেই সাপটি। এতদিনে আরও একটু বড় হইয়াছে। কিন্তু সে তেজ নাই। শান্ত আক্রোশহীনভাবে ধীরে ধীরে মুখটি ঈষৎ তুলিয়া খোঁড়ার গলায় কাঁধে ফিরিতেছিল।

জোবেদা বলিল—দেখ, ও কোরো না। যতই তেজ না থাক, ও-জাতকে বিশ্বেস নাই।

হাসিয়া খোঁড়া বলল—বিশ্বেস নাই ওদের বিষ-দাঁতকে। নইলে ওরাও তো ভালবাসে জোবেদা। বিষ-দাঁতই নাই, কিন্তু আর দাঁত তো রয়েছে, কই আমাকে তো কামড়ায় না। কেমন ভালো মেয়ের মত বিবি আমার ফিরছে বল দেখি!—বলিয়া সে সাপটির ঠোঁট দুইটি চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে একটা চুমা খাইয়া বসিল।

জোবেদা বিস্মিত হইল না, কারণ এ দৃশ্য তাহার নিকট নূতন নয়। কিন্তু সে বিরক্তিভরে বলিল—ছি ছি ছি ! তোমার কি ঘেন্না-পিত্তিও নাই ? কতবার তোমাকে বারণ করেছি, বল তো ?

সে কথায় খোঁড়া কানই দিল না। সে বলিল, দেখ দেখ, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ দেখি। জানিস, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে, তখন ঠিক এমনি করে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস কখনও ? আঃ, সে যে কী বাহারের খেলা, মাইরি !

জোবেদা বলিল—দেখে আমার কাজ নাই, তুই দেখেছিস সেই ভালো। কিন্তু তোর খেলাও ওই শেষ করবে, তা বুঝি।

খোঁড়া তখন একটা সূঁচ লইয়া বিবির নাক ফুঁড়িতে বসিয়াছে। পায়ের আঙুল দিয়া সাপটার লেজ চাপিয়া ধরিয়াছে আর বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়াছে মুখটা। ডান হাতে সূঁচ ধরিয়া নাক ফুঁড়িয়া মিনি পরাইয়া দিয়া সাপটাকে ছাড়িয়া দিল। যন্ত্রণায় ক্রোধে গর্জন করিয়া বিবি বারংবার খোঁড়াকে ছোবল মারিতে আরম্ভ করিল। ঝাঁপির ডালাটা ঢালের মত সম্মুখে ধরিয়া বিবির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে সে বলিল—রাগ করিস না বিবি, রাগ করিস না। দেখ তো কেমন খুবসুরত লাগছে তোকে। দে তো জোবেদা, আয়নাটা দে তো! দেখুক একবার নিজের চেহারাখানা!

জোবেদা বলিল—লারব আমি।

—দে, দে, তোর পায়ে পড়ি, একবার দে। দেখি না নিজের চেহারা দেখে ও কি করে!

জোবেদা স্বামীর এ অনুনয় উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আয়না আনিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।

খোঁড়া বলিল—এক জেরা সিন্দুর আনিস তো মেহেরবানি করে। জোবেদা ঘর হইতেই প্রশ্ন করিল—কি, হবে কি?

পরম কৌতুকে হাস্য করিয়া খোঁড়া বলিল—দেখবি কি হবে? আগে হতে বলছি না।

জোবেদা আয়না সিঁদুর লইয়া আসিয়া ঈষদ্দূরে নামাইয়া দিল খোঁড়া সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটি কাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপটির মাথায় একটি লালরেখা আঁকিয়া দিল। তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল।

পরে বিবিকে বলিল—দেখ দেখ বিবি, কী বাহার তোর খুলেছে দেখ দেখি! সাপটাকে ছাড়িয়া দিয়া সে আয়নাটা বিবির সম্মুখে ধরিল। তারপর বিষম-ঢাকিটা বাজাইয়া কর্কশ অনুনাসিক স্বরে গান ধরিল—

জানি না গো এমন হবে—
গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরা যাবে
ও জানি না গো—

আরো মাস কয়েক পর।

বর্ষার মাঝামাঝি একটা তুরন্ত বাদলা করিয়াছে। খোঁড়া কোথায় গিয়াছে, বাদলে দুর্যোগে ফিরিতে পারে নাই। জোবেদা অনুভব করিল, ঘরের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ উঠিতেছে—গন্ধটা ক্ষীণ, কিন্তু মিষ্ট এবং কেমন রকমের! এদিক ওদিক ঘুরিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না।

দিন-দুই পরে খোঁড়া ফিরিল, জলের দেবতাকে একটা অশ্লীল গালি দিয়া বলিল—কিছু খেতে দে দেখি জোবেদা, বড় ভুক লেগেছে।

জোবেদা ঘরের মধ্যে একটা থালায় পান্তাভাত বাড়িয়া দিল। পায়ের কাদা ধুইয়া খোঁড়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—গন্ধ কিসের বল দেখি জোবেদা?

জোবেদা বলিল—কে জানে বাপু, ক-দিন থেকেই ঘরে এমনই গন্ধ উঠছে।

খোঁড়া কথা কহিল না, সে শুধু ঘন ঘন শ্বাস টানিয়া গন্ধটার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল। এদিক ওদিক ঘুরিয়া বিবির ঝাঁপির কাছে দাঁড়াইল। মানুষের পদশব্দে ঝাঁপির ভিতর নাগিনীটা গর্জন করিয়া উঠিল।

খোঁড়া বলিল—হুঁ।

জোবেদা ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করিল—কি বল দেখি?

খোঁড়া বলিল—বিবির গায়ের গন্ধ। সাপিনী তো, সাপের সঙ্গে দেখা হবার সময় হয়েছে, তাই। ওই গন্ধেই সাপ চলে আসে।

জোবেদা অবাক হইয়া গেল। বলিল—কে জানে বাপু, তোদের কথা তোদেরই ভালো। নে, এখন পান্তি ক'টা খেয়ে ফেল।

ভাত খাইতে খাইতে খোঁড়া বলিল—ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে মাঠে। এ সময় ধরে রাখতে নাই।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কথাটা শেষ করিল।

জোবেদা পরম আশ্বাসের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সেই ভালো বাপু, ওটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এত সাপ মরে, ওটা মরেও না তো!

ভাত খাইয়া খোঁড়া ঝাঁপি হইতে বিবিকে বাহির করিল। মুখটি চাপিয়া ধরিয়া সে আদরের কথা কহিল।

জোবেদা বলিল—এই দেখ, ক'দিন ওকে কামানো হয় নাই, ওর দাঁত গজিয়েছে। আর মায়াই বা কেন বাপু? যা না—ওকে ছেড়ে দিয়ে আয়।

খোঁড়া বলিল—দেখ দেখ, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ।

অপরাহ্নে খোঁড়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়া ছিল। বিবিকে পার্শ্বের জঙ্গলটায় ছাড়িয়া দিয়াছে। জোবেদা বলিল, এমন করে বসে কেন বল তো? গাঁজাটাজা খা কেনে!

খোঁড়া কহিল—বিবির লেগে মন কি করছে রে!

জোবেদা হাসিয়া বলিল—মর মর। তোর কথা শুনে কি হয় আমার—

—না রে জোবেদা, মনটা ভারি খারাপ করছে।

জোবেদা এবার স্বামীর পাশে বসিয়া আদর করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কেন রে, আমাকে তোর ভালো লাগে না?

সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া খোঁড়া বলিল—তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। তু হামার জানের চেয়ে বেশি।

জোবেদা বলিয়া উঠিল—দেখ দেখ, বিবি ফিরে এসেছে। ওই দেখ নালার মধ্যে!

জলনিকাশী নালার মধ্যে সত্যিই বিবি ফণা তুলিয়া বেড়াইতেছিল।

খোঁড়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—ধরে আনি, দাঁড়া।

জোবেদা স্বামীকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না।

তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলিল, বেরো—হেট, হেট।

বাঁ হাতে করিয়া একখানা ঘুঁটে ছুঁড়িয়া সে বিবিকে মারিল। সাপটা সক্রোধে মাটির উপর কয়টা ছোবল মারিয়া ধীরে ধীরে নালা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর বোধ হয়, জোবেদা চীৎকার করিয়া উঠিল—ওঠ ওঠ, কিসে আমায় কাটলে!

খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিল, সত্যই জোবেদার বাঁ পায়ের আঙুলে একফোঁটা রক্ত জলবিন্দুর মত টলমল করিতেছে।

জোবেদা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—বিবি—তোর বিবি আমাকে কেটেছে, ওই দেখ।

একটা হাঁড়িতে বেড় দিয়া নাগিনী ধীরে ধীরে চলিয়াছিল।

খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাপটাকে ধরিয়া ঝাঁপিতে বন্দী করিয়া বলিল—জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করব আমি।

জোবেদা কিন্তু বাঁচিল না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইল। মাথার চুল টানিতেই খসখস করিয়া উঠিয়া আসিল। ওঝারা চলিয়া গেল। বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ সকরুণ করিয়া খোঁড়া শিয়রে বসিয়া রহিল।

একজন ওস্তাদ বলিল—তুইও যেতিস খোঁড়া, খুব বেঁচে গিয়েছিস। ভারি আক্রোশ ওদের, হয়ত তোকে কামড়াতেই এসেছিল।

সাশ্রুনেত্রে খোঁড়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

খোঁড়া ফকিরি লইয়াছে। তাহার ভিটাটা একটা ধ্বসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। খোঁড়ার বাড়ির পাশ দিয়াই একটা পায়ে-চলা পথ ছিল, সে পথ এখন বন্ধ, সেদিক দিয়া এখন কেহ হাঁটে না। বলে, বড় সাপের ভয়। সাপগুলা বড় খারাপ সাপ—উদয়নাগ। প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের সময়ে দেখা যায়, রাঙা রঙের সাপ ফণা তুলাইয়া খেলা করিতেছে।

বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল শুধু—তোর দোষ কি; মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।

## সুরতহাল রিপোর্ট

দারোগাবাবু 'সুরতহাল' রিপোর্ট লিখছিলেন।

'মৃতা কড়ি বাউড়িনী, বয়স অনুমান পঁচিশ-ছাব্বিশ, কিছু বেশীও হইতে পারে—কারণ তাহার সন্তানাদি হয় নাই।—ঘরের কড়িকাঠে গরু বাঁধিবার দড়ি আটকাইয়া গলাই ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলিতেছে দেখা যায়। লাশ দেখিয়া গলায় দড়ির ফাঁস আটকাইয়া দম বন্ধ হইয়াই মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ঘাড় ভাঙিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।'

মাস দেড়েক পূর্বে কড়ির স্বামী ভোলা মারা গেছে। মাস দেড়েকের মধ্যে কড়ি গলায় দড়ি দিয়ে মরল।

লোকে আশ্চর্য হল না। কড়ি ছিল ভোলা-অন্ত প্রাণ। ভোলাকে পুড়িয়ে এসে ঘরের দাওয়ার উপর যেভাবে সে বসেছিল—তাতে বাউড়ীদের দেবেন, নোটন নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করেছিল, কড়ি হয়ত পাগল হয়ে যাবে।

মাস দেড়েক আগের কথাই বলছি।

ভোলার শব সংকার করে এসে কড়ি ঘরের দাওয়ার উপর এসে বসল। তার সব যেন শূন্য মনে হচ্ছে। ঘরদোর বিশ্বসংসার—সব খাঁ খাঁ করছে। সে ভাবছিল—সে কি করবে? তার কি হবে?

শুধুই তো সব শূন্য হয়ে যায় নি—দুনিয়ার লোক তাকে যে দড়ি দিয়ে বাঁধবার জন্যে এগিয়ে আসছে। ভোলা নেই—কে তাকে রক্ষা করবে?

কড়ি শিউরে উঠল।

কড়ি বাউড়ীর মেয়ে। বাউড়ীদের শাঙা আছে, মানে মেয়েদের দ্বিতীয়বার বিয়ের রেওয়াজ আছে; স্বামী বেঁচে থাকতে তাকে ছেড়েই সে অন্যজনকে বিয়ে করতে পারে, স্বামী মরে গেলে তো কথাই নেই। কিন্তু কড়ি আর কাউকে বিয়ের কথা ভাবতেই পারে না এবং কোনো লোকও কড়িকে বিয়ে করার কথা মনে করতে পারে না। তার কারণ, একদিকে কড়ি সতী—অন্যদিকে সে চোর, পাকা নামজাদা চোর। কড়ির অনেক ভাগ্য যে তার স্বামী ভোলা নিজে ছিল চৌকিদার—তাই বার বার চুরি করেও সে জেলে যায় নি। নইলে, লোকে বলে, জেল ছিল অনিবার্য।

সুযোগ-সুবিধে পেলে, লোকজন না থাকলে বা অন্ধকার রাত্রেই চোরে চুরি করে, কিন্তু কড়ির চুরি দিনে-দুপুরে হাজারো লোকের মধ্যে, একেবারে হাটে পর্যন্ত। লঙ্কা, লেবু, কুল, ছোটোখাটো তরি-তরকারি চুরি—চুরিই নয়। ওসব তো ভদ্রলোকেও করে; লঙ্কা কি লেবু, কী কুল—মুঠো দরুনে তুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে, নাকে শুঁকে, অর্ধেকগুলো ফেলে দিয়ে, অর্ধেকগুলো আত্মসাৎ করার পদ্ধতিটা প্রায় প্রচলিত হয়ে গেছে; দশ জনের কাছে জিনিস দেখে ফিরলেই পাঁচ মুঠো হয়ে যায়। থানার লোকে পর্যন্ত ও চুরি ধরে না—ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেয়; হাটের ফড়েরা বড় জোর এমন লোকের হাত চেপে

ধরে মুচড়ে জিনিস কেড়ে নেয়, তার বেশী কিছু বলে না। কড়ির চুরি, লঙ্কা লেবু চুরি নয়—সে চুরি করে কপি, মাছ, কমলা, ল্যাংড়া, মালদহের আম, কাঁঠাল এলে সবচেয়ে ভালো কাঁঠালটি—মোট কথা হাটের সেরা জিনিসটির ওপর তার নজর থাকে। তেমন জিনিস না থাকলে কড়ির নজর পড়ে কাপড় কি গামছার দিকে। তা না পেলে সে মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকে হাটুরেদের পয়সার থলেটার দিকে হাত বাড়ায়। ধরাও মধ্যে মধ্যে পড়ে, হাটুরে থেকে খদ্দেররা পর্যন্ত প্রহার দেয়, ছপদাপ শব্দে কিল-চড় পিঠে পড়ে, ধাক্কা খেয়ে পড়েও যায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে ওঠে, বলে—তা মার কেনে, তা মার কেনে, অন্যায় হয়ে যেয়েছে—তা মার কেনে!

এ সব অবশ্য আগের কথা; ইদানীং ভোলার কল্যাণে সে এসব থেকে অনেকখানি রেহাই পেয়েছিল। ভোলার মত ভালো লোক বড় দেখা যায় না, তার ওপর সে চৌকিদার—লোকে ভোলার পরিবার বলে তাকে ছেড়ে দিত। কড়ির ঠিক বিপরীত চরিত্র ছিল ভোলার। একবার সে পথের উপর একতাড়া নোট কুড়িয়ে পেয়েছিল। দশ টাকার পনরখানা নোট; ভোলা সে নোটের তাড়াটি একেবারে সরাসরি হাজির করে দিয়েছিল থানায় দারোগাবাবুর কাছে।

ছু' ক্রোশ দূরের একখানা গ্রামের এক চাষীর টাকা; লোকটি জমি বিক্রি-করা সাড়ে পাঁচশ টাকার পাঁচ তাড়া নোটের মধ্যে দেড়শ টাকার তাড়াটাই অতি সাবধানতার আতিশয্যের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিল। টাকার তাড়াটি ফেরত পেয়ে তার ছু'চোখ বেয়ে জল এসেছিল—সে ছু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে একখানা দশ টাকার নোট ভোলাকে দিতে চেয়েছিল। তার মুখের দিকে চেয়ে ভোলা সে টাকা নেয় নি। ছুই হাত জোড় করে বলেছিল—মার্জনা করবেন মণ্ডলমশায়।

লোকটি ভোলার দিকে চেয়ে মিনতি করে বলেছিল—আরও বেশী দিতে হয় আমি জানি, কিন্তু—

বাধা দিয়ে ভোলা বলেছিল—আজ্ঞে না। তার জন্যে লয় মণ্ডলমশায়।

—তবে?

মানুষ কম ছুঃখে জমি বিক্রি করে না মণ্ডলমশায়। আপনার অনেক ছুঃখের টাকা, লক্ষ্মী বেচা টাকা,—উ আমি লিতে পারব না।

দারোগাবাবু ছিল ঘাগী লোক, এল-সি থেকে এ-এস-আই তার থেকে এস-আই বা দারোগা, বড় বড় পাকা গোঁফ—মাথার চুলও আধকাঁচা, আধপাকা ; কোনো রকম ভণ্ডামি তার নিজেরও ছিল না— পরেরও সহ্য করতে পারত না। সে পর্যন্ত এক্ষেত্রে ভোলার পিঠে প্রকাণ্ড একটা চাপড় মেরে বলেছিল—সাবাস্ বেটা।

কথাটা সে পুলিস সাহেবের কানেও তুলেছিল। সাহেব নিজের পকেট থেকে ভোলাকে বকশিশ দিয়েছিল দু'টাকা।

শুধুই এইটুকুই ভোলার খাতিরের কারণ নয়। ভোলা একবার একা একদল ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে একজন ডাকাতকে ঘায়েল করে তাকে ধরেছিল।

সে একটা কাহিনী। ডাকাতের দলের ডাকাতি-করা ভোলা একা রুখতে পারে নি, কিন্তু প্রথম থেকেই সে দূরে দূরে থেকে চীৎকার করতে আরম্ভ করেছিল। ডাকাতের দল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সরে পড়েছিল। ভোলাও তাদের পিছু নিয়ে চীৎকার করতে করতে চলেছিল। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ, সেই মাঠের মধ্যেও ভোলা তাদের পিছন ছাড়ে নি—বাঘের পিছনে ফেউরের মত সে ডাকতে ডাকতে চলেছিল। মাঠের শেষে নদী। নদীর ধারে জঙ্গল। জঙ্গলের ধারে এসে ডাকাতদের সবচেয়ে সেরা লাঠিয়াল ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। সে লোকটা মেয়ে কি ছেলের হাত থেকে গয়না টেনে খুলতে গিয়ে আঁটো বোধ হলে—ধারালো হেঁসো দিয়ে হাতটাই কেটে নিত, কানের গয়না সে জীবনে কখনও খুলে নেয় নি, টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে চিরকাল—এ লোক সেই লোক। ফেউয়ের ডাকে তিক্ত-বিরক্ত বাঘের মতই সে আক্রোশভরেই ঘুরেছিল ভোলার মুণ্ডটা ছিঁড়ে কি ছেঁচে দেবার জন্যে। কিন্তু তার কপাল, আর ভোলার কপাল। অন্ততঃ লোকে তাই বলে—ভোলার কপালের দোহাই দেয়। নইলে সে লোকের সামনে ভোলার দাঁড়াবার যোগ্যতা ছিল না। ভোলার কপালের গুণেই অন্ধকারের মধ্যে লোকটা একটা ইঁদুরের গর্তের মধ্যে পা আটকে পড়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগে ভোলা বসিয়েছিল মোক্ষম লাঠি। তারপর তার বুকের ওপর বসে মাথার পাগড়ি খুলে তাকে বেঁধেছিল। ডাকাতের দল তাদের লাঠিয়ালের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল, তাই তারাও গিয়ে পড়েছিল অনেকটা দূরে। ভোলা জখম ডাকাতটাকে টানতে টানতে

নিয়ে এসেছিল গ্রামে। এর জন্যে সে সরকার থেকে বকশিশ পেয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী পেয়েছিল গ্রামের লোকের স্নেহ, সদয় পৃষ্ঠপোষকতা।

ঠিক এই জন্যেই কড়িকে লোকে হাতে-নাতে ধরেও খুব বেশী নির্যাতন করত না। হাটে ধরা পড়লে এই জন্যেই অনেক-সময় থানার লোকেও তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথম প্রথম ভোলা নিজেও তাকে প্রহার করত; ইদানীং সেও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শুধু বলত—ছি-ছি-ছি!

কড়ি খটখটে চোখের দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকত।

ভোলা আবার বলত—'যাকে দশে বলে ছি, তার জীবনে কাজ কি?' তু মর—মর—মর, তু মর। মরণ যদি না হয়ত গলায় দড়ি দিয়ে মর। জলে ডুবে মর। বিষ খেয়ে মর।

কড়ি তবুও চুপ করেই থাকত। তার দৃষ্টি অদ্ভুত দৃষ্টি, পলক পড়ে না, সাপের মত চেয়ে থাকত। দৃষ্টি দেখে কোনোদিন কড়ির মনের দুঃখ, কি লজ্জা, কি আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারা যায় নি।

ভোলা আবার বলত ওই মরবার কথা—মর—মর—মর, তুই মর।

আবার কড়ি মৃদুস্বরে বলত—হ্যাঁ। মরব তাই। হ্যাঁ!

—মরবি না তো আমাকে এমনি করে জ্বালাবি তু?

—কেন? কি করলাম কি? কি জ্বালালাম তুমাকে?

ভোলা হতবাক হয়ে যেত বিস্ময়ে।

কড়ি বলত—চুরি করেছিলাম, তার লেগে তো লোকে আমাকে মেরেছে।

তারপর অকস্মাৎ ভোলার পায়ে ধরে কাঁদত—তুমিও না হয় মার। যে হাতে আমি চুরি করি, সেই হাতখানা আমার ভেঙে দাও। আমার মরণই যদি চাও তবে তুমিই আমার টুঁটিতে পা দিয়ে মেরে ফেল।

ভোলা তবু তাকে ভালবাসত।

কতজন, মায় থানার লোকে পর্যন্ত কতবার বলেছে—ও মেয়েটাকে তুই ছেড়ে দে ভোলা। তোর মত লোকের অমন চোর পরিবার, ছি-ছি-ছি!

ভোলা মাথা চুলকে বলত—আজ্ঞে?—যেন কথাটার অর্থ তার মাথায় ঢুকেই নি।

—ছেড়ে দে হারামজাদী চোরকে।

ভোলা তবুও সেইভাবে মাথাই চুলকে যেত। কোনো উত্তরই দিত না

ভোলা যে জানে কড়ির আর এক পরিচয়।

বাউড়ীর মেয়ে হলেও কড়ি সুন্দরী মেয়ে। ভদ্রলোকেদের মেয়েদের মত ফরসা রঙ, তেমনি শ্রী। কড়িকে কতবার কতজন প্রলুব্ধ করেছে; ভোলা নিজে চোখে দেখেছে—বাবুদের ছেলে কড়িকে টাকা দেখাচ্ছে—কিন্তু কড়ি একবার মাত্র তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে চলে এসেছে, ফিরেও তাকায় নি আর। ভোলা তখন বাবুদের বাড়ি কাজ করত; সে নিজের চোখে দেখেছিল, তারই মনিবের ছেলে কড়িকে টাকা দেখালে, কিন্তু কড়ি দেখবামাত্র চোখ ফিরিয়ে নিলে, চলে গেল। বাড়িতে ফিরে ভোলা কড়িকে কাঁদতে দেখেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করতে কড়ি বলেছিল অকপট সত্য কথা।

তাদের স্বজাতির মধ্যে অনেকে প্রথম প্রথম কড়ির মন ভাঙ্গাতে চেষ্টা করেছিল। কড়ি তাদের গাল দিত তারস্বরে। ভোলা আসবা-মাত্র বলে দিত তাদের কথা।

দুটো ব্যাপারই যেন পাশাপাশি চলত।

সকালে কড়ি চুরি করত। ভোলা তিরস্কার করত—কড়ি পায়ে ধরে কাঁদত। সন্ধ্যেয় কড়ি চীৎকার করত অথবা অঝোর ঝরে কাঁদত।

—কি হ'ল? চেঁচাচ্ছিস কেন?

—ওই দেখনা। বাঁশবুকো—তিদ্দশে নামুনেতে খাবে?

—থাম বাপু থাম।

—না। কেন? থামব কেন? আমাকে—

—আঃ—

—কিসের আঃ! যা-না-তাই বলবে—আর আমি চুপ করব? কড়ির গালিগালাজের মাত্রা বেড়ে চলত উত্তরোত্তর।

স্বজাতি ও সমশ্রেণীর ক্ষেত্রে কড়ি গাল দিত; উঁচুজাতের ভদ্র-শ্রেণীর ক্ষেত্রে সে অঝোর ঝরে কাঁদত।

সে হলে ভোলাকে সান্ত্বনা দিতে হ'ত। ভোলার সান্ত্বনায় কড়ির কান্না বেড়ে যেত। অনেক কষ্টে অবশেষে সে বলত—ওই আধাকেষ্ট (রাধাকেষ্ট) বলে আমাকে—আর বলতে পারত না কড়ি, কেবল অঝোর ঝরে কাঁদত।

শুধু তাই নয়। কড়ির মত পরিশ্রমী মেয়ে সংসারে দেখা যায় না। দিনরাত সে খাটছেই খাটছে। কখনও ধান মেলে দিচ্ছে, ধান তুলছে, ধান ভানছে, কখনও কাঠকুটো ভেঙে আনছে, গরুর সেবা করছে, ঘুঁটে দিচ্ছে, মাথায় করে সেই ঘুঁটে বেচে আসছে; কাজের তার বিরাম নেই। ভোলার গরু ছিল—ভাগে জমি নিয়ে সে চাষও করত। কড়ি সমানে তার সঙ্গে খাটত। তাদের জাতের সকল মেয়েই খাটে—কিন্তু কড়ির কাজের সঙ্গে কারও কাজের তুলনা হয় না।

ভোলা এমন কড়িকে প্রাণ দিয়ে ভালো না বেসে পারে নি।

সেই ভোলার মত স্বামী মরে গেল। কড়ি ভোলার সৎকার করে এসে আপনার দাওয়ায় বসে ভাবছিল—তার কি হবে? সে কি করবে?

আশ্চর্যের কথা। কড়ি জীবনে এমন আশ্চর্য-বোধ কখনও করে নি। তার মনে হ'ল ভোলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীটার চেহারাই যেন বদলে গেছে। প্রতিটি মানুষ যেন অন্য রকম হয়ে গেছে।

ভোলার পুরানো মুনিব বাড়ির সেই ছেলেটি দীর্ঘকাল ধরেই কড়িকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে এসেছে। এই সেদিন ভোলার অসুখের সময়েও সে কড়ির দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়েছে—যে কথাগুলি বলেছে তার মধ্যে থেকে কড়ি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছে অন্য-রকম অর্থ। কড়ি খুব তাড়াতাড়িই যাচ্ছিল। কাঠ-বমির আক্ষেপে ভোলা কাতর হয়ে পড়েছিল; লেবুর রসে উপকার হবে—লেবুর গন্ধ শুঁকলেও আরাম পাবে, তাই সে যাচ্ছিল কয়েকটা পাতিলেবুর সন্ধানে। হাটবার হলে ভাবনাই ছিল না, কিন্তু হাটবারের দেরি আছে দুদিন। কড়ি যাচ্ছিল রামবাবুদের বৈঠকখানার দিকে, বাবুদের বৈঠকখানার সামনে ছোট বাগানটার মধ্যে দুটো পাতিলেবুর গাছ আছে, ফলও ধরে আছে অনেক। পাঁচিলের একটা জায়গা ভাঙা আছে, সেও কড়ির অজনা নয়। হঠাৎ পথে ওই বাবুদের ছেলের সঙ্গে দেখা। ওর চরিত্র কড়ি ভালোই জানে—সে একবার তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়েই হন হন করে চলে যাচ্ছিল। ছেলেটি ডাকলে—ওরে, এই কড়ি!

বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই কড়ি উত্তর দিয়েছিল—কিগো? বলছ কি?

—যা গেল! বলছি ভোলা আছে কেমন?

—ভালো না বাপু।

—ডাক্তার দেখাচ্ছিস তো? কোথায় যাচ্ছিস এমন করে?

—আমি মরি নিজের জ্বলনে, তুমি আর জ্বালিও না বাপু।

—জ্বালানো কি হ'ল? এমন হন হন করে যাচ্ছিস তাই জিজ্ঞাসা করছি। কোনো কিছুর দরকার থাকলে বলিস—ভোলা আমাদের পুরানো চাকর, তাছাড়া সে ভালো লোক।

—না, কিছু দরকার নাই।

—তোর কথাবার্তা এমন কেন বল তো? মানুষের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে জানিস না?

—না, জানি না। —বলেই কড়ি হন হন করে চলে গিয়েছিল।.... কিছু দরকার থাকলে বলিস! কেন? দরকার থাকলেই বা তোমাকে আমি বলব কেন? তোমারই বা এত দরদ কেন?....তোর কথাবার্তা এমন কেন? মানুষের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে জানিস না?.... না। কড়ি জানে না সে ধরনের কথাবার্তা! ছি! ছি!

ভোলার মৃত্যুর পর সে লোকও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। মাত্র এক মাসের মধ্যে। আশ্চর্য! কালই তার সঙ্গে কড়ির দেখা হ'ল। ভোলার মৃত্যুর পর এই প্রথম দেখা।

কড়ি তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চাইলে।

সে বললে—ভালো আছিস কড়ি?

কড়ির চোখ ভরে আজ জল এল। গলার স্বর ধরে এল—সে কথা বলতে পারলে না।

বাবুদের ছেলেটি বললে—ভোলার মত লোক আর হবে না। বড় ভালো লোক ছিল সে।

কড়ি এবার মুখ তুলে তার দিকে চাইলে। আশ্চর্যের কথা—তার চোখে কোথাও এমন কিছু নেই, যা দেখে কড়ির চোখ নত হয়ে পড়ে, মন ঘেন্নায় রি-রি করে ওঠে।

ছেলেটিই আবার বললে—কি করবি বল? এর ওপর তো মানুষের হাত নেই!

আঁচল দিয়ে আপনার চোখ মুছে কড়ি বললে—কি করে খাব মশায়, তাই ভাবছি। পোড়া পেট তো মানবে না।

—ভগবান আছেন রে। তিনিই যা হয় করবেন।

—আপনকাদের বাড়িতে একটা চাকরি দেবেন মশায়? ঝিয়ের কাজ?

—কাজ ?

—হ্যাঁ। বলেন তো দিনরাতই থাকব আপনকাদের বাড়িতে।

ছেলেটা বার বার ঘাড় নেড়ে বললে—না বাপু, সে পারব না।

একটু থেমে আবার সে বললে—তোমার স্বভাব-চরিত্র ভালো, কিন্তু তুমি বড় চোর।

কড়ি মাথা নীচু করে বললে—চুরি আমি আর করব না।

ছেলেটি হাসলে।

কড়ি বললে—আপনকার পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ছেলেটি বললে—থাক।

কড়ি তার দিকে চেয়ে একটু মিষ্টি হাসি হেসেই বললে—বিশ্বেস হচ্ছে না আপনকার ? আপুনি যা বলবেন—তাই করব আমি।

—না বাপু। বরং দরকার হয়ত কিছু ধান-চাল সাহায্য দেব। চাকরি-বাকরি হবে না।

মাথা হেঁট করেই কড়ি ফিরে গেল। সে ঠিক চাকরির সন্ধানে বার হয় নি। বেরিয়েছিল অমনিই। ভোলার মৃত্যুর পর থেকে এই একটা মাস সে ঘরের মধ্যেই ছিল। ভোলা যা রেখে গেছে—তা তাদের জাতির পক্ষে অনেক। ভোলা চাষ করত—চাষের ধান সঞ্চয় করে ছোটখাটো একটি মরাই সে বেঁধে রেখে গেছে; চৌকিদারি মাইনে বকশিশ থেকে পনর গণ্ডা টাকাও তার জমানো আছে। ঘরে পেতল-কাঁসাও কয়েকখানা করেছিল ভোলা। দুটো হেলে বলদ আছে, সে দুটো বেচলেও আট-দশ গণ্ডা টাকা হবে। একটা গাই আছে, সের দেড়েক দুধ দেয়। দুধ বেচলেও রোজ আট-দশ পয়সা হবে। পেটের ভাবনা তার নেই। কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে তার মন প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। ভোলাকে অহরহ ভেবে সে আর দিন কাটাতে পারছে না। শূন্য ঘর—সেই ঘরের মধ্যে তার মন প্রাণ যেন কাটে না। বাড়ির খুব কাছেই রেল ইস্টিশান, ছোট ছোট রেল লাইন, ইস্টিশানও খুব ছোট; ভোরের গাড়িটা যখন যায় তখনই কড়ি বরাবর ওঠে। আজকার তার ঘুম ভাঙে রাত্রি থাকতে। ঘরের কাজ সারা হয়ে গেলে তবে ভোরের গাড়ি আসে। কাজও যে কমে গেছে। একা মানুষ সে—এঁটো বাসন মাত্র একখানা। ঘরে পুরুষমানুষকে নিয়েই তো যত কাজ। হাজারো অকাজ করে সে কাজ বাড়িয়ে দেয়। এখানে তামাকের গুল ঝাড়ছে, ওখানে ফেলছে পোড়া বিড়ি; বর্ষার সময়

কাদা পায়ে—অন্য সময় ধুলো পায়ে একেবারে এসে ঘরে ঢুকছে ; এখানে গামছাটা ফেলেছে ; অকারণে কাস্তেটার ডগা দিয়ে উঠোনের কি দাওয়ার মাটি খুঁড়ছে ; মাছ ধরে এসে পুঁটিমাছ-ধরা ছিপটা ছুঁড়ে দিলে তো পড়ল গিয়ে ওইখানে ; লাঙ্গলের গজাল ঠুকতে বসে এখানে ফেললে পাথরটা, ওখানে ফেললে লোহার টুকরোটা ; কোদালের বাঁট তৈরি করতে বসে গাছের ডাল চেঁচে-ছুলে ঘরময় ছড়ালো কাঠের ছিলকে ; লাল-কুমড়োর লতা চালের উপর তুলতে গিয়ে মেঝের উপর ফেললে রাজ্যের পচা খড় ;—কাজ করে আর কুলিয়ে উঠতে পারত না কড়ি। তার উপর ছিল তার সেবা। আজ পায়ের নখ তুলে এল—বাঁধ জলপটি ! কাল এল হাত কেটে—দাও হাত বেঁধে। পরশু ইনেসপেকটার বাবুর ভারি বাক্সটা ঘাড়ে করে ঘাড়ে ব্যথা নিয়ে ফিরল—দাও নুনের পুঁটলির সেঁক। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ফিরলে তো কথাই থাকত না। মাথায় জল দেওয়া, বাতাস করা, তাকে খাওয়ানো, বমি করলে পরিষ্কার করা, তার উপর তার মার খাওয়া !

ভোলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সব কাজ ফুরিয়ে গেছে। আজকাল ভোরের গাড়ি আসতেই তার বাসীপাট সারা হয়ে যায়, সে চুপ করে দাওয়ার উপর বসে থাকে দশটার গাড়ির প্রত্যাশায়। দশটার গাড়ি এলেই হয় কাঠকুটো কুড়োতে যাওয়ার সময়। সমস্ত দুপুরটা মাঠের মধ্যে বাগানে বাগানে ঘুরে, ফিরে আসে দুটোর সময়। তারপর আবার সেই একলা ঘরের মধ্যে কাটানো, বাকি দিনটা, সমস্ত রাত্রিটা। কড়ি হাঁপিয়ে উঠেছে। জাত-জ্ঞাতের মেয়েরা কেউ কেউ আসে, কিছুক্ষণ বসে তারপর চলে যায়—যাই ভাই, এখুনি আবার ছেলে কাঁদবে। মরদের ফেরার সময় হ'ল।

তারা চলে যায়, কড়ি একা বসে থাকে। সন্ধ্যার সময় কেউ আসেই না। দিনরাত্রি কাটে না কড়ির।

মধ্যে মধ্যে দেবনা, যাকে কড়ি গালিগালাজ অভিসম্পাত না দিয়ে জল খেত না—সে-ই আসে। কিন্তু কড়ি আশ্চর্য হয়ে যায়—সে দেবনা আর নাই। দেবনাও যেন পালটে গেছে। বাবুদের ছেলেটার মতই সে যেন অন্যমানুষ, তার কথাবার্তার ধরনও অন্যরকম।

কড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ঠিক এই সময়েই বাইরে থেকে তাকে ডাকল, কড়ি—

দেবেনই ডাকছে।

কড়ি ব্যগ্র হয়ে উত্তর দিলে—আয় দেবেন, আয়।

দেবেন এসে দাঁড়াল। বললে—তু লাকি বাবুদের বাড়িতে চাকরি খুঁজতে গিয়েছিলি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কড়ি বললে—হুঁ।।

দেবেন বললে—বাবুদের বাড়িতে আজ আমি মুনিষ লেগেছিলাম কিনা, তাই শুনলাম।

কড়ি বললে—কি করব বল ভাই, প্যাটে খেতে হবে তো।

দেবেন বললে—মরণ তোর। ভোলা যা রেখে গিয়েছে—তাতেই তোর চলে যাবে। গাই গরুর দুধ বিক্রি কর, দু-চার টাকা ধার দে লোককে, সুদ পাবি।

কড়ি আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—একলা ঘরে আমি আর থাকতে লারছি দেবেন। ঘর যেন আমাকে গিলতে আসছে।

দেবেনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, কি করবি বল—মানুষের তো হাত নাই এতে।

কড়ির চোখে জল এল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে বললে—ছেরো জেবন কি করে কাটাব আমি বল?

দেবেন বললে—অন্য কেউ হলে বলতাম সাঙা কর। কিন্তুক তোকে তো জানি। তোর ওই গুণেই ভোলা তোকে ছাড়ে নাই। তা ধর্ম-কর্ম কর—দেবতা থানে ঘোর। দিন কেটে যাবে।

ঝরঝর করে কড়ির চোখ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ হ'ল।

দেবেন বলে—তোর হাতটান দোষটা যদি না থাকত, তবে তো তু মহাশয় লোক হতিস কড়ি। ভদ্দলোকেরাও বলে, বাউড়ীর মেয়ে হলে কি হবে—কড়ির মত চরিত্র হয় না। দোষের মধ্যে ওই হাতটান।

কড়ি নীরবে বার বার চোখের জল মুছবার চেষ্টা করলে—জল যেন মুছে সে শেষ করতে পারছে না।

দেবেনও অত্যন্ত দুঃখ পেলে কড়ির কান্না দেখে। সান্ত্বনা দিয়ে বললে—কাঁদিস না। আর কোথাও চাকরি-টাকরি করতে যাস না। কোথা কোনদিন লোভ সামলাতে পারবি না, কি করে ফেলবি—তখন মহাবিপদ হবে।

একটু থেমে সে আবার বললে—তখন ভোলা ছিল, সে ছিল

চৌকিদার, তাছাড়া লোকে তাকে ভালবাসত; তখন তোর দোষ অনেক ঢাকা পড়ত—লোকে ক্ষমাঘেন্নাও করত। এখন মহাবিপদ হবে।

কড়ি আর থাকতে পারলে না। বললে—আমি উ কাজ করব না দেবেন। তোর দিব্যি। তু দেখিস।

এ কথায় দেবেন না হেসে পারলে না। কড়ি তার দিব্যি করছে! দিব্যি করে দিব্যি ভঙ্গ করলে তারই অনিষ্ট হবে। তাতে কড়ির কি? তার মনে পড়ল যাত্রার দলে শোনা একটা ছড়া—পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরে করে নিঘ্যাত।

কড়ি অধিকতর ব্যগ্রতা ভরে বললে—মা কালীর দিব্যি।

দেবেন হাসতে হাসতেই বললে—দেবতার নাম নিয়ে দিব্যি করিস না কড়ি, থাক।

কড়ি বললে, যদি করি তবে হাতে যেন আমার কুষ্ঠ হয়।

দেবেন শিউরে উঠে বললে—না-না। ওসব বলতে নাই। বলিস না।—বলেই সে আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

কড়ি ব্যগ্রভাবে তাকে ডাকলে—দেবেন, দেবেন।

দেবেন সাড়া দিলে না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকের দুপুরবেলা রৌদ্রে যেন চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে। কাকগুলো পর্যন্ত গাছের ভিতরে বসে ঝিমোচ্ছে; কুকুরেরা ছায়াচ্ছন্ন ঠাণ্ডা জায়গায় বসে ধুঁকছে, জনমানবহীন পথ; চারিদিক নিঝুম; গৃহস্থের বাড়ি সব বন্ধ, যে যার দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে; শুধু একটানা বাতাসে তালগাছের পাতার আলোড়নে ঝরঝর শব্দ উঠছে, সে বাতাস আগুনের মত গরম ধুলোয় ভর্তি। দুপুরটা যেন ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

কড়ি পথ দিয়ে চলছিল। বিনা কাজে অকারণে চলছিল। ঘরে বসে তার ভালো লাগে নি। তাই সে চলেছিল। এখন মাঠে কাঠকুটো কুড়োতে যাওয়ার সময় সকালবেলায়। জ্যৈষ্ঠের দুপুরবেলার রোদ বাতাসকে বলে 'ঝলা'। জ্যৈষ্ঠের ঝলা লাগলে অনেক সময় মানুষ শুধু ঘেমে ঘেমেই মরে যায়। আমাশয় তো সাধারণ অসুখ। তাই লোকে বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ দুমাস কাঠকুটো কুড়োতে যায় সকালে। তাছাড়া কড়ি এখন সকালেও কাঠকুটো কুড়োতে যায় না। তার কারণ সকল বাগানেই আম-কাঁঠালের

গাছ, এখন আম-কাঁঠাল পাকবার সময়, বাগানে ঢুকলেই নিশ্বাসের সঙ্গে বুক ভরে ওঠে পাকা ফলের মিষ্টি গন্ধে; অন্য মানুষের কথা কড়ি জানে না, কিন্তু ওই গন্ধ নাকে এলেই কড়ির মুখ জলে ভরে ওঠে, চোখ আপনা থেকেই গাছের মাথার দিকে ফেরে—সন্ধান করে কোথায় আছে উৎকৃষ্ট ফলটি। চুরি করবার দুর্বার প্রবৃত্তি তার বুকের ভিতর যেন লক-লক করে ওঠে। তাই সে যায় না কাঠকুটো কুড়োতে। সে আর চুরি করবে না। কিছুতেই চুরি করবে না।

বাউড়ী পাড়া পার হয়েই গোবিন্দবাবুদের খিড়কি। খিড়কির পুকুরটার পাড় দিয়েই একটা মানুষ হাঁটার সরু পথ, ও পথ দিয়ে পুরুষ যেতে পায় না, মেয়েরা যাওয়া-আসা করে। কড়ি সেই পথ দিয়ে চলেছিল। কোথায় যাবে তার কোনো ঠিক ছিল না। সকাল থেকে বাড়িতে বসে বসে বাড়িটাই তার অসহ্য বোধ হয়ে উঠেছিল, তাই সে চলে এসেছে। অস্পষ্টভাবে শুধু মনে হয়েছিল যদি দেবার দেখা মেলে তবে তাকে কয়েকটা কথা বলে আসবে। বলে আসবে, বুঝিয়ে দিয়ে আসবে, সে চুরি করে না। কিছুক্ষণ গল্পও করে আসবে। বাড়ি থেকে বার হতে গিয়ে মনে হ'ল কাপড়খানা ময়লা। একটু ভেবে সে একখানা ফরসা শাড়ি পরলে। আরও একটু ভেবে মাথার চুলে একবার চিরুনি দিলে; তারপর একটা পান খেয়ে সে বার হ'ল। কিন্তু দেবেন বাড়িতে ছিল না। কোথায় খাটতে গেছে বোধহয়। দেবেনের বাড়িতেও কেউ নেই যে, জিজ্ঞাসা করে জানা যায়! সেখান থেকে বেরিয়ে অকারণে বিনা কাজেই সে চলেছিল।

বাবুদের খিড়কির চারিপাশে খুব ঘন সারিবন্দী তালের গাছ; কোনো একটা গাছের মাথার উপরে বসে একটা চিল ডাকছে তীক্ষ্ণস্বরে। উঃ, কী তীক্ষ্ণ স্বর! এই ঝাঁ-ঝাঁ করা দুপুরের আগুনের তপ্ত ঝরঝরে ঝড়ো বাতাস চিরে চলছে যেন।

ও কে? কে যেন ঘাট থেকে উঠে চলে গেল! বাবুদের বাড়িরই কোনো বউ কি মেয়ে হবে। ঝলমলে শাড়ি, আর মেয়েটির অনাবৃত একটি হাতের গয়নাগুলি দুপুরে রৌদ্রের ছটায় ঝকমক করছে। পিছন দিক থেকে কড়ি ঠিক চিনতে পারলে না।

ঘাটের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল। বাঁধানো ঘাটের ঠিক মাথার উপরেই মেয়েটির আলতা-পরা পায়ের ভিজে ছাপ পড়েছে,

আলতার ছাপ আঁকা গোটা পাখানির ছাপ উঠে গেছে শানের উপর। ছাপ একটি নয়, বরাবর চলে গেছে জল পর্যন্ত। সধবা ভাগ্যমানী মেয়ে।

ওটা কি? একেবারে জলের ধারের সিঁড়িটার উপর ওটা চকচক করছে কি? কড়ির বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করে উঠল। জনহীন চারিদিক—কড়ি একবার চারিদিকটা ভালো করে দেখে নিলে, তারপর অত্যন্ত সন্তর্পিতভাবে পা ফেলে সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়াল। কানের একটা দুল। খসে পড়ে গেছে, বউটি জানতে পারে নি। গিনি সোনার দুল—রৌদ্রের ছটায় আগুনের মত জ্বলছে। বউটি জানতে পারে নি, কোনো রকমে আলগা হয়ে গিয়েছিল, পড়ে গেছে। কিন্তু শব্দও কি হয় নি? নিশ্চয় হয়েছিল, বউটির খেয়াল ছিল না। খেয়াল হবে কি? কড়ির মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। জানতে পারবে কি? বাড়িতে হয়ত তার স্বামী তার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। তার কি খেয়াল থাকে, না থাকতে পারে?

উঃ, আগুনের মত জ্বলছে! কড়ি খানিক হেঁট হ'ল কুড়িয়ে নেবার অভিপ্রায়েই। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে সোজা উঠে—ছুটে—হ্যাঁ, ছুটেই সেখান থেকে পালিয়ে গেল। না—সে ও কাজ আর করবে না।

দু'পাশে ভদ্রজনদের বাড়ি নিস্তব্ধ। লোকজন সব ঘুমুচ্ছে। কড়ি প্রত্যেক বাড়িটিরই হালহদিস জানে—কোন কোন বাড়ির কোনখানে ভাঙা গোপন প্রবেশপথ আছে, সে তার নখদর্পণে। বাড়িতে শাড়ি শুকুচ্ছে, রঙিন শাড়ি, সৌখীন পাড়ওয়ালা শাড়ি, একটা বাড়িতে শান্তিপুরে শাড়িও ঝুলছে একখানা। কড়ির বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করছে। সে প্রাণপণে ছুটছে। অনেকটা এসে পড়ল। বাবুদের বৈঠকখানার সারি—দু'পাশে বাবুদের বৈঠকখানা, মাঝখান দিয়ে পথ। এখানে এসে সে থামল। এখানে থাকবার মধ্যে আছে দু-চারটে ফুলের গাছ, খড়, ধানের মরাই। কড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে চলছিল।

সামনেই সেই বাবুদের বৈঠকখানা।

কড়ি দাঁড়াল। তার বুকের ভিতরটা অপূর্ব সান্ত্বনার আনন্দে ভরে উঠল—সে আজ 'সোনার দব্যি' হেলায় ফেলে দিয়ে এসেছে, ছোঁয় নাই। বাবুদের সেই ছেলেটিকে এ কথাটা বলতে পারলে তবে তার তৃপ্তি হয়।

বাবুদের বৈঠকখানায় হাসির আওয়াজ উঠছে।

—ছক্কা—ছক্কা—ছক্কা—কলরব উঠল। দুপুরবেলা ঘরে দরজা দিয়ে তাস খেলছে বাবুরা।

কড়ি আর থাকতে পারলে না, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল।

সকলে বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালে। সেই বাবুটি বললে—কি? কি চাই তোর?

কড়ি বুঝতে পারলে না কি বলবে।

—কি চাই এখানে?—রূঢ়স্বরে সে প্রশ্ন করলে।

কড়ি ঢোক গিলে বললে—আজ্ঞে জন্ম-মিত্যুর খাতাটা, নিকে নোব।

সে অবাক হয়ে কড়ির মুখের দিকে চেয়ে বললে—তুই ক্ষেপে গিয়েছিস নাকি?

—আজ্ঞে?

—ভোলা মরে গেছে, জন্মমৃত্যুর খাতার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি? সে তো লেখাবে নতুন চৌকিদার।

কড়ি এবার একরকম ছুটেই পালিয়ে এল। তবুও দাওয়া থেকে নামবার সময় সে শুনলে একজন বলছে—ব্যাপার কি? পাগল?

—না—না। মেয়েটা পাকা চোর। বোধহয় দুপুরবেলা চুরি করতে বেরিয়েছে।

—কিন্তু দেখতে তো বেশ মেয়েটা!

—ওদিকে চেয়ো না।

—কেন?

—চোর হোক, ছোটলোক হোক, মেয়েটি কিন্তু সেদিকে আশ্চর্য রকম ভালো। সত্যিকার সতী মেয়ে।

কড়ি ছুটে পালিয়ে এল।

সন্ধ্যেবেলা কড়ি ওই কথাই ভাবছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যা, চারিদিক এখনও গরম হয়ে আছে—তবুও হাওয়া অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কড়ি উঠোনে একখানা চ্যাটাই পেতে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশে চাঁদ্র ঝলমল করছে। অকারণে তার কেবল কান্না আসছে। এমনি গরমের সময় চাঁদনী রাতে ঠিক এখানটিতেই চ্যাটাই বিছিয়ে সে আর ভোলা বসে থাকত। কোনোদিন সে

শুয়ে থাকতো ভোলা বসে তামাক খেত, কোনোদিন বা ভোলা শুয়ে থাকত, কড়ি দিত তার মাথার চুল টেনে। একটা মানুষের অভাবেই ঘরখানা খাঁ খাঁ করছে। পাড়াপড়শীর ঘরে গেলে সঙ্গ পাওয়া যায়, কিন্তু কড়ি যায় না। ভোলা থাকতে তো যেতই না, এখনও যায় না। লোকে সন্দেহ করে। আবার তার মনে পড়ে গেল, সে আজ 'সোনার দবি্য' হেলায় ফেলে দিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু বাবুদের ছেলেটা তাকে বললে—। সত্যিই তার চোখ জলে ভরে গেল।

—কড়ি। কড়ি রইছিস ?

কড়ির বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। দেবনা! দেবেনের গলা। দেবেনকে সে বলবে আজকের কথা।

—কড়ি!

—দেবেন! এস।

—অঃ। তুই যে এবার কি হলি—এস বলছিস।

—তোমাকে খাতির করছি।

—খাতির! তা—। দেবেন হাসলে।—তা খাতিরের খবর এনেছি তোর লেগে।

কড়ি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেবেনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—বস! ভারি গোপন কথা ভাই।

—বল। কড়ির গলা কাঁপতে লাগল।

—আগে দিব্যি কর, কাউকে বলবি না।

—কালীর দিব্যি। কাউকে বলব না।

—গোপালপুরের হরেরাম পোদ্দারকে জানিস ?

—হরেরাম পোদ্দার ? তার তো জ্যাল হয়েছিল—সেই ডাকাতির মাল সামালের লেগে।

—সে ফিরে এসেছে।

—ফিরে এসেছে ?

—হ্যাঁ। এসেই ভোলার খোঁজ করছিল। তা আমি বললাম, ভোলা নাই। তা বললে—যাক ফাঁসি থেকে বাঁচলাম। বেঁচে থাকলে খুন করতাম। তারপর তোর কথা শুধালে।

—আমার কথা ?

—হ্যাঁ। পোদ্দারের সঙ্গে আমার অনেকদিন জানাশোনা কিনা।

পোদ্দারের ঘরে চাকরি করেছি অনেকদিন। তাই হরেরাম এসেই আমাকে ডেকেছিল।

কড়ি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

—পোদ্দার বললে তোর কথা। বললে, ভোলা মরে গিয়েছে, কড়ি আর সাঙা করবে না বলছিস—তা কড়ি যদি আমার কথামাফিক কাজ করে, তবে সব দায়-হায় আমার।

কড়ি বললে—না।

—না লয়, শোন। চুরি-চামারি যা করবি পোদ্দারকে দিবি। পোদ্দার তার দাম দেবে। ধরা পড়লে মামলা-মোকদ্দমা করতে হয় তাও করবে।

—না – না।

—ওই দেখ, ক্ষেপামী করিস না। নইলে তোর এবার জ্যান্ত নিব্যাত তা বলে রাখলাম। এই তো আজই শুনলাম—দুপুরবেলায় বাবুপাড়ায় ঘুরছিলি। বাবুদের বঠকখানায় ঢুকেছিলি। লোক দেখে বলেছিস জন্মমিত্যুর খাতা নেকাতে গিয়েছিলি।

—না না।

—আর না। শোন, আজকে ভাব, ভেবে কাল বলিস আমাকে।

দেবেন চলে গেল। কড়ি মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

পরদিন বেলা তখন জল খাবার বেলা। মুনিষজনের জল খাবার বেলা। মুনিষজনেরা জল খাবার ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরছে। দেবেন বাড়ির পথে কড়ির বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। এতক্ষণ কড়ি নিশ্চয় ফিরেছে কাঠকুটো কুড়িয়ে।

—কড়ি! এই কড়ি! কড়ি! অ-কড়ি!—ওই তো কুটো কুড়োবার ঝুড়িটা পড়ে রয়েছে। চারিদিক চেয়ে দেবেন দেখলে ঘরের দরজার শেকল খোলা রয়েছে—শুধু ভেজানো আছে। কড়ি কি ঘরে শুয়ে আছে? দরজা ঠেলে দেবেন অবাক হয়ে গেল। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ।

—কড়ি! কড়ি! কড়ি! কড়ি!

উদ্বেগপূর্ণ কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই সে দরজায় ধাক্কা দিলে। পরক্ষণেই কিন্তু তার ভয় হ'ল। সে ছুটে বেরিয়ে এল কড়ির বাড়ি থেকে। ছুটে গেল পাড়ার মাতব্বর নোটনের কাছে।

লোকজনের মধ্যে কে যে উৎকণ্ঠিত কৌতূহলের আতিশয্যে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে সে কথা ঠিক কেউ জানে না—কিন্তু দরজাটা খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে কড়িকাঠে দড়ি টাঙিয়ে কড়ি গলায় ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলছে।

নোটন বললে—বেরিয়ে আয় সব। কেউ কিছু নাড়িস না, থানায় খবর দে।

দারোগাবাবু সুরতহাল রিপোর্ট লেখা শেষ করলেন—

'মেয়েটির আত্মহত্যার কারণ কিছু জানা যায় না। তবে যেরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে স্বামীর মৃত্যুর আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়াই এরূপ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ মৃত স্বামীর প্রতি গভীর আসক্তি ছিল মেয়েটির। অথবা মেয়েটি কোনো কিছু চুরি করিয়া ধরা পড়িবার আশঙ্কায় এরূপ করিয়াছে এমনও হইতে পারে। কারণ মেয়েটি স্বভাব-চোর ছিল। পূর্বে বহুবার চুরি করিয়াছে। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, গতকাল দ্বিপ্রহরে সে চুরির অভিপ্রায়েই ভদ্রপল্লীতে ঘোরাফেরা করিয়াছে।'

দারোগা উঠলেন, বললেন—লাশ জ্বালিয়ে দিতে পার তোমরা।

## তাসের ঘর

অমর শখ করিয়া চায়ের বাসনের সেট কিনিয়াছিল। ছয়টা পিরিচ, পেয়ালা, চাদানি ইত্যাদি রঙ-চঙ করা সুদৃশ্য জিনিস, দামও নিতান্ত অল্প নয়—চার টাকা। চার টাকা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অনেক।

অমরের মায়ের হুকুম ছিল, সেটটি যত্ন করে তুলে রেখো বউমা, কুটুম্বসজ্জন এলে, ভদ্রলোকজন এলে বের করো।

কলিকাতা-প্রবাসী হরেন্দ্রবাবুরা দেশে আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বাড়ির মেয়েরা অমরদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিবেন; তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে বাড়িতে বেশ সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন, চায়ের সেটটা আজ বের কর তো গৌরী।

গৌরী বাড়ির মেয়ে—অমরের অবিবাহিতা ভগ্নী। মা চাবির

গোছাটা গৌরীর হাতে দিলেন। গৌরী বাসনের ঘর খুলিয়া জার্মান-সিলভারের ট্রে-সমেত সেটটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, পাঁচটা কাপ রয়েছে কেন মা, আর একটা কাপ কি হ'ল? এই দেখ বাপু, সবে এই আমি বের করে আনছি, আমায় দোষ দিও না যেন।

বিরক্ত হইয়া মা বলিলেন, দেখ না ভালো করে খুঁজে, ঘরেই কোথাও আছে। পাখা হয়ে উড়ে তো যাবে না।

গৌরী সেটটা সেইখানে নামাইয়া আবার ভালো করিয়া ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, পাখাই হ'ল, না কেউ খেয়েই ফেলল—সে আমি জানি না বাপু, তবে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দুমদাম করিয়া মা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, তোমার দোষ কি মা, আমার কপালের দোষ। তোমরা চোখ কপালের ওপর তুলে কাজ কর, নীচের জিনিস দেখতে পাও না।

গৌরীর চোখ হয়ত কপালের উপরেই উঠিয়া থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৌরীর অপরাধ প্রমাণিত হইল না। পেয়ালাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মা হাঁকিলেন, বউমা!

বউমা—অমরের স্ত্রী শৈল—উপরে তখন ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া অতিথিদের বসিবার স্থান করিতেছিল, সে নীচে আসিয়া শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় ডাকলেন?

শাশুড়ী বাসন-অন্ত প্রাণ, সিন্দুকের চাবি পুত্রদের দিয়া বাসনের ঘরের চাবি লইয়াই বাঁচিয়া আছেন। পেয়ালাটার খোঁজ না পাইয়া ফুটন্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মত সশব্দে জ্বলিতেছিলেন. তিনি বলিলেন, হ্যাঁ গো রাজার কন্যে, নইলে বউমা বলে ডাকা কি ওই বাউড়ীদের, না ডোমেদের?

শৈল নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর করা তার অভ্যাস নয়।

শাশুড়ী বলিলেন, একটা পেয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না কেন, কি হ'ল?

একটু নীরব থাকিয়া বধূ বলিল, ও আমিই ভেঙে ফেলেছি মা।

শাশুড়ী কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বেশ করেছ মা, কি আর বলব বল!

সত্য কথা, এমন অকপটভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে অপরাধীকে মার্জনা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন, ও পাঁচটাকেও ফেলে দেব আমি চুরমার করে ভেঙে।

রাগ গিয়া পড়িল চায়ের সেটটার উপর।

শৈল সবই নীরবে সহ্য করে, সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, ভেঙেছ বলা হ'ল বেশ হ'ল, আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, ওপরের কাজ সেরে এস, জলখাবারগুলো করতে হবে।

শৈল উপরে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে হাসি মুখে আসিয়া রান্নাঘরে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ীর মনের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছিল, বলিলেন, নাও তোমাদের দেশের মত খাবার তৈরি কর।

শৈল খাবারের সাজ-সরঞ্জাম টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, সমস্তর ভেতরেই মাছের পুর দোব তো মা?

—অ্যাঁ, মাছের পুর? হ্যাঁ, তা দেবে বইকি, বিধবা তো কেউ আসছে না।

ময়দার ঠোঙার ভিতরে মাছের পুর দিতে দিতে শৈল বলিল, জানেন মা, এর সঙ্গে যদি একটুখানি হিঙ দেওয়া হ'ত—ভারি চমৎকার হ'ত। বাবার আমার হিঙফিঙ কোনো জিনিস ভালো লাগে না। আর যে-সে হিঙ আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না; আফগানিস্থান থেকে কাবুলী সব আসে, তারাই দিয়ে যায়।

শাশুড়ী বলিলেন, পশ্চিম ভালো জায়গা মা, আমাদের পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে কি তুলনা হয়, না সে সব জিনিস পাওয়া যায়?

শৈল বলিল, পশ্চিমেও সে হিঙ পাওয়া যায় না মা কাবুলীরা সে সব নিজেদের জন্য আনে, শুধু বাবাকে খুব খাতির করে কিনা, টাকাকড়ি অনেক সময় নেয়—তাই সে জিনিস দেয়। শুধু কি হিঙ, যখন আসবে তখন প্রত্যেকে আঙুর, বেদানা, নাশপাতি, বাদাম, হিঙ—এসব ছোট ছোট ঝুড়ির এক এক ঝুড়ি দিয়ে যায়। পাঁচজনের মিলে সে হয় কত! কাঁচা জিনিস অনেক পচেই যায়।

ও-ঘরের বারান্দা হইতে ননদ গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, এই আরম্ভ হ'ল এইবার।

অর্থাৎ বাপের বাড়ির গল্প আরম্ভ হইল। সত্য কথা, শৈলর ওই এক দোষ; বিনীত, নম্র, মিষ্টমুখী, সুন্দরী বউটি প্রত্যেক কথায় তাহার বাপের বাড়ির তুলনা না দিয়া থাকিবে না।

পাশের বাড়িতে তুমুল কোলাহল উঠিতেছিল, শাশুড়ী এবং বধূতে কলহ বাধিয়াছে।

শৈলর শাশুড়ী বলিলেন, যা হবে, তাই হোক মা। আমার বউ ভালো হয়েছে, উত্তর করতে জানে না; দোষ করলে বকব কি, মুখের দিকে চাইলে মায়া হয়।

শৈল বলিল, ওঁর ছেলে স্ত্রীকে শাসন করেন না কেন? জানেন মা, আমার দাদা হলে আর রক্ষে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে বউকে হয়ত বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একবার বউদি কি উত্তর করেছিলেন মায়ের সঙ্গে, দাদা তিন মাস বউদির সঙ্গে কথা কন নি। শেষে মা আবার বলে-কয়ে কথা বলেন। তবে দাদার আমার বড্ড বাতিক—খদ্দর পরবে হাঁটু পর্যন্ত, জামা সেই হাতা-কাটা—এতটুকু। তামাক না, বিড়ি না, সিগারেট না,—সে এক বাতিকের মানুষ!

শাশুড়ী বোধ হয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, নাও নাও, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নাও; দেখো, যেন মাছের কাঁটা না থাকে।

শৈল বলিল, ছোট মাছ—কাঁটা বাছতেই হাত চলছে না মা; তবে এই হয়ে গেল।

কড়ায় এক ঝাঁক সিঙাড়া ছাড়িয়া দিয়া, সে আবার বলিল, মা আমার কক্ষণো ছোট মাছ বাড়িতে ঢুকতে দেন না। দু'সেরের কম মাছ হলেই, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেবেন। কুঁচো-মাছের মধ্যে ময়া, আর কাঠ-মাছের মধ্যে মাগুর।

শাশুড়ী বাধা দিয়া বলিলেন, নাও নাও; সেরে নিয়ে চুল-টুল বেঁধে ফেল গে।

কেশপ্রসাধন-অন্তে শৈল কাপড় ছাড়িতেছিল।

ননদ গৌরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল —উঃ, রঙ বটে তোমার বউদি! তুমি যা পরবে, তাতেই তোমাকে সুন্দর লাগবে, আর আমাদের দেখ না, যেন কাঠ পুড়িয়ে—

শৈল বলিল, এ যে দেবার নয় ভাই, নইলে তোমাকেও দিতাম। আমার আর কি রঙ দেখছ! বাবা মা দাদা আমার অন্য বোনদের যদি দেখতে, তবে দেখতে রঙ কাকে বলে; ঠিক একেবারে গোলাপফুল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি বউদি, তোমার চেয়েও ফরসা রঙ!

—হ্যাঁ ভাই, বাড়ির মধ্যে আমিই কালো।

শাশুড়ী আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন, আর কত দেরি বউমা, ওরা যে সব এসে গেছেন।

শৈল তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল, এই যে মা, হয়ে গেছে আমার।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের মহার্ঘ্য উজ্জ্বল সজ্জা ভূষণ রূপ সমস্তকে লজ্জা দিয়া শৈল আবির্ভূতা হইল—নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মত।

প্রবাসিনীর দল মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, শৈল হাসিমুখে প্রণাম করিল।

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, এ যে চাঁদের মত বউ হয়েছে তোমার দিদি। লেখাপড়া-টড়াও জানে নাকি ?

শৈল মৃদুস্বরে বলিল, স্কুলে তো পড়ি নি, বাবা স্কুলের শিক্ষা বড় পছন্দ করেন না। বাড়িতে পড়েছি, ম্যাট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড শেষ হয়েছিল, তারপরই—

কথাটা অসমাপ্ত থাকিলেও ইঙ্গিতে সমাপ্ত হইয়া গেল।

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, কে জানে মা, আজকাল কি যে হাল হ'ল দেশের, মেয়েদের আর কলেজে না পড়লে বিয়ে হচ্ছে না। আমার বউরা তো কলেজে পড়ছিল সব ; বিয়ের পর সব ছাড়িয়ে দিলাম।

শৈল উত্তর দিল, কলেজের কোর্স আমিও কিছু পড়েছি। তবে আমার বোনেরা সব ভালো করে পড়ছে ; বাড়িতে দাদাই পড়ান, পড়াশোনায় দাদার ভয়ানক বাতিক কিনা, জানেন—বছরে পাঁচ-সাতশ টাকার বই কেনেন—বাঙলা, ইংরেজি। বিলেত থেকে ইংরেজী বই আনবেন। কাজকর্ম যদি করতে বলবেন মা, কাজকর্ম অবিশ্যি বাবারই, বিজনেস আছে—সেই বিজনেস দেখতে বসেন তো বলবেন, সম্মুখে জ্ঞানসমুদ্র মা, চোখ ফেরাবার আমার অবকাশ নাই।

—কোথায় তোমার বাপের বাড়ি ?

—এলাহাবাদ। এলাহাবাদ গেছেন নিশ্চয়ই, আমাদের সেখানে তিন পুরুষ বাস হয়ে গেল। বাবা সেখানে কনট্রাক্টরি করেন।

—কি রকম পান-টান ?

—আমি তো জানি না। তবে মেঝভাই বলেন মাঝে মাঝে,

এরকম করে আর চলবে না মা, তুমি বাবাকে বল। পাকা বাড়িগুলো ভাড়া দিয়ে নিজে সেই খোলার বাড়িতে থাকবেন, টাঙায় চড়ে কাজ দেখে বেড়াবেন, মোটর কিনবেন না, এ করে চলবে না। বাবা বলেন, এ আমার পৈতৃক বাড়ি, যেমন আছে তেমনই থাকবে, ভাঙবও না, অন্য কোথাও যাবও না। আর গাড়ি, গাড়িও আমি কিনব না, ছেলেরা বিলাসী হবে। আমি রোজগার করছি, তারা যদি না পারে! জানেন, লোকে বলে—মহেন্দ্রবাবু এক হিসাবে সন্ন্যাসী!

শৈল কথা শেষ করিয়া মৃদু মৃদু হাসি হাসে।

প্রবসিনী গিন্নী একবার শৈলর শাশুড়ীকে বলিলেন, তাহলে ছেলের তোমার বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে দিদি। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘর। তত্ত্ব-তল্লাশ করেন কেমন বেয়াইরা?

বিচিত্র সংসার, বিচিত্র মানুষের মন, কোন কথায় কে যে আঘাত পায়, সে বোঝা বোধকরি বিধাতারও সাধ্য নয়। 'তোমাদের চেয়ে বড় ঘর'—এই কথাটুকুতেই অমরের মা আহত হইয়া উঠিলেন, তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, কে জানে দিদি, বড় না ছোট, সে জানি না। তবে বউমাই বলেন, বাপেদের এই, বাপেদের ওই; কিন্তু তত্ত্ব-তল্লাশও দেখি না, আজ দু-বছর ওই দুধের মেয়ে এসেছে, নিয়ে যাওয়ার নাম পর্যন্ত নেই।

শৈল মুহূর্তে বলিয়া উঠিল, জানেন তো মা, বাবার আমার অদ্ভুত ধরন। তিনি বলেন, যে বস্তু আমি দান করলাম, সে আবার আমি কেন আমার বলে ঘরে আনব! তবে যাকে দান করলাম সে যদি স্বেচ্ছায় নিয়ে আসে, তখন তাদের আদর করব, আমার বলব। আর তত্ত্ব-তল্লাশ এত দূর থেকে করা সম্ভব হয়ে উঠে না; কিন্তু টাকা তো চাইলেই দেন তিনি, যখন চাইবেন তখনই দেবেন।

শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, কি বললে বউমা, তোমার বাবা আমাদের টাকা দেন—কখন, কোন্ কালে?

শৈল বলিল, আপনাদের কথা তো বলি নি মা; আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন—একশ, পঞ্চাশ, আশী—চাইলেই তিনি দেন, কেন দেবেন না?

শাশুড়ীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। শুধু স্বগ্রামবাসী নয়, উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রবাসিনী—দেশ-দেশান্তরে এ সংবাদ রটিয়া যাইবে। অমরের মায়ের মাথা কাটা গেল।

তিনি বলিলেন, ভালো, অমর আসুক, আমি জিজ্ঞাসা করব। কই, ঘুণাক্ষরেও তো আমি জানি না!

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, তোমায় হয়ত বলে নি অমর। দরকার হয়েছে, শ্বশুরের কাছে নিয়েছে।

অমরের মা বলিলেন, সে নেবে কেন ভাই? সে নেওয়া যে তার অন্যায়—নীচ কাজ। ছিঃ, শ্বশুরের কাছে হাত পাতা, ছিঃ!

অমর কাজ করে কলিকাতায়, সেখানে সে অর্ডার-সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসা হইলেও ক্ষুদ্র তাহার আয়তন, সঙ্কীর্ণ তাহার পরিধি, তবুও সে স্বাধীন; তাই মাসে দুইবার করিয়া সে বাড়ি আসিয়া থাকে। অমরের মা রোষকষায়িত নেত্রে পুত্রের আগমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের সম্মুখে যে অপমান তাঁহার হইয়াছে, সে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। শুধু তাঁহার সংসারের অসচ্ছলতাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাঁহাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিতে হইয়াছে। এ কয়দিন বধূর সঙ্গেও একরূপ বাক্যালাপও করেন নাই। শৈল অবশ্য সে বিষয়ে দোষী নয়, সে সদাসর্বদাই মুখে হাসিটি মাখিয়া শাশুড়ীর আজ্ঞার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সংসারের নিয়ম কাল অগ্নির উত্তাপও হরিয়া থাকে, মনের আগুনও নিবিয়া আসে। কিন্তু শৈলর দুর্ভাগ্য, শাশুড়ীর মনের আগুন-শিখা হ্রস্ব হইতে-না হইতে ইন্ধনের প্রয়োগে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পাড়ার ঘরে-ঘাটে এই লইয়া যে কানাকানি চলিতেছিল, সেটা ভালোভাবেই ক্রমশ জানাজানি হইয়া গেল।

সেদিন সরকারদের মজলিসে একদফা প্রকাশ্য আলোচনার সংবাদ অমরের মা স্বকর্ণেই শুনিয়া আসিলেন।

দিন দশেক পরেই কিসের একটা ছুটি উপলক্ষে অমর বাড়ি আসিবার কথা জানাইয়া দিল। শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কথাটা মিথ্যা, বার বার সঙ্কল্প করিয়াও সে এ বিষয়ে স্বামীকে কোনো কথা লিখিতে পারে নাই—কোনো অনুরোধ জানাইতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হইয়াছে। তাহার হাত চলে নাই, ঠোঁট কাঁপিয়াছে, চোখে জলও দেখা দিয়াছে; সে চিঠির কাগজখানা জড়ো করিয়া মুড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। শৈল আপনার শয়নকক্ষে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়

স্বামীর জন্য বসিয়া রহিল, অমর আসিলেই সে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িবে।

অকস্মাৎ অমরের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে চোরের মত নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া সে আশ্বস্ত হইল। ক্রোধের প্রসঙ্গ তাহাকে লইয়া নয়, অমর বচসা জুড়িয়া দিয়াছে কুলীর সহিত।

—এই আধ মাইল—মালের ওজন আধ মণ পঁচিশ সের, তোকে দু-আনা দিলাম—আবার কত দেব ?

লোকটাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিতেছিল, তখন আপনি চুকিয়ে নেন নাই কেন মশায় ? তখন যে একেবারে হুকুম ঝাড়লেন—এই, ইধার আও। আমাদের রেট তিন আনা করে—ছ্যান, দিতে হবে।

—নিকালো বেটা হারামজাদা, নিকালো বলছি—এই নে পয়সা, কিন্তু এখুনি নিকালো সামনে থেকে বলছি।

পয়সা ফেলিয়া দিয়া অমর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বাড়ি ঢুকিল।

—দেখ না, লোকসান যেদিন হয় সেদিন এমনি করেই হয়। পঞ্চাশটা টাকা একজন মেরে দিয়ে পালাল, তারপর ট্রেন ফেল, আবার বাড়ি এসেও চারটে পয়সা লোকসান।

মাও বোধকরি প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শান্ত অথচ শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, তার জন্যে তোমার চিন্তা কি বাবা ? বড়লোক শ্বশুর রয়েছেন, তাঁকে লেখ, তিনিই পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ না বুঝিলেও শ্লেষতীক্ষ্ণ বাক্যশর আঘাত করিতে ছাড়ে নাই। অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার মানে ?

মা বলিলেন, সেই জন্যই তো তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা। আমি শুনব—তুমি আমাকে তোমার রোজগারের অন্ন খাওয়াও, না তোমার শ্বশুরের দানের অন্নে আমাকে পিণ্ডি দাও ? তুমি নাকি তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাও, আর শ্বশুর তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেন—একশ পঞ্চাশ আশী, যখন যেমন তোমার দরকার হয় ?

ক্লান্ত তিক্তচিত্ত অমরের মস্তিষ্কে মুহূর্তে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, কে, কোন্ হারামজাদা হারামজাদী সে কথা বলে ?

মা ডাকিলেন, বউমা।

শৈলর চক্ষের সম্মুখে চারিদিক যেন দুলিতেছে—কি করিবে, কি বলিবে, কোনো নির্ধারণই সে স্থির করিতে পারিল না।

শাশুড়ী আবার বলিলেন, চুপ করে রইলে কেন বল, উত্তর দাও?

শৈল বিহ্বলের মত বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, বাবা দেন তো।

অমর মুহূর্তে উন্মত্তের মত দেওয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল।

মা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

অমর বলিল, ও বাড়িতে থাকলে আমি জলগ্রহণ করব না।

মা বলিলেন, আমার মাথা কাটা গেল—হরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের কাছে। এমন বউ নিয়ে আমিও ঘর করতে পারব না বাবা।

বিচারক যেখানে বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে বিচার হয় না, বিচারের নামে ঘটে—সেচ্ছাচার। তাই ওইটুকু অপরাধে শৈলের অদৃষ্টে গুরুদণ্ড হইয়া গেল,—সেই রাত্রেই তাহার নির্বাসনের ব্যবস্থা হইল। রাত্রি বারোটার ট্রেনে শৈলর দেবর তাহাকে লইয়া এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেল।

শৈলকে দেখিয়াই তাহার মা আনন্দে বিস্ময়ে আকুল হইয়া বলিলেন, এ কি শৈল, তুই যে এমন হঠাৎ?

শৈল ঢোক গিলিয়া বলিল, কেন মা, আমাকে কি আসতে নেই? তোমরা আনলে না, কাজেই এলাম।

মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মা বলিলেন, ওরে আনতে কি অসাধ, না আমার মনেই ব্যথা হয় না, কিন্তু কি করব বল?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, বাবুর রোজগার কমে গেছে, বাজার নাকি বড় মন্দা। তার ওপর হৈমির বিয়ে এসেছে—খরচ যে করতে পারছি না মা।

শৈল অবকাশ পাইয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মা বলিলেন, সঙ্গে কে এসেছে শৈলী? জামাই?

শৈল বিবর্ণ মুখে বলিল, না, আমার দেওর এসেছে।

—কই সে—ওমা, বাইরে কেন সে?—ঘরের ছেলে। ওরে দাই, দেখ তো, বড়দিদির দেওর বাইরে আছেন, ডাক তো। বল—মা ডাকছেন।

শৈলর বুক দুরদুর করিতেছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অমরের

আদেশ ছিল, সে যেন সেখানে জলগ্রহণ না করে। কঠিন শপথ দিয়া আদেশ দিয়াছে অমর।

দাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই, কেউ তো নেই।

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে কি! কোথায় গেল সে?

শৈল বলিল, তাকে ট্রেন ধরতে হবে মা, সে চলে গেছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে মা যেন অভিভূত হইয়া গেলেন।—ট্রেন ধরতে হবে—চলে গেছে, সেকি!

শৈল বলিল, তাকে সিমলে যেতে হবে মা—একটা খুব বড় কাজের সন্ধান করতে যাচ্ছে; যে ট্রেনে আমরা নামলাম, এই ট্রেনই সে গিয়ে ধরবে, থাকবার তার উপায় নেই।

মা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, ফেরবার সময় নামতে বলে দিয়েছিস তো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈল বলিল, বলে তো দিয়েছি মা, কিন্তু নামতে বোধহয় পারবে না, খুব জরুরী কাজ কিনা। সিমলে থেকে কলকাতায় যাবে একটা কার চিঠি নিয়ে, পৌঁছুতে না পারলে তো সব মিছে হবে।

এই সময়েই শৈলর জ্ঞানান্বেষী বড়দাদা বাড়ি ঢুকিল। পরনে তাহার খদ্দর সত্য, কিন্তু জরিপার শৌখিন খদ্দরের ধুতি, গায়েও শৌখিন খদ্দরের পাঞ্জাবি, মুখে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট; হাতে কতকগুলি মাছ ধরিবার চারের উপকরণ।

শৈলকে দেখিয়াই সে বলিল, আরে, শৈলী কখন, অ্যাঁ?

হাসিমুখে শৈল বলিল, এই তো দাদা। ভালো আছেন আপনি?

—হ্যাঁ। তা বেশ, কই, তুই নতুন লোক, খাস বাঙলা দেশের মানুষ—কই, দে তো এই চারগুলো তৈরি করে, দেখি তোর হাতের কেমন পয়; মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে—এক জমিদারের তালাওয়ে!

শৈল উপকরণগুলি হাতে লইয়া বলিল, চলুন না দাদা, একবার আমাদের ওখানে, কত মাছ ধরতে পারেন একবার দেখব।

—তোদের ওখানে পুকুরে খুব মাছ, না রে?

—আমাদেরই পুকুরে খুব বড় বড় মাছ—আধ মণ, পনরো সের, পঁচিশ সের এক-একটা মাছ। জানেন দাদা, তখন প্রথম গেছি, একটা আঠারো সের কাতলা মাছ এনে দেওর বললে, বউদিকে কুটতে হবে।

ওরে বাপ রে, সে যা আমার ভয়। এখন আর আমার ভয় হয় না— আধ মণ, পঁচিশ সের মাছ দিব্যি কেটে ফেলি।

—যাবার ইচ্ছে তো হয় রে, হয়ে ওঠে না। কলকাতা যাই, তাও অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সময় হয় না। আবার তুই অবিশ্যি যদি কলকাতায় থাকতিস, তবে নিশ্চয় যেতাম।

শৈল বলিল, আচ্ছা দেখব, আমাদেরও কলকাতায় বাড়ি হবে এইবার—

অর্ধপথে বাধা দিয়া দাদা বলিল, কলকাতায় তোদের বাড়ি হচ্ছে নাকি?

শৈল বলিল, জায়গা কিনেছেন। ধীরে ধীরে হবে এইবার।

মা পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করেন, জামাই এখন বেশ পাচ্ছেন, না রে শৈলী?

শৈল মুখ নত করিয়া বলিল, দেশেও দালান করবেন।

মাস দুয়েক পরই কিন্তু শৈলর মা অনুভব করিলেন, কোথাও একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে, জামাই বা বেয়ান কেহই তো শৈলকে পত্র দেন না, সংবাদ লন না। তিনি স্বামীকে বলিলেন, দেখ, তুমি বেয়ানকে একখানা পত্র লেখ।

মহেন্দ্রবাবু নিরীহ ব্যক্তি। শৈল অন্যের সম্বন্ধে যতই অত্যুক্তি করিয়া থাক, তাহার পিতার উপার্জনকে যতই বাড়াইয়া বলিয়া থাক, পিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যুক্তি সে করে নাই। সত্যই তিনি সাধু প্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর কথায় শঙ্কিত হইয়া পরদিনই বেয়ানকে পত্র দিলেন। লিখিলেন—আমি আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তি; শৈলকে চরণে স্থান দিয়া আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি—প্রার্থনা করি, সে অনুগ্রহ হইতে আমি বা আমার শৈল যেন বঞ্চিত না হই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সেখানে কি ঘটিয়াছে, শৈল কি অপরাধ করিয়াছে। কিন্তু অপরাধ যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কোনো কথা প্রকাশ করে নাই; তবুও এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে কই কোনো আশীর্বাদ তো আসিল না। শ্রীমান অমর বাবাজীবনও তো কোনো পত্র দেন না। দয়া করিয়া, কি ঘটিয়াছে,

আমাকে জানাইবেন; আমি নিজে শৈলকে আপনার চরণে উপস্থিত করিয়া তাহার শাস্তি দিব।

তারপর শেষে আবার লিখিলেন—অমর সংবাদ না দিলেও শৈলর নিকট তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কলিকাতায় বাড়ি করিবে শুনিয়া পরম আনন্দ হইল। আপনার মেজছেলের পরীক্ষার সংবাদ শুনিলাম, কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হইতে পারে নাই। আশীর্বাদ করি বি. এ.-তে সে যোগ্যস্থান লাভ করিবে।

পত্রখানা পড়িয়া অমরের মায়ের চক্ষে জল আসিল।

মনে তাঁহার ক্রোধবহ্নি জ্বলিতেছিল, ইন্ধনের অভাবে সময়ক্ষেপে সে বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। প্রতি পদে তাঁহার শৈলর প্রতিমার মত মুখ মনে পড়িত। বলুক সে মিথ্যা, তবু মিষ্ট কথার সুরটি তাঁহার কানে বাজিত। আজ বেয়াইয়ের পত্র পড়িয়া তাঁহার সকল গ্লানি নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া গেল। শুধু বিদূরিত হইয়া গেল নয়, পুত্রবধূর উপর মন তাঁহার প্রসন্ন হইয়া উঠিল, পত্রের শেষভাগটুকু পড়িয়া আবার তিনি সেখানটা পড়িলেন—কলিকাতায় বাড়ি ইত্যাদি।

তিনি অমরকে পত্র দিলেন। বেয়াইকে লিখিলেন—বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর কোনো অপরাধ হয়? তবে কার্যগতিকে সংবাদ লইতে পারি নাই, সে দোষ আমারই। শীঘ্রই অমর বউমাকে আনিবার জন্য যাইবে।

পত্র পাইবামাত্র শৈল পুলকিত হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

অমর আসিয়াছে। দশ-বারো সেরের একটা মাছ সে সঙ্গে আনিয়াছে। শৈল তাড়াতাড়ি সেটা কাটিতে বসিল।

বলিল, বড় জাতের মাছ বোধহয় ধরা পড়েনি। এগুলো মাঝলাজাত।

ওদিক হইতে ভ্রাতৃজায়া বলিল, এই আরম্ভ হইল। শ্বশুর-বাড়ির অবস্থা ভালো আর কারও হয় না!

রাত্রে অমরের নিকট শৈল নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। অমর একখানা পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, এসব কি বল তো?—'একটি বড় মাছ যেমন করিয়া হউক আনিবে, এখানে আমি আমাদের অনেক পুকুর আছে বলিয়াছি।' বেশ, আমাদের ষোলো-আনা একটাও তো পুকুর

নেই, অথচ—ছিঃ। আর, 'এখানে মুক্তার গহনার চলন হইয়াছে, আমার জন্ম ঝুটা মুক্তার মালা একছড়া'—ও কি, ও কি, কাঁদছ কেন, শৈল, শৈল ?

শৈল বিছানায় মুখ গুঁজিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল। সে কথা যে অমরকে মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়!

## ঘাঁসের ফুল

রাণীগঞ্জ-টাইলে ছাওয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বাংলোটা কলিয়ারীর আপিস। আপিসের উত্তরেই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা খড়ে-ছাওয়া বাংলোটা কলিয়ারীর বাবুদের মেস। বাংলো দুটোর কোলে প্রকাণ্ড বড় খোলা মাঠখানায় অতুল পায়চারি করিতেছিল। চারিদিক অন্ধকার। 'পিট'-গুলার মুখে, বয়লারগুলোর চিমনির মাথায় শুধু আগুনের শিখা হু হু করিতেছে। আর এখানে ওখানে কুলিদের কেরোসিনের কুপি খদ্যোতের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মেসের একটা ঘরে কুলি-রিক্রুটার চন্দ্রকান্ত হুঁকা টানিতে টানিতে সার্ভেয়ারকে বলিতেছিল—আমার ভাই ষোলো আনার মধ্যে সাড়ে পনরো আনা মিছে কথা—সে আমি মিছে কথা বলব না।

বড় টেবিলটার উপরে খনির ম্যাপখানায় নূতন একটা লাইন টানিতে টানিতে সার্ভেয়ার উত্তর দিল—হুঁ—তা নইলে চাকরি থাকবে কেন? আলোটা একটু বাড়িয়ে দেন তো চন্দ্রবাবু। চশমা নইলে আর চলছে না।

পাশের ঘরে লেবার-রেজিস্ট্রার সীতাপতি আপন মনে একখানা ছবি আঁকিতেছিল—সম্মুখে গম্ভীরভাবে আর একজন বসিয়া আছে স্থাণুর মতো—চোখের পলক পর্যন্ত পড়ে না।

তার পাশের ঘরে বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার চশমা-চোখে স্ত্রীকে পত্র লিখিতে-ছিলেন—'এখানে ৵বৃষ্টি খুবই হইয়াছে। ওখানে ৵বৃষ্টির অবস্থা কিরূপ পত্রপাঠ জানাইবে। চাষ-আবাদের অবস্থা বুঝিয়া ধান্যগুলি ধার দিবার ব্যবস্থা করিবে।'

আর একখানা ঘরে লটারীর টিকিট কেনা হইতেছিল। ম্যানেজারের নামে একখানা লটারীর টিকিট-বই আসিয়াছে—সেইখানা হেডক্লার্কবাবু লইয়া বিক্রয় করিতেছিলেন। আট আনা

করিয়া টিকিটের দাম। প্রথম পুরস্কার পাঁচ হাজার-টাকা। কালীপদ একটা ছদ্মনাম খুঁজিয়া সারা হইয়া গেউ। হেডক্লার্কবাবু কলম ধরিয়া বসিয়াছিলেন—বলিলেন—কি নাম দেবে, বল হে কালীপদ ?

কালীপদ বলিল—শ্রীবৎস—কি বলেন ? ও নামে শনির দৃষ্টিও চলে না। দাঁড়ান, দাঁড়ান,—মহালক্ষ্মী কেমন হবে বলুন দেখি ?

একেবারে এ পাশের ঘরে একটি সুরূপ তরুণ হারমোনিয়ম লইয়া গলা সাধিতেছিল—'কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী !' ছেলেটি কলিয়ারীর মালিকদের থিয়েটারে নায়িকা সাজে। এখানে চাকরিও তার সেই জন্য। বেতন বাইশ টাকা ছিল এখন দুই টাকা কমিয়া হইয়াছে কুড়ি।

পাশের বারান্দায় স্টোরকিপার অমূল্য কুলিদের তেল মাপিতে মাপিতে বলিল—তুমি একটা যাত্রার দলে ঢুকে পড়, বুঝলে বিনোদ। মোটা মাইনে হবে। কেন কুড়ি টাকায় পড়ে আছ বল দেখি !—গান থামাইয়া বিনোদ বলিল—ভারি চুক হয়ে গেছে গুদোম-বাবু। সেবার বীণাপাণি অপেরা আমাকে সাধাসাধি করলে। বলে—পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনেতে তুমি ঢোক—তারপর ছ-মাস পরে পঞ্চাশ পরে দেব। তিন বছরে একশ টাকা। তা যাত্রার দল বলে আর— !

অমূল্য বলিল—আমি একটা দোকান করব ভাই। বেগুনী-ফুলুরী কলাই-সেদ্ধ বুঝলে। বউ করে দেবে, একটা ছোঁড়াকে দিয়ে বিক্রি করাব। ভারি লাভ।

গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বিনোদের বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। একটি মেয়ে বলিল—বাড়িতে গান করতে হবে বিনো-কাকা। চল, মা ডাকছে।

অপর মেয়েটি নাকীসুরে বলিল—ধরে নিয়ে যাব, হ্যাঁ।

ছোট ছেলেটি তখন হারমোনিয়মের রিড চাপিয়া ধরিয়া একটা বেসুরের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। বিনোদ হাসিয়া বলিল—চল চল যাই। চিরুনিটা কোথায় রাখলেন গুদোম-বাবু ? আমার আবার ডিউটি আছে—তা চল, দুখানা গান গেয়েই চলে আসবে।

প্রথম মেয়েটি বলিল—বই নিয়ে যেতে বলেছে মা।

কুঠির মালিকদের কয়েকজন এখানে সপরিবারে বাস করেন। বিনোদকে মাঝে মাঝে বাসার-ভিতর গান শুনাইতে হয়, রেলের বাবুদের লাইব্রেরি হইতে উপন্যাস আনিয়া যোগানোও তাহার একটা কাজ।

নিজেই হারমোনিয়মটা লইয়া বিনোদ চলিয়া গেল। গুদাম-বাবু বলিলেন —দেখলে হে বাবুর চুল আঁচড়ানো?

বিমুর ঘরের অংশীদার-বিনোদের পরিত্যক্ত চিরুনিখানা লইয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল—হুঁ।

তারপর আয়নাখানায় নানা ভঙ্গিতে মুখ দেখিয়া বলিল—বেশ আছে বাবা। আর থাকবে না-ই বা কেন বল? চেহারা ভালো, গলা ভালো।

স্টোর-বাবু ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন—বই যোগায়—সেটা বল। আর মেঝেনগুলোকে দেখেছ। টাইম-বাবু বলতে পাগল—

অতুল ভাবিতেছিল হেনরি ফোর্ডে জীবন আরম্ভ করিয়াছিল কাঠের মিস্ত্রী রূপে—এডিসন নামে একটি ছেলে খবরের কাগজ বেচিত। অতুল এখানে আসিয়াছে দেড়শত মাইল পায়ে হাঁটিয়া, পথে বর্ষার নদী—তখন দুকূল পাথার, সেই নদী সে সাঁতার দিয়া পার হইয়া আসিয়াছে। পারের পয়সা দিতে গেলে খাবারের পয়সার অভাব পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। আজ সে কলিয়ারীর ম্যানেজার হইতে চলিয়াছে। এক বৎসর পরে মাইনিং পরীক্ষা দিবে।

অদূরে একটা আলোর পিছনে দুইজন বাবু আসিতেছিল। একজন উচ্চকণ্ঠে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। অতুল বুঝিল। ম্যানেজার আসিয়া বলিলেন—এই যে অতুলবাবু, আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি। আজ খাদে বারুদ জ্বলে গেছে। ক্রমশঃই খাদ গরম হয়ে উঠছে—এখন ফায়ার না হয়।

অতুল মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—গান-পাউডার জ্বলে গেল?

ওভারম্যান খাটো মানুষ, কিন্তু শক্তিশালী দৃঢ়দেহ। সে কথা কয় যেন বক্তৃতা করে। হাত-পা নাড়িয়া অভিনয় করিয়া প্রত্যেক কথাটি বুঝাইয়া দেওয়া তাহার স্বভাব। সে বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। দক্ষিণ দিকের মেন গ্যালারীর পাশে ৫৮নং সুঁদের মধ্যে দেওয়ালে হেই এতখানি এক চাঙড় কয়লা জমে আছে। ঠাণ্ডারাম সর্দার বললে —বাবু, ঐ কয়লাটা দেগে দি। টোটা তোয়ের করে ঠাণ্ডারামকে নিয়ে গেলাম দেখতে—বলি নিজের চোখে একবার দেখে দি। —হঠাৎ গুঁড়ি হইয়া ওভারম্যান বলিল, ঠাণ্ডারাম বারুদের জায়গা নামিয়ে রেখে— আবার খাড়া হইয়া হাত তুলিয়া বলিল—আমাকে দেখাইছে—বলে বাবু—ঐ চাবটা—আর ইদিকে অমনি ধ্যাঁস করে নিয়ে নিয়েছে তখন। সঙ্গে সঙ্গে আলোর একেবারে দিন দীপ্যমান!

একটু থামিয়া তাড়াতাড়ি হাত কয় পিছাইয়া গিয়া ওভারম্যান আবার আরম্ভ করিল—আমি তখন হঠতে লেগেছি। বুঝতে পেরেছি কিনা। ঠাণ্ডা বেটা কিন্তু হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

হাঁ করিয়া বুদ্ধিহীনের অভিনয় করিয়া সে থামিল। তারপর আপনার বাঁ-হাতখানা খপ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল—খপ করে বেটার হাতটা ধরে হিড় হিড় করে আনলাম টেনে।

তারপর সে পাণিপথক্ষেত্রে বিজয়ী আমেদশার মত গম্ভীরভাবে নীরব হইল।

ম্যানেজারটি সাদাসিধা মানুষ—বুদ্ধির মত আকারেও স্থূল। ভদ্রলোক বলিলেন—কি করা যায় অতুলবাবু?

অতুল চিন্তা করিয়া বলিল—ও পিটটায় কাজ বন্ধ করে দিন।

ম্যানেজার বলিলেন—কিন্তু যদি ফায়ারই হয় ধর।

হাসিয়া অতুল বলিল—ফায়ার তো হবেই।

মহা চিন্তান্বিতভাবে ম্যানেজার বলিলেন—তাহলে?

—সে আর আমরা কি করব? আপনি, এখানে যাঁরা মালিক আছেন তাঁদের জানান—আর হেড আপিসেও টেলিগ্রাম করে দিন। তাহলেই খালাস।

ম্যানেজার বলিলেন—তাই তো হে—কলিয়ারীটা আমার নিজের হাতে তৈরি করা—

অতুল হাসিয়া বলিল—চললাম আমি তিন নম্বর পিটে। আমার ডিউটি আছে।

প্রকাণ্ড লোহার বিম—র‍্যাফটারে ছাঁদাছাঁদি করিয়া একটা অতিকায় কঙ্কালের মত গীয়ারহেডটা দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই তলে বিরাটকায় সাড়ে তিনশ ফুট গভীর একটা কূপ মাটির বুক ভেদ করিয়া নামিয়া গেছে। ওপাশে ইঞ্জিন-শেড। তাহার পাশেই দুইটা বয়লারের বুকের ভিতর রাবণের চিতা জ্বলিতেছে। ইঞ্জিন-শেডের বিপরীত দিকে আর একটি ছোট শেড। এটা পিট-ক্লার্কদের আপিস। একদিকে ছোট একখানি বেঞ্চ—মধ্যে একটি টেবিল—এপাশে একখানা চেয়ার। টেবিলের উপর একটা হ্যারিকেন চারিপাশের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে অসহায়ভাবে জ্বলিতেছিল। শেডের বাহিরেই একটা

লোহার ঠেঙোর উপরেই এক চাপ কয়লা দাউ দাউ করিয়া পুড়িতেছে।

সে আগুনে সেঁকিয়া একটি কুলির মেয়ে তাহার ভিজা ঝুড়িটা শুকাইয়া লইতেছিল। চেয়ারে অতুল চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ও পাশের বেঞ্চে বিনোদ, সেই ছেলেটি, একখানা খাতায় কুলিদের উঠা-নামার হিসাব করিতেছিল। ওই ওর কাজ। লেবার-রেজিস্ট্রার পদবী। বিনুর পাশে বসিয়াছিল শ্যামাপদ—ছু-নম্বর ওভারম্যান। সে বলিয়া উঠিল—এই মাগী, ঝুড়িটো কি পোড়ায়ে দিবি নাকি?

এদিকে পিটমাউথে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—ঘং-ঘং-ঘং। খাদের তল হইতে সঙ্কেত হইতেছে, লোক উঠিবে।

উপরের 'টালোয়ান' ঘণ্টার সঙ্কেতে উত্তর দিয়া হাঁকিল—হো—ই। —এ সঙ্কেত ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে।

বিপুল শব্দে ইঞ্জিন গতিশীল হইয়া উঠিল। ইঞ্জিনের গতির সঙ্গে গীয়ারহেডের চাকা বাহিয়া মোটা তারের দড়ায় ঝুলানো একটা লোহার খাঁচা সন সন শব্দে অন্ধকূপের গর্ভে নামিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে পাশের আর একটা দড়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিল। সেই দঁড়া বাহিয়া একটা কেজ পিটের মুখে সশব্দে আসিয়া লাগিল।

খাঁচার মধ্যে চারজন লোক।

বিনু প্রশ্ন করিল—কারা বটিস রে?

উত্তর হইল—আমরা গো—ভক্তার দল। নারায়ণ ভক্তা!

খাঁচার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল—জলসিক্ত কয়লার কালিতে সর্বাঙ্গ ঢাকা বীভৎস কালো মূর্তি। জ্বলন্ত কয়লার আলোয় মনে হয় যেন প্রেত! নগ্নপ্রায়—পরনে শুধু একটা কৌপীন, কাঁধে গাঁইতি, হাতে একটা কেরোসিনের ডিবিয়া। মেয়েদের হাতে ঝুড়ি। কয়লার কালিতে কালো দেহের মধ্যে সাদা তুইটা চোখ দেখিয়া ভয় হয়। কথা কহিলে দেখা যায় সাদা দাঁত। শেডের বাহিরে গিয়া তাহারা উপরের দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়ায়। অতুল ভাবিতেছিল ম্যানেজারশিপ পরীক্ষায় সে প্রথম হইবে। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। খনি-বিজ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে। এই যে আগুন—পৃথিবীর বুকের ভিতর লক্ষ লক্ষ টন কয়লার স্তরের মধ্যে যে বিরাট অগ্নিদাহ—সে আগুন জলে নিভিবে না—সে আগুন নিভাইবার উপায় সে আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু কেন সে নিজের জীবন বিপন্ন

করিয়া পরের উপকার করিতে যাইবে। তাহার জীবনের মূল্য পঞ্চাশ টাকা নয়।

ঘং—ঘং—।

আবার সঙ্কেত হইল। একটা কেজ নামিয়া গেল, একটা উঠিয়া পিটের মুখে দাঁড়াইল—ঘটাং। কেজটার মধ্যে কয়লা বোঝাই টব-গাড়ি—লেবার রেজিস্ট্রার প্রশ্ন করিল, কি বটে, কয়লা না স্লাক?

ওভারম্যান একজন কুলিকে বলিতেছিল—ওরে ইয়া—কি নাম তোর? গুরুচরণা—শুন শুন, ইধারে শুন।

—হোই-হুঁশিয়ার!—ছোট লাইনের উপর কয়লাভর্তি টবগাড়িটা ঠেলিয়া দিয়া টালোয়ান হাঁকিয়া উঠিল। সশব্দে গাড়িটা লাইন বাহিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে পিটের মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিতেছিল। কেজ ওঠে-নামে। গুরুচরণ বলিতেছিল—আমাকে খাদে নামতে বলছেন না-কি?

ওভারম্যান বিরক্তিভরে বলিল—না—বলছি গুরুপুত্তুর আমার হোঁথাকে বসেন দয়া করে—আমি পা পূজা করব।

লেবার-রেজিস্ট্রার বিমু খাতা লিখিতে লিখিতে গুনগুন করিয়া গান করিতেছিল—'ওহে সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজি প্রাতে।'

অতুল মনে মনে একটু হাসিল। সত্যই বেশ আছে ছেলেটি, বাড়িতে মায়ের ছেঁড়া কাপড়ে হয়ত চোখের জল মুছিবার স্থান নাই—আর ও পোশাক পরিয়া রানী সাজে। দুই টাকা মাইনে ওর কাটা যায়—আর ও বাড়ির ভিতর গান শুনাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। কয়লার হিসাব লিখিতে ও গায়, 'সুন্দর তুমি....'

নীচে খাদের তলদেশ হইতে অন্ধকূপ বাহিয়া অতি ক্ষীণ মানুষের সাড়া ভাসিয়া আসিল।

ওভারম্যান বলিল—হাঁকা-হাঁকা।

পিটের মুখে টালেয়োর দুইজনে একটু ঝুঁকিয়া সাড়া দিল—ও—ই।

অতুল একটু অন্যমনস্ক হইয়া চারিপাশের অন্ধকারের দিকে চাহিল। চারিদিকের কলিয়ারীতে কয়লার চাপ গভীর অন্ধকার রাত্রির অঙ্গে লুম্বিত ক্ষতের মত ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে।

ঘং—ঘং—ঘং।

এবার উঠিয়া আসিল আর কয়েকজন কুলি। বিলাসপুর অঞ্চলের অধিবাসী। মেয়েদের অঙ্গে মোটা মোটা রূপ-দস্তার গহনা—হাতে তাগা, গলায় হাঁসুলি, পায়ে বাঁক, নাকে বেসর, কব্জীতে একহাত কাঁসার চুড়ি।

আবার খানিকটা বিরাম। ইঞ্জিন স্তব্ধ, কেজটা নিথরভাবে ঝুলিতেছে। শুধু বয়লারটা স্টীমের শক্তিতে কাঁপে—সে কম্পনের আঘাতে বায়ুস্তর বাহিয়া শেডের খাপরার চালে আসিয়া চালের মধ্যেও কম্পন তোলে। চালের খাপরাগুলো কাঁপে—ছোট একটা জানালা—সেটাও ভূমিকম্প-বিক্ষুব্ধের মত থরথর করিয়া কাঁপে। অবসর পাইয়া কেজম্যান, টালোয়ান কড়ি গুনিয়া রেজিং-এর হিসাব করে।

যেখানে লোহার ঠোঙাটায় কয়লার চাপ জ্বলিতেছিল সেখানে কুলিরা দুই-চারিজন করিয়া আসিয়া জমিতেছিল। ইহারা এইবার খাদের নীচে নামিবে। একটা কেরোসিনের ডিবের আলোতে একটা তরুণী বিড়ি ধরাইয়া দপ করিয়া আলোটা নিভাইয়া দিল। সে বলিল—দে, নামাইয়া দে বাবু। ক-ত বসে রইব ?

অতুল চিন্তা করে, এ ওদের নেশা—না, ক্ষুধার প্রেরণা ?

বিনু বলিল—এখন খাদে গিয়ে তো ঘুমুবি। তারপর সেই রাতে কাজে লাগবি। ঘরে ঘুমুলেই তো পারিস।

তরুণীটি হাসিয়া বলিল—তবে তু একটি গান কর বাবু।

ওভারম্যান বলিল—তু নাচবি বল ?

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—মালকাটা যে মারবে বাবু ধুমাধুম—গতর ভেঙে দিবে আমার। লইলে—

তারপর অকস্মাৎ এক বুড়ীকে ধরিয়া বলে—এই দেখ, ই নাচবে। ইয়ার মালকাটা মরে গেইচে।

আশেপাশের তরুণীর দল হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ওপাশে জ্বলন্ত কয়লার ধারে বসিয়া একটা আঠারো-উনিশ বৎসরের ছেলে অকারণে জ্বলন্ত চুল্লীটায় মারিতেছিল। দূরে এই কুঠিরই সাইডিং লাইনের উপর লোকোমোটিভের বাঁশী তীক্ষ্ণস্বরে বাজিয়া উঠে। অতুল পিছনে ফিরিয়া চাহিল। দক্ষিণে বহুদূরে রেলওয়ে জংশনের ইয়ার্ডে অগণিত বিজলী বাতি সারি সারি স্থির খদ্যোতের মত জ্বলিতেছে। এ-পাশে

বয়লারের চোঙ হইতে ঊর্ধ্বমুখী আগুনের শিখা সাপের জিভের মত লক লক করিতেছে। শিখার মাথায় অন্ধকারের চেয়েও গাঢ়-কৃষ্ণ রাশি রাশি ধোঁয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শিখার মাথায় হাজারে হাজারে আগুনের ফুলকি ফুলঝুরির মত ধোঁয়ার রাশি ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, বুদ্বুদের মত নিভিয়া যাইতেছে।

এদিকে তিন মিনিট চার মিনিট অন্তর কেজ ওঠে, নামে। একদিকে দলে দলে কুলি ওঠে, অন্যদিকে দলে দলে নামে। মানুষের দুর্দান্তপনায় বোবা রাত্রি অস্থির হইয়া ওঠে।

বিনোদ চমকিয়া উঠিল—কে তাহাকে ছোট একটা ঢেলা ছুঁড়িয়া মারিতেছে। লোহার কেজটা সন সন শব্দে নীচে নামিয়া গেল। কূপের মধ্যে খিল খিল হাসি অতি ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

রাত্রি প্রগাঢ় হইয়া আসিয়াছে।

খাদের মুখে সবারই চোখে ঘুম জড়াইয়া আসে। যন্ত্রগুলারও যেন ঘুম পাইয়াছে। কেজ ইঞ্জিন স্তব্ধ—শুধু বয়লারের স্টীমের শব্দ ফ্যাঁস ফ্যাঁ—স। কেজম্যানটাও বেদীর উপর বসিয়া ঢুলিতেছিল। ওভারম্যান দেওয়ালে ঠেস দিয়া গাঢ় নিদ্রামগ্ন—নিঃশ্বাস সশব্দ হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া তন্দ্রামগ্ন।

অতুলের মাথাও ঝিম ঝিম করিতেছিল। হেনরি ফোর্ড কি এডিসনের নাম এখন মনের মধ্যে নাই। মনে পড়ে বাড়ির কথা—মাকে মনে পড়ে। ইচ্ছা হয়, ছুটি লইয়া একবার বাড়ি যাইতে হইবে। অতুল একটা বিড়ি ধরাইল। ধোঁয়াটা ছাড়িতে ছাড়িতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল ঠোঁটে যেন মৃদু হাসি ফুটিয়াছে। হয়ত স্বপ্ন দেখিতেছে।

মেসের কোলাহল নীরব। ক্যাশিয়ার হয়ত স্বপ্নের ঘোরে ক্যাশ মিলাইতেছে। ম্যানেজার হয়ত আগুনের স্বপ্ন দেখিতেছে। কালীপদ হয়ত পাঁচ হাজার টাকার প্রাইজটার খরচের বিলিব্যবস্থা করিতেছে।

ঘং—ঘং—ঘং। সঙ্কেতের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

কলিয়ারীর চৌকিদার এক চোখ কানা সেমরা হাঁক দিয়ে চালিয়াছে—হো—হো—ও—হো!

টালোয়ান বা কেজম্যান সজাগ হইয়া পিটের মুখে গিয়া সঙ্কেত করিয়া ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে হাঁকিল। ইঞ্জিন চালিতে আরম্ভ করিল।

ওভারম্যানেরও ঘুম ভাঙিয়াছিল—সে তন্দ্রারক্ত চোখে বলিল—চাকরে আর কুকুরে সমান। চাকরি মানুষে করে?

বিনোদও কখন সোজা হইয়া বসিয়াছে—সে মেসের নিস্তব্ধতার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—এরা বেশ ঘুমুচ্ছে, নয়?

কেহ কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই সশব্দে কেজটা আসিয়া পিটের মুখে আবদ্ধ হইয়া গেল। কেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল পিটক্লার্কবাবু।

সে বলিল—খাদের অবস্থা বড় খারাপ অতুলবাবু। বড় গরম হয়ে উঠেছে খাদ।

অতুল বলিল—সে আর আমি কি করব?

—খাদে মালকাটারা টিকতে পারছে না।

অতুল নির্বিকারভাবে বলিল—ম্যানেজারবাবুকে খবর দিচ্ছি।

—ওদিকে ক'টা সুঁদে তো ধোঁয়ায় ভর্তি—আর উত্তাপ কি! ভেতরে কয়লাতে আগুন লেগেছে মনে হল।

অতুল বলিল—সেগুলো বাদ দিতে বলেছি।

—হ্যাঁ, সেগুলো বাদই আছে। কিন্তু ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে যে। একবার নীচে যেতে হবে মশায়। এসব তো আমার ডিউটি নয়!

অতুল হাসিয়া বলিল—বেশ আমি নীচে যাচ্ছি। আপনি আর ওভারম্যানবাবু বরং ম্যানেজারকে সব জানিয়ে আসুন। টালোয়ান, ঘণ্টা দাও নীচে।

গ্যাস বাতিটা জ্বালিয়া লইয়া সে কেজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

উপরের শব্দ পিছনে ফেলিয়া অতল গহ্বরের মধ্যে কেজটা সন সন শব্দে নীচে নামিয়া চলিয়াছিল। পিটের গাঁথনি দ্রুতবেগে চলিয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা অনুভূতি রন রন করিয়া উঠিল। প্রথমদিনের কথা মনে করিয়া অতুল একটু হাসিল। এখন এ অনুভূতি তাহার অভ্যাস হইয়া গেছে। প্রথম তলার খাদটা পার হইয়া গেল। যে কেজটা উপরে উঠিতেছিল সেটা পার হইয়া গেল। কোন সাঁওতালের মেয়ে ওই কেজে বসিয়াই গান গাহিতে গাহিতে উপরে উঠিয়া গেল। সে সুর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—ইঞ্জিনের শব্দও আর শোনা যায় না। দুই পাশে পিটের গা বাহিয়া জল ঝরিতেছে। নীচের জল ঝরার শব্দ ক্রমশঃ স্ফূটতর হইয়া আসিল।

কেজের গতি মন্দ হইয়া আসিয়া সশব্দে কেজটা এইবার থামিয়া গেল।

উপরে পিটের মুখে ও-কেজটাও সঙ্গে সঙ্গে থামিল। বিনোদ স্তব্ধ-ভাবে বসিয়াছিল—সে বলিল—উঠে এলি যে তুই ?

কেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল সেই মেয়েটি। মেয়েটির নাম চুড়কী। চুড়কী বলিল—যে ধুঁয়ো আর গরম খাদে—পাঁলায়ে এলম। তারপর ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল—তুর গান শুনতে এলম।

বিনোদ বিরক্তভরে বলিয়া উঠিল—ভাগ এখান থেকে।

শেডের কয়লার ধূলার উপরেই আঁচল বিছাইয়া চুড়কী শুইয়া পড়িল। বলিল—তুর ভারি গুমোর হইয়েছে, লয় গো বাবু।

বিনোদ কোনো উত্তর দিল না।

চুড়কী আপন মনেই বলিল—তুর চেয়ে আমি ভালো গান জানি। শুনবি ? সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া সে নিজের ভাষায় গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান করিয়া সে নীরব হইল। কিছুক্ষণ পর আবার সে বলিল—আকাশে হুই যি তারাটি দিপ দিপ করছে—ওইটি ভুঙ্কো তারা লয় গো বাবু ?

বিনোদ তবুও কোনো উত্তর দিল না। চুড়কী এবারে উঠিয়া আসিয়া তাহার কাছে বসিল, বলিল—একটি গান তু কেনে বলবি না বাবু ? সোবাই তুর গান শুনেছে। আমাকে আমার মাঝিন শুনতে দেয় না। বলে কি জানিস—বলে—তু বাবুকে ভালোবেসে ফেলবি।

বিনোদের ক্রমে যেন নেশা ধরিয়া আসিতেছিল। তাহার নবজাগ্রত যৌবন অহঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল—গান তো আমি তোকে শোনাব, তুই কি দিবি আমাকে ?

চুড়কী যেন চিন্তিত হইয়া পড়িল। তারপর বলিল—একটি করে রাঙা জবাফুল তুকে আমি রোজ দিব।

বিনোদ বলিল—ধেৎ, জবাফুল নিয়ে কি করব আমি ?

—কেনে, কানে পরবি, লয়ত চুলে গুঁজবি। তু আমাকে রোজ গান বলবি, হোক।

প্রকাণ্ড একটা টানেলের মধ্য দিয়া অতুল চলিয়াছিল। দু'পাশে কয়লার নিবিড় কঠিন স্তর। গ্যাসের আলোকের প্রতিচ্ছটায় কয়লার তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম কোণগুলি ছুরির মত চকচক করিয়া উঠিতেছে। হাতের

আলোটা তুলিয়া অতুল তাহাতে একটা বিড়ি ধরাইতে গেল। কিন্তু নিঃশ্বাসের ফুৎকারে আলোটা নিভিয়া গেল। অন্ধকার। কোথাও কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই। ধোঁয়ার উত্তাপে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ হইতেছে। অদ্ভুত-বিচিত্র! পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া অতুল আবার আলোটা জ্বালিয়া ফেলিল। টানেলটা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে। বাঁকটা ফিরিয়া দূরে ধোঁয়ার মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত শিখাহীন কয়টা দীপ্তি দেখা গেল। মানুষের কথার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছিল—কে আবার বাঁশীও বাজাইতেছে। টানেলের পাশে পাশে কুলিরা দিব্য শয্যা বিছাইয়া দিয়াছে। দুটি ছেলে আপন মনে বাঁশী বাজাইতেছিল। কতকগুলি মেয়ে গান করিতেছে। অতুল পশ্চিমের গ্যালারীর দিকে মোড় ফিরিল। এইদিকেই আগুন। উত্তাপ—ধোঁয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। অতুল দাঁড়াইল। তাহার জীবনের অনেক দাম। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তোরা সব পিটের কাছে গিয়ে বস, ম্যানেজার এলে কাজে লাগবি।

অবস্থা দেখিয়া মালিক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ম্যানেজার ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন।

অতুল বলিল—আমি পারি। অবশ্য যে-জায়গায় আগুন লেগেছে সেখানটা চিরদিনের মত বাদ যাবে। কিন্তু বাকী খাদ নিরাপদ হবে।

মালিক তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—তাই করুন, যত খরচ হয়, কোন ভাবনা নাই।

অতুল দ্বিধাহীন পরিষ্কারভাবে বলিল—কিন্তু কি স্বার্থে আমার জীবন বিপন্ন করে আপনার উপকার করব? আমার পারিশ্রমিক কি দেবেন বলুন।

মালিক অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে পড়িল, কয় বৎসর পূর্বের ছিন্নবাস উপবাসক্লিষ্ট একটি ছেলের কথা। সেদিন তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে একটি চাকরি দিয়াছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—এ-কথাটা আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করিনি অতুলবাবু।

অতুল হাসিয়া বলিল—বোধ হয় আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে চাকরি দিয়েছিলেন সেই কথা ভাবছেন। কিন্তু এই যে এতদিন আপনার এখানে রয়েছি বিনা পরিশ্রমে কোনদিন তো আপনার

কাছে বেতন আমি নিইনি। আমি পরিশ্রম করেছি তার পারিশ্রমিক আপনি দিয়েছেন। খাঁটি বিনিময়—দান নয়। আজ পর্যন্ত আমি আমার কর্তব্যে এক বিন্দু অবহেলা করিনি।

মালিক বলিলেন—কি চান আপনি?

অতুল বলিল—একজন বড় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার যা নিত, তাই নেব আমি। অবশ্য আমার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাদ দেবেন তা থেকে।

মালিক রাজী হইলেন। বলিলেন—তাই পাবেন।

অতুল বলিল—কনট্রাক্টটা ঠিক বিধান মতে হওয়া দরকার। কাগজে-কলমে একখানা চিঠি দিতে হবে আমাকে।

তাও হইয়া গেল। অতুল বলিল—ফায়ার ব্রিকস্ আর ফায়ার-ক্লে দরকার। যে গ্যালারীগুলোতে আগুন হয়েছে ওগুলো বন্ধ করে দিতে চাই আমি।

মালিক প্রশ্ন করিলেন—তাতে কি হবে?

অতুল হাসিয়া বলিল—তাতেই আগুন নিভবে, স্যর। নইনে জলে খাদ ভর্তি করলেও নিভবে না। যেদিন জল মেরে কাজ আরম্ভ করবেন সেইদিনই আবার গ্যাস হতে শুরু করবে।

ইঞ্জিনটা আজ নিস্তব্ধ—খাদ বন্ধ। শুধু স্টীমের শব্দের সঙ্গে পাম্পিং-এর শব্দ উঠিতেছিল অলসভাবে।

লরীর শব্দে কলিয়ারীটা মুখরিত হইয়া উঠিল। লরীতে জিনিসপত্র আসিতেছিল। বিপুল উদ্যমে দ্রুতবেগে উদ্যোগ আয়োজন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু কাজ আরম্ভ করিয়া গোল বাধিল। কুলিরা কেহ নামিতে চায় না। কুলি-রিক্রুটার কুলিদের বড় প্রিয়। সে দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে কেউ নামতে চাইছে না। বলছে—বিনা দম লিয়ে আমরা মরে যাব বাবু। উ আমরা লারব। কতকগুলো কুলি কাল রাত্রে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত দুইটা পুরিয়া দিয়া অতুল বলিল—দু-টাকা করে হাজরী দেব—চার ঘণ্টা কাজ। ফের আপনি গিয়ে বলুন।

রিক্রুটার চলিয়া গেল। অতুল নিজেই ফায়ার-ব্রিকস বোঝাই একটা টবগাড়ি পিট দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—ইডিয়ট কোথাকার। টাকায় দুনিয়া কেনা যায়—মানুষ কি দুনিয়ার বাইরে?

তারপর নিজেই ঘণ্টার সঙ্কেত হাঁকিল—হো—ই।

ইঞ্জিন চলিতে লাগিল।

মেসের ঘরে ঘরে বাবুদের ব্যস্ততার সীমা নাই। কার কখন ডাক পড়বে কে জানে। কালীপদ লটারীর টিকিটের নম্বরটা ভুলিয়া গিয়াছে। সার্ভেয়ারবাবু প্ল্যান খুলিয়া বসিয়া আছেন। কতদূর গ্যাস আগাইয়া আসিল, দাগের পর দাগ টানিতেছেন। বিমুর হারমোনিয়মটা বন্ধ। কেরানী সীতাপতির ছবির খাতা বাক্সে বন্ধ হইয়া আছে—রঙের বাটিগুলা শুকাইয়া গেছে। স্টোর-বাবু জিনিস জমা করিয়া আর খরচ লিখিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ খাদে নামিবার পোশাক পরিতেছিল। ঘরের উত্তর দিকে খোলা মাঠ। উত্তর দিকের জানালা হইতে কে বলিল—একটি গান কর কেনে বাবু।

বিনোদ ফিরিয়া দেখিল চুড়কী। শুধু চুড়কী নয়, আরও দুই-তিনটি মেয়ে। বিনোদ বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই কুশ্রী কালো বর্বর মেয়েগুলোর অত্যাচারে তাহার গ্লানির আর পরিসীমা নাই। নানা জনে নানা কথা বলে। নিজেরও ঘৃণা বোধ হয়। সে কহিল—যা, যা বিরক্ত করিস না।

আর একটি মেয়ে বলিল—রাগ করছিস কেনে বাবু? একটি গান শুনায়ে দে, আমরা চলে যাই।

একজন বলিল—চুড়কী তুর লেগে জবাফুল এনেছে। দে গে চুড়কী, বাবুকে ফুলটি দে।

চুড়কী জবাফুলটি ছুঁড়িয়া বিনোদের বিছানায় ফেলিয়া দিয়া বলিল—লে বাবু, কানে উটি পর। বড়া ভালো লাগবে তুকে।

বিনোদের ইচ্ছা করিল ফুলটাকে ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাও সে পারিল না। এইটা তাহার একটা অক্ষমতা—সে তাহা জানে। রূঢ়ভাবে কাহাকেও আঘাত করিতে সে পারে না। বিব্রত হইয়া বিনোদ অনুরোধ করিয়া বলিল—পালা বাপু তোরা এখন। জ্বালাস নে আমায়, খাদে যাব দেখছিস না।

আশ্চর্যান্বিত হইয়া চুড়কী বলিল—খাদ তো পুড়ে গেইছে তুদের।

—তোদের মাথা হয়েছে। তোরা কাজ করবি না—আর তোদের কাজ আমাদিকে করতে হচ্ছে।

চুড়কী বলিল—সত্যি বলছিস তু? খাদে গেলে মরে যাবি না?

আপন মনেই হাসিয়া বিনোদ বলিল—আচ্ছা বোকা জাত বটে বাপু।—মরে কেন যাবি? এই তো আমি চললাম। তোদিকে দু'টাকা তিন টাকা করে হাজরি দেব। আসবি তোরা?

একটি মেয়ে বলিল—হাঁ বাবু—সত্যি—তিন টাকা করে দিবি তুরা? আর মরে যাব নাই?

—না—না—না। কতবার বলব তোদের বল!

চুড়কী বলিল—তু থাকবি তো বাবু খাদে? না—আমাদিগে ফেলে দিয়ে পালায়ে আসবি?

—ভ্যালা বিপদ বাবা। ওরে পালিয়ে আসবায় যো কি? চাকৃরি যাবে যে।

নিজেদের ভাষায় কি সব বলাবলি করিয়া চুড়কী বলিল—মালকাটা-দিগে বলি গা বাবু। তুকে কিন্তুক গান শুনাতে হবেক।

তারপর সঙ্গীদের পানে চাহিয়া বলিল—দেলা বোঁ। অর্থাৎ—চল চল।

বর্বর কালো মেয়েগুলি নাচিতে নাচিতে, ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর কয়জন মাঝি আসিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি তুরা তিন টাকা করে দিবি?

অতুল বলিল—তাই পাবি।

—হাঁ বাবু—তুরা আমাদের সাথে রইবি তো?

হাসিয়া অতুল বলিল—তোদের পাশে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তা ছাড়া রাজমিস্ত্রী থাকবে, অন্য বাবুরা থাকবে। তোরা একা থাকবি না।

—বেশ বাবু, তবে আমরা নামবো। মাঝিনদের নামতে দিবি তো?

অতুল জানিত এই মাঝিনদের ফেলিয়া ইহারা কোথাও যায় না। রাজসিংহাসন পাইলেও না। সে হাসিয়া বলিল—বেশ, তারাও নামবে।

ম্যানেজার ক্ষীণভাবে প্রতিবাদ করিলেন—সে যে বে-আইনী হবে অতুলবাবু।

কেজ-ব্রেকটা খুলিতে খুলিতে অতুল বলিল—নেসেসিটি হ্যাজ নো ল। আইন মানতে গেলে খাদ পুড়তে দিতে হবে।

তারপর হাঁকিল—হো—ই—ইঁটার গাড়ি লাও!

অন্ধকার খাদের তলে মানুষের কর্মকোলাহলের আর বিরাম ছিল না। উপরেও তাই। খাদের মুখে খাজাঞ্চী বাক্স লইয়া বসিয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে কুলিদের বেতন মিটিয়া যাইতেছে। শেডের মধ্যে বসিয়া

বৃদ্ধ ডাক্তার। গীয়ারহেডের চাকা তুইটা অবিরাম ঘুরিতেছে। ঘং —ঘং—ঘং।

নীচে হইতে সংকেত আসিতেছে লোক উঠিবে।

টালোয়ান ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে সংকেত করিল, হো—ই। মিনিট তুই পরেই বিপুল শব্দ করিয়া কেজটা উপরে আসিয়া লাগিল। একজন বাবু, একটি কুলি ও একজন কামিনকে লইয়া নামিল। মেয়েটির বুকে ব্যথা ধরিয়া শ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের চাবি আলগা করিয়া দিয়া টিউবটা মেয়েটির নাকের কাছে ধরিয়া ডাক্তার বলিল—ভয় নাই।

নীচে হইতে সঙ্কেত আবার আসিল—ঘং—ঘং—ঘং।

অনেক লোক উঠিয়া আসিয়া বলিল, মাটি—মাটির গাড়ি জলদি চালাও।

মাটির গাড়ি লইয়া কেজ নামিল।

খাজাঞ্চী হিসাব করিতেছিল—তিন তু-গুণে ছয়—এই লে মাঝি, ছ-টাকা হাজরি তোদের।

খাদের নীচে লাইন ধরিয়া মাটি-বোঝাই টব গাড়িটা চলিতেছিল ধীরে ধীরে; একজন আসিয়া ঠেলিয়া সেটার গতি দ্রুত করিবার চেষ্টা করিল। আরও ভিতরে, যেখানটায় আগুন লাগিয়াছে সেখানে গ্যালারীর মুখে মুখে গাঁথুনি উঠিতেছিল। বিশ-পঁচিশ মিনিট অন্তর লোক স্থান পরিবর্তন করিতেছে। গ্যাসে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, বিবর্ণ পাংশু মানুষগুলি টলিতে টলিতে অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের ফানেলের মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। অতুলের পিঠে ডুবুরীদের মত ছোট একটা অক্সিজেন-সিলিণ্ডার বাঁধা, তাহার তুইটা নল নাকের কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করিতেছে। সে অনবরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্যালারীর মুখে মুখে ফিরিতেছিল।

সে বলিল—জলদি—জলদি—আর মাত্র তিনটে গ্যালারী। চালাও ভাই, চালাও। দেরি হলে সব নষ্ট হবে। গ্যাস সব ঐ গ্যালারী দিয়ে বেরুতে আরম্ভ করবে।

বিনোদ একটা গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইয়াছিল। চুড়কী বহিতেছিল কাদা, তাহার মাঝি ইঁট যোগান দিতেছিল। কাদার পাত্রটি ফেলিয়া দিয়া চুড়কী বলিল—লারব আর আমি। সে হাঁপাইতেছিল।

বিনোদ বলিল—যা-যা, ঐখানে যা। বাতাস নিয়ে আয়।

—হঠ যাও—হঠ যাও। ইঁটাকা গাড়ি যাতা হ্যায়।

বিনোদ সরিয়া দাঁড়াইল, হড় হড় শব্দে গাড়িখানা চলিয়া গেল।

—কাদা—কাদা—ফায়ার-ক্লে। অতুল হাঁকিতেছিল।

ওপাশ হইতে কে হাঁকিল, আদমী গির গিয়া হিঁয়া। জলদি লে যাও।

অতুল দ্রুতবেগে বিনোদের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল —আর দুটো গ্যালারী!

ধোঁয়ার পরিমাণ যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিনোদের কষ্ট হইতেছিল। সে একটু সরিয়া আসিয়া ২৫ নম্বর গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইল। স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জন—ওদিকে ২৮ নম্বরে কাজ চলিতেছে। ২৭ নম্বর বন্ধ হইলেই যুদ্ধের শেষ হয়, ধরণীগর্ভে আগুন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। কে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিল। বিনোদ এক ঝটকায় তাহাকে ফেলিয়া দিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল। ক্রোধের আর তাহার সীমা ছিল না। চুড়কী পড়িয়া গিয়াও খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। জুতার ডগায় চুড়কীর মুখে একটা ঠোক্কর মারিয়া বিনোদ বলিল—লাথি মেরে তোর মুখ ভেঙে দেব আমি।

চুড়কী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিনোদ সেখান হইতে পলাইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে আবার ফিরিয়া চাহিল।

ধোঁয়ার বাষ্পে ভালো করিয়া দেখা গেল না। কিন্তু অস্ফুট কান্নার শব্দ সে তখনও শুনিতে পাইতেছিল। বিনোদ ফিরিল। ডাকিল— চুড়কী—এই চুড়কী, কাজে যা—উঠে যা।

—না—আরি যা-ব-না। তু কেনে আমাকে লাঁথায় মেলি?

ওদিক হইতে হড় হড় শব্দে টব-গাড়ি আসিতেছিল, যে ঠেলিয়া আনিতেছিল—হে হাঁকিল—হো—হো—ই—হঠ যাও।

বিনোদের আর সাহস হইল না। সে পলাইয়া আসিল। সিলিণ্ডারের মুখে অক্সিজেন লইবার অছিলায় পিটের মুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। হুড় হুড় শব্দে টব-গাড়িতে যন্ত্রপাতি ফিরিয়া আসিতেছে। কাজ বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয়জন কাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল।

—ঘন্টি মারো টালোয়ান, ঘন্টি মারো জলদি। পাঁচ আদমি গিব গিয়া।

পিছনে পিছনে আবার একজন আসিল। বিনোদ প্রশ্ন করিল—কি—ব্যাপার কি হে?

—আর কি! গ্যাস একদিক দিয়ে জোর ধরেছে। পিছিয়ে আসতে হ'ল।

—ক নম্বর পর্যন্ত পেছুতে হ'ল?

শন শন শব্দে কেজটা উঠিয়া গেল, উত্তর আর শোনা গেল না। বিনোদ দ্রুতপদে খাদের মধ্যে আগাইয়া গেল।

বন্ধ হইতেছিল পনরো নম্বরের মুখ।

অতুল কাহাকে বলিতেছিল—উপায় নাই—বারোটা গ্যালারী ছেড়ে দিতে হ'ল।

বিনোদ চীৎকার করিয়া উঠিল—গাঁথুনি ভাঙো। ভেতরে লোক।

তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া অতুল বলিল—গেট আউট।

বিনোদ সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আর একবার বলিল—চুড়কী—

বাধা দিয়া অতুল বলিল—ওপরে যাও তুমি।—তারপর ইংরেজীতে একটা চিরকুট লিখিয়া হাতে দিয়া বলিল—ক্যাশিয়ারকে দাও গে।

ক্যাশিয়ার কাগজখানা পড়িয়া কুড়িটি টাকা বিনোদের হাতে দিয়া বলিল—তোমার মাইনে। এক ঘণ্টার মধ্যে কলিয়ারী ছেড়ে যাও। ছট্টু সিং!

—হুজুর! ছট্টু সিং সেখানে হাজিরই ছিল।

—এক ঘণ্টার মধ্যে বাবুকে কুঠীর সীমানা থেকে বের করে দেবে।

নীচে তখন কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতুল রুমালে কপাল মুছিতে মুছিতে আপন মনেই বলিল—হি লাভ্‌স হার। প্রকাশ করে ফেলবে। ফুল! জানে না যে-সম্পদ বাঁচল, তাতে ওই মেয়েটির মত হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষের জীবিকার সংস্থান হ'ল।—প্যাকিং দাও—ফায়ার-ক্লের প্যাকিং দিয়ে দাও—যেন এক বিন্দু গ্যাস না আসে।

আগুন থামিয়া গেছে। আবার কলিয়ারী তেমন চলে। কেজ ওঠে—নামে। রাত্রিতে কুলি-কামিন ভিড় করিয়া আসে, বাবুরা নাম লেখে।

টালোয়ান হাঁকে—হো-ই।

ইঞ্জিন চলে—কেজটা নামিতে থাকে।

যাদুকরী

শরতের নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘিতে কলরব করিয়া যেন একদল বালিহাঁস আসিয়া পড়িল।

আশ্বিন মাস। আকাশ নীল, রৌদ্রে সোনালী আভা, ঘরে ঘরে পূজার আয়োজন-উদ্যোগের সাড়া, দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার; পরিপূর্ণতায়, চঞ্চলতায় গ্রামখানি নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘির সঙ্গেই তুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই মধ্যে বালিহাঁসের মতই কলরব করিয়া আসিয়া পড়িল দশ-বারোটি বাজিকরের মেয়ে ও জন-চারেক বাজিকর পুরুষ। বাজিকর অথবা যাদুকর।

বাজিকর একটি বিচিত্র জাতি। বাংলা দেশে অন্য কোথাও আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না। বীরভূমের সীথল গ্রামে এবং আশেপাশেই ইহাদের বসতি। বেদে নয় তবু যাযাবরত্বে বেদেদের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। ধর্মে হিন্দু, কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা সম্প্রদায় জাতিকুলপঞ্জিকা ঘাঁটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। পুরুষেরা ঢোলক লইয়া গান করে, যাদুবিদ্যার বাজি দেখায়। নিরীহ শান্ত প্রকৃতি, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুত টানের মিষ্ট ভাষা। ঐ ভাষা হইতেই লোক চিনিয়া লয় ইহারা বাজিকর। মেয়েরা কিন্তু পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিলাসিনীর জাতি। কেশে বেশে বিন্যাস তাহাদের অহরহ, রাত্রে শুইবার সময়ও একবার কেশবিন্যাস করিয়া লয়, প্রভাতে উঠিয়া প্রথমে বসে চুল বাঁধিতে। পরনে রেশমী শৌখিন-পাড় শাড়ি, হাতে একহাত করিয়া কাঁচের অথবা গিলটির চুড়ি, গলায় গিলটির হার, উপর হাতে তাগা অথবা বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরিত সারিবন্দী মাকড়ী, এখন পরে গিলটির ঝুমকা, দুল প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাশানের কর্ণভূষা। কাঁকালে একটা গোবর-মাটিতে লেপন দেওয়া বিচিত্র-গঠন ঝুড়ি, তাহার মধ্যে থাকে সাপের ঝাঁপি, বাজির ঝোলা, ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র সেগুলিকে ঢাকিয়া থাকে ভিক্ষায় সংগৃহীত পুরানো কাপড়। মেয়েদের প্রধান অবলম্বন গান ও নাচ। নিজেদের বাঁধা গান, নিজেদের বিশিষ্ট সুর, নাচও তাই—বাজিকরের মেয়ে ছাড়া সে নাচ নাচিতে কেহ জানে

না। লোকে বলে তামার বদলে রূপা দিলে নির্বিকারচিত্তে নগ্ন অবয়বে নাচে বাজিকরের মেয়ে। দর্শকে চোখ নামায়, কিন্তু বাজিকরের মেয়ে-চোখের অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে পলক পড়ে না ; দুনিয়ার লোকে ছি ছি করে, কিন্তু বাজিকরের সমাজে ইহার নিন্দা নাই, বাজিকরের মনের ছন্দ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য অপছন্দ হইয়া উঠে না।

গ্রামে ঢুকিয়া তাহারা ছড়াইয়া পড়িল। দল বাঁধিয়া উহারা ভিক্ষা করে না ; দল দূরের কথা—স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে কখনও গৃহস্থের দুয়ারে দাঁড়ায় না।

—ভিক্ষা দাও মা রানী, চাঁদবদোনী, স্বামীসোহাগী, রাজার মা!

মুখুজ্জে-গিন্নী তরকারির বঁটিতে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিলেন, চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল টলমল করিতেছিল। সম্মুখে বসিয়াছিল কন্যা রমা, বিষণ্ন নতমুখে সে নখ দিয়া মাটি খুঁটিতেছিল অকারণে। গিন্নী বিরক্তভরে বলিলেন—ওরে, ভিক্ষে নিয়ে বিদেয় কর তো, পূজো এল আর এই আরম্ভ হ'ল বাজিকরের আমদানী।

—নাচন ভ্যাখেন মা, গান শোনেন। কই, আমাদের রমা ঠাকরুন কই?

—না। নাচ দেখবার মত মনের সুখ নাই আমার। ওরে—

—বালাই! ষাট! শত্রুর মনের সুখ যাক। আপনার দুঃখ কিসের—

—বকিস নে বলছি! এমন হারামজাদা জাত তো কখনো দেখি নাই। ওরে রমা, ঝি কোথায় গেছে, তুই-ই দে তো ভিক্ষে।

রমা ভিক্ষা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বাজিকরের মেয়েটি রমার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও দেখিতে প্রায় সমবয়সী মনে হয়। তাহার মুখ স্মিতহাস্যে ভরিয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই বলিয়া উঠিল—ভোজটা ফাঁকি পড়লাম দিদি ঠাকরুন।

রমা বিরক্তিভরেই বলিল—নে নে, ভিক্ষে নে।

—কোন্ মাসে বিয়া হ'ল ঠাকরুন? কোথায় হ'ল বিয়া?

গৃহিণী উঠিয়া আসিলেন, রূঢ়ভাবে বলিলেন—ভিক্ষে নিবি তো নে, না নিবি তো বিদেয় হ।

—ওরে বাপ রে! তাই পারি! আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! দিদি ঠাকরুনের বিয়ার ভোজ খেতে পেলম নাই, বিদায় পেলম নাই—আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! আজ নাচ দেখাব, গান শুনাব, শিরোপা নিব—কাঁকালের ঝুড়িটা নামাইয়া কাপড়ের আঁচল কোমরে

জড়াইয়া বলিল—কাপড় নিব, রমা দিদির কাছে নিব কাঁচের চুড়ির দাম, তবে ছাড়ব!—বলিয়াই সে আরম্ভ করিল—

হায় গো দিদি, কাঁচের চুড়ির ঝমঝমানি
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—
চুড়ির ওপর রোদের ছটা
হায় মরি কি রঙের ঘটা
সোনা রূপো বাতিল হ'ল কাঁদছে বসে স্যাকরানী।
বেলাত হতে জাহাজ বোঝাই
হল চুড়ির আমদানী।
উর-র-র জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের চুড়ি সে তালে তালে বাজাইতেছিল—ঝম্ ঝম্! ঝম্ ঝম্! একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পাক খাইয়া খাইয়া বাজিকরীর সর্বাঙ্গ নাচিতেছিল সাপিনীর মত। গিন্নী ও রমা দু'জনের বিষণ্ণ মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল—অতি মৃদু ক্ষীণ রেখায়। বাড়ির এবং পাশের বাড়ির মেয়েরাও আসিয়া জুটিয়া গেল। বাজিকরী নাচিয়াই চলিয়াছে—চোখের তারা দুইটি নেশার আমেজে যেন ঢুলঢুল করিতেছে, সঙ্গে বিচিত্র সুরের গান।

পাড়ার যত এয়োস্তীরি—শাঁখা ফেলে পরছে চুড়ি—
লালপরী সবুজপরী—মাঝখানে হলুদ পারা—
ওগো চুড়ির বাহার দেখে যা তোরা—
এবার যদি না দাও চুড়ি, ত্যাজ্য করব
এ ঘর বাড়ি—
নয়কো দোব গলায় দড়ি
তবু চুড়ি পরব গো—
হাতের শাঁখা ঘাটে ভেঙে
ফেলব চোখের নোনা পানি।—
উর-র-র জাগ জাগ—

গান শেষ করিয়া বাজিকরী থামিল।

চুড়ির জন্য গলায় দড়ি দিবার সঙ্কল্প শুনিয়া মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল—মরণ!

বাজিকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি লইলে মরণ ভালো গো ঠাকরুন। রমা দিদি, চুড়ির পয়সা লিয়ে এস—কাপড়-গয়না নিব তোমার বরের কাছে। বর কখন আসবে বল। চিঠি লিখ তুমি। আমার নাম করে লিখ।

রমা বা গিন্নী কোনো কথা বলিল না, একজন প্রতিবেশিনী তরুণী বলিল—তুই যা না হারামজাদী তার কাছে।

র‍্যাল ভাড়া দাও, ঠিকানা দাও, চিঠি লিখে দাও। আজই যাব। বর লিয়ে আসব—নাকে দড়ি দিয়া বেঁধ্যা রমা দিদির দরবারে।

—মরণ! ও-পাড়ায় যেতে আবার র‍্যাল ভাড়া লাগে নাকি?

গালে হাত দিয়া মেয়েটা সবিস্ময়ে বলিল—গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়া না কি?

—ঢং করছে! কিছু জানিস না নাকি?

—কি কর‍্যা জানব দিদি, আমরা ফিরেছি দেশে তিন দিন।

বাজিকরের জাত ভিক্ষা করিয়া দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাযাবর সম্প্রদায়ের মত গৃহহীন নয়, ভূমিহীন নয়—ঘর আছে। প্রাচীনকাল হইতে নিষ্কর জমিও ইহারা ভোগ করে, তবু ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পূজার পূর্বে দেশে আসে, পূজার পর বাহির হয়, ফেরে ফসল উঠিবার সময়, ফসল তুলিয়া, জমিগুলি ভাগচাষে বিলি করিয়া আবার বাহির হয় নীল সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবের পর। গাজন ইহাদের বিশেষ উৎসব।

মেয়েটি বলিল—ওপাড়ার বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির দেবুকে জানিস।

চোখ দুটিকে বড় বড় করিয়া বাজিকরী বলিল—খোকাবাবু? কলকাতায় কলেজ পড়ে, টকটকে রঙ, শিবঠাকুরের মত ঢুলু ঢুলু চোখ, লল্‌ছা পাড়া বাবুটি?

—হ্যাঁ।

—অ-মাগ! আমি কুথা যাব গ!—মেয়েটা যেন হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।—বুঝলে ঠাকরুন, বাবুটিকে দেখতাম আর ভাবতাম ইয়ার গলায় মালা কে দিবে? আর রমা দিদিকে দেখ্যা ভাবতাম ই লক্ষ্মী ঠাকরুনটি কার গলায় মালা দিবে?

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখুজ্জে-গিন্নী বলিলেন—থাম বাবু তুই, আদিখ্যেতা করিসনে। কপালে আমার আগুন লেগেছিল—তাই ওই ঘরে বরে আমি বিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।

—কেন মা ?—মেয়েটা চকিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে সকলের মুখের দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিল, সকলেরই মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। রমা দাঁড়াইয়া আছে দূরে, নতমুখে; না দেখিয়াও চতুরা বাজিকরী বুঝিয়া লইল—রমায় চোখে জল-ছলছল করিতেছে।

ক্ষতসন্ধানী মক্ষিকার মত মেয়েটা ব্যগ্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ছোট শহর বলিলেই ঠিক হয়—ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে দিন দিন বড় এবং শহরের শ্রীতেই সমৃদ্ধ হইয়া চলিয়াছে; অবস্থাপন্ন ব্যবসাদারও কয়েকজন আছে, তবু মুখুজ্জেদের অবস্থাপন্ন বলিয়া খ্যাতি আছে। রমা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শ্রীমতী মেয়ে বাপ-মায়ের আদরের দুলালী। মেয়েকে চোখের আড়াল করিতে পারিবেন না বলিয়াই গ্রামে বিবাহ দিয়াছেন। ঘরজামাইকেও মুখুজ্জে-কর্তা ঘৃণা করেন। ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জেরা এককালে সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন ঘর ছিল—এখন শুধু সম্ভ্রম আছে, সঙ্গতি নাই। এই বাঁড়ুজ্জেদের দেবনাথ ছেলেটি বড় ভালো। সুরূপ সুন্দর ছেলে, বি-এ পাস করিয়া এম-এ পড়িতেছে। এই ছেলেটির সঙ্গে মুখুজ্জেরা রমার বিবাহ দিয়াছেন। ক্ষেতের কলা-মুলা হইতে রান্না-করা তরকারি পর্যন্ত—যাহা নিজেদের ভালো লাগিবে তাহাই মেয়ে-জামাইকে পাঠাইয়া দিবেন, মেয়ে একবেলা থাকিবে শ্বশুরবাড়িতে, একবেলা থাকিবে বাপের বাড়িতে, এই ছিল তাঁহাদের কল্পনা।

বিবাহের পর কিন্তু বিরোধ বাধিয়াছে এইখানেই। বনিয়াদী বাঁড়ুজ্জেরা কলা-মুলা রান্না-করা তরকারি উপঢৌকনে অপমান বো করিয়াছেন। বধূরা একবেলা এখানে—একবেলা ওখানে থাকাও তাঁহার বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল, অকস্মা একদিন রমাই সেটাকে বিবাদে পরিণত করিয়া তুলিল। রো অপরাহ্ণে মুখুজ্জে-বাড়ির ঝি আসিয়া রমাকে লইয়া যাইত—দুধ এব জল খাইবার জন্য। সেদিন কিসের ছুটিতে দেবনাথ আসিয়াছি বাড়ি। রমার শাশুড়ী আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিলেন—দেবু বাি এসেছে, আজ আর বৌমা যাবে না।

পরক্ষণেই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলে —আর রোজ রোজ কচি খুকীর মত দুধ খেতে যাওয়াই বা কেন গরীব বলে কি দুধও খাওয়াতে পারিনে আমি বেটার বউকে

বলিস তুই, একটা পাড়া অন্তর রোজ আমার বেটার বউ আমি পাঠাব না।

ঝিটা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—আজকের মত পাঠিয়ে দেন মা, মা আজ খাবার-দাবার করেছেন—

না-না-না!—রূঢ়স্বরে রমার শাশুড়ী জবাব দিয়াছিলেন।

ঝি ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গিয়াছিল—বউ বাড়িতে নাই। গ্রামের মেয়ে মা-বাপের আদরের দুলালী ততক্ষণে জনবিরল গলি পথে পথে মায়ের কাছে গিয়া হাজির হইয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর মুখুজ্জে-বাড়ি হইতে এক প্রবীণা আত্মীয়া আসিয়াছিলেন দেবনাথের নিমন্ত্রণ লইয়া—কই হে দেবুর মা, দেবুর আজ নেমন্তন্ন ও-বাড়িতে। তার শ্বশুর পাঁঠা কেটেছে। শাশুড়ী খাবার করেছে।

নিমন্ত্রণ স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করিয়া দেবুর মা জানাইয়াছিলেন কেবল ভদ্রতাসম্মত সম্ভাষণ—এস, বস।

—বসব না ভাই। নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। বউও তোমার ও-বাড়িতে। খেয়েদেয়ে বউ-বেটা তোমার ও-বাড়িতেই আজ থাকবে; কাল সকালে আসবে।

বাঁড়ুজ্জে-গিন্নীর মুখ আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মত থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল—কথার জবাব তিনি দেন নাই।

—তা হলে চললাম ভাই। সন্ধ্যাতেই পাঠিয়ে দিও দেবুকে—

—দেবুকেই কথাটা বলে যাও।

—সেকি!

—হ্যাঁ। ব্যাটার শ্বশুরবাড়ির কথাতেও আমি নাই, বউয়ের কথাতেও আমি নাই।

দেবনাথ রাত্রে যায় নাই। সেও বধূর এই আচরণে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীর এই প্রশ্রয়পূর্ণ ব্যবহারও তাহার ভালো লাগে নাই। তাহার উপর ক্ষুব্ধ মাকে উপেক্ষা করিয়া এই নিমন্ত্রণ রক্ষার কোনো উপায়ই ছিল না।

ঝগড়ার সূত্রপাত এইখানেই।

দেবনাথের মা বলিলেন—বধূর পিতামাতাকে কন্যাকে লইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া এ বাড়িতে দিয়া যাইতে হইবে।

রমার মা বলিলেন, দেবনাথ নিজে আসিয়া রমার অভিমান ভাঙাইয়া তাহাকে লইয়া যাইবে—তবে তিনি কন্যাকে পাঠাইবেন।

উপেক্ষিতা রমা সেদিন নাকি কাঁদিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেই বিবাদ কঠিন পরিণতির ক অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দেবনাথ স্ত্রীকে চিঠিপত্র পর্যন্ত লেখে না। দেবনাথের মা আস্ফালন করেন, ছেলের তিনি বিবাহ দিবেন। ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক—এই অকাল কয় মাসের অপেক্ষা।

রমার মা ইহাতে ভয় পান না; তিনি কন্যার জন্য দালান-কোঠার প্ল্যান করেন। ইদানীং তিনি খোরপোষ আদায়ের আরজি পর্যন্ত মুসাবিদা করিতে শুরু করিয়াছেন।

ভরসা কেবল দুই পক্ষের পিতা।

মুখুজ্জে-কর্তা ব্যবসা-বাণিজ্য-মহাজনি লইয়া ব্যস্ত। বাঁড়ুজ্জে-কর্তা আজীবন মাস্টারী করিয়াছেন। রিটায়ার করিয়াও তিনি আজও পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত। ইতিহাসের মাস্টার। 'ভাঙা মূর্তি, পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। দুই পক্ষের গিন্নী তারস্বরে চীৎকার করিয়াও অপদার্থ মানুষ দুইটাকে সচেতন করিতে পারেন না বলিয়া মধ্যে মধ্যে কপালে করাঘাত করেন।

বাজিকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

মুখুজ্জে-গিন্নীর প্রতিবেশিনীর বাড়িতে বসিয়া কথা হইতেছিল। প্রতিবেশিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—মর, এতে আবার হাসি কিসের?

—হাসি নাই? ছাগলের লড়াই দেখেছ ঠাকরুন?—বলিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসি।

—হাসি-তামাশা, পরের কথা রাখ; এখন আমি যা বললাম তার কি বল।

তাহার দিকে চাহিয়া বাজিকরী বলিল—তুমার হাতে যোগবশের ওষুধ খাটবে না ঠাকরুন।

মেয়েটি বশীকরণের ঔষধ চায়। সবিস্ময়ে সে বলিল—খাটবে না! কেন?

—রাগ কর নাই। তুমি বড় ময়লা থাক ঠাকরুন। আমার ওষুধ লিতে তুমাকে পরিষ্কার হতে হবে কিন্তুক।

—আমি তো রোজ চান করি—

—স্নান করা লয় ঠাকরন; পরিষ্কারের অনেক করণ আছে তোমাকে কাপড় পরতে হবে, কেশ-বিন্যেস করতে হবে, চলকো করে চুল বাঁধবা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরবা। পায়ে গন্ধ লিবা। আলতা পরবা। খোঁপাতে ফুল পরবা, সেই ফুল কর্তার হাতে দিবা। ভেব্যা দেখ; এসব পার তো এলাচ আন, আমি মন্তর দিয়া পড়ে দি।

স্থিরদৃষ্টিতে বাজিকরীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল—পারব।

—তবে আন, এলাচ আন। ছোট এলাচ, দারুচিনি, বড় এলাচ; মন্তর পড়ে দিব, তাই দিয়া মোটা খিলি করে পান সাজবা, নিজে খাবা; খেয়ে কর্তাকে দিবা। কিন্তুক যা বললাম—তা না করলে খাটবে নাই ওষুদ। তখন যেন আমাকে গাল দিয়ো না। আর পাঁচটি পয়সা লাগবে, পাঁচ পাই চাল লাগবে, পাঁচটি সুপারী, সিঁদুর—আর পুরানো কাপড় একখানি। লিয়ে এস।

বাজিকরী চলিয়াছে বাজারের পথে।

একটা দোকানের সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়াছে, বাজিকর পুরুষ বাজি দেখাইতেছে।

—লাগ—লাগ—লাগ—লাগ ভেল্কী লাগ। লাগ বললে লাগবি, ছাড় বললে ছাড়বি। ভাটরাজার দোহাই দিয়ে ডুববি বেটা টুপ-টুপিয়ে—! বাহা রে বেটা—বাহা রে!

একটা বাটির জলে একটা কাঠের হাঁস ক্রমাগত ডুবিতেছিল, আর উঠিতেছিল।

—হাঁ—হাঁ বেটা, আর ডুবিস না, সর্দি লাগবে, জ্বর হবে!

হাঁসটা ডোবা বন্ধ করিল।

এইবার আমার কাঠের হাঁস—শুন আমার কথা, ক্ষিধায় জ্বলছে পেট, ঘুর্যা পড়ছে মাথা। প্যাঁক প্যাঁকিয়ে ডাক ছেড্যা, দে দেখি একটা ডিম পেড়্যা; আগুন জ্বেল্যা পুড়ায়ে খাই।

একটা ঝুড়ির ভিতর কাঠের হাঁসটাকে চাপা দিয়া বাজিকর বোল আওড়াইয়া একটা হাড় ঝুড়িটাতে ঠেকাইয়া দিল। ভাটরাজার দোহাই দিয়ে, ওঠ বেটা প্যাঁক প্যাঁকিয়ে। দোহাই, ভাটরাজার দোহাই। —সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িটা উঠাইতে দেখা গেল—কাঠের হাঁস জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঠোঁট দিয়া সে পালক খুঁটিতেছে, পাশে একটা ডিম।

দর্শকের দল আনন্দে বিস্ময়ে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। ছোট ছেলের দলের হাততালি আর থামে না।

বাজিকরী মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিল।

—এই বাজকরুনী! এই!

থানার বারান্দায় বসিয়াছিল কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী। তিনজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়াছিল। জনকয়েক বসিয়াছিল বারান্দায়। একজন ডাকিল—এই বাজকরুনী! এই!

বাজিকরী আসিয়া কাঁকালের ঝুড়িটা নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।—পেনাম দারোগাবাবু!

—তোর নাচ দেখা দেখি! এই বাবু তোদের নাচ দেখেন নাই, দেখবেন।

বাজিকরী দেখিল, তাহার চেনা বড় দারোগা ও ছোট দারোগার পাশে নূতন একটি বাবু। চতুরা বাজিকরীর ভুল হইল না, সে মুহূর্তে চিনিল, এও এক দারোগাবাবু। গোঁফের এমন জাঁকালো ভঙ্গি, কপালে এমন গোল দাগ, গায়ে এমন হাতকাটা খাকীর জামা, দারোগা ছাড়া কাহারও হয় না।

বড় দারোগাকে প্রণাম করিয়া সে বলিল—আপনি ই-খান থেক্যা চল্যা যাবেন বাবু?

—হঠাৎ আমাকে বিদেয় করবার জন্যে তোর এত গরজ কেন?

—আজ্ঞে, নতুন দারোগাবাবু এলেন—তাথেই বলছি।

—উনি এখানে কাজে এসেছেন।

—কাজে?

—হ্যাঁ, তোকে ধরে নিয়ে যাবেন। পরোয়ানা আছে তোর নামে।

—আমার নামে?—মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হাসছিস যে! তুই হারামজাদী পাকা চোর।

হাসিতে হাসিতে বাজিকরী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ! কিন্তু ধর্যা কি করবেন হুজুর, মন চুরির বামাল যে সনাক্ত হয় না।

নূতন দারোগাবাবুটি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—ওরে বাপরে—

বাজিকরী তুই হাতে তুড়ি দিয়া আরম্ভ করিল—

উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—জার ঘিনিনা—
সরু কাপড় নক্শিপেড়ে—মাকড়ী চুড়ি গয়না—
গোট পাটা সাপ কাঁটায় পুঁজিপাটা রয় না—

বিদায় হইয়া বাজিকরী চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বারান্দায় উপবিষ্ট কনস্টেবল দলের জনদুয়েক উঠিয়া গিয়া থানার বড় বটগাছটার আড়াল হইতে তাহাকে ডাকিল।

হাসিয়া বাজিকরী বলিল—বল, কি বলছ।

—আমাদের আলাদা করে নাচ দেখাতে হবে।

—দেখাব।

—ল্যাংটা হয়ে নাচতে হবে। এরা এসেছে ভরতপুর থেকে, দেখবে।

মুখের দিকে চাহিয়া বাজিকরী বলিল—একটি টাকা লিব কিন্তুক।

—আমি দেব।

—তুমি ভরতপুরের সিপাই ?

—হ্যাঁ।

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বাজিকরী বলিল—কিসের লগে এলে তুমরা ?

—কাজ আছে, পুলিশের কাজ।

ফিক করিয়া হাসিয়া মেয়েটি এবার বলিল—কার মাথা খেতে এসেছ আর কি !

কনেস্টবলটিও হাসিল।

বাজিকরী তাহার গা-ঘেঁষিয়া চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে বলিল—মানুষটা কে বঁধু ?

কনেস্টবলটা তাহার মুখের দিকে চাহিল ; মদিরদৃষ্টিতে বাজিকরী তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল, ঠোঁটের রেখায় রেখায় মাখানো লাস্যভরা হাসি।

মেয়েটা সত্যিই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া। এতটুকু সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষ দৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না। কণ্ঠে মৃদুস্বরে সঙ্গীত—

হায়রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা
হায়রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
তুমার লাজেই আমি মরি
নইলে আমার লাভ কিবা

কুল ত্যজিলাম, মন সঁপিলাম
কলঙ্কেরই কাজল নিলাম—
হায়রে মরি বস্ত্র নিয়া
তুমি আমায় লাজ দিবা!
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—

আগন্তুক কনেস্টবলটি একটা টাকাই দিল। খানিকটা পথও তাহাকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি বলিল—এইবার এস নাগর, আর লয়।

হাসিয়া সিপাহী বলিল—আচ্ছা।

—তুমি কিন্তুক লোক ভালো লয়।

—কেন?

—বল না কথাটা।—মেয়েটি ফিক করিয়া হাসিল।

অশ্বিনের প্রথম নির্মেঘ নির্মল নীল আকাশে মধ্যাহ্ন ভাস্কর, ভাস্বরতম দীপ্তিতে জ্বলিতেছে। বৈশাখের আকাশ প্রখরতম বটে কিন্তু এমন উজ্জ্বল নয়। বিগত বর্ষণসিক্ত মাটি হইতে সূর্যের উত্তাপে যেন বাষ্পোত্তাপ উঠিতেছে। ঘামে ভিজিয়া মানুষ সারা হইয়া গেল।

বাজিকরের দল এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহস্থের বাড়িতে তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এইবার সেইখানে গিয়া পাতা পাড়িয়া বসিবে।

বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে সেই বাজিকরী আসিয়া চাপিয়া বসিল।

—পেসাদ হ'ল মা ঠাকরন? বাবুদের সেবা হ'ল? পড়ল পাতার এঁটোকাঁটা?

বাড়ুজ্জে-গিন্নী বলিলেন—বস বস, চেঁচাসনে।

ছেলে দেবনাথ পান মুখে দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সে বাহির দরজার ওপাশ হইতে মেয়েটাকে ডাকিল—শোন।

কাছে আসিয়া ঠুক করিয়া একটি প্রণাম করিয়া মেয়েটা ফিক করিয়া হাসিল, বলিল—আপনকার ভিতরটা পাথরে গড়া।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবনাথ বলিল—বলেছিস মাকে?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া মেয়েটি বলিল—মিছা বলেছি তো বেটাবেটীর মাথা খাব বাবু।

—তুই দেখেছিস?

—নিজের চোখে গো। বাপ কাঁদছে, মা কাঁদছে, মেয়ের সেই পণ!

কথাবার্তায় বাধা পড়িল। ভিতর হইতে গিন্নী ডাকিলেন—হ্যাঁ গা বাজকরুনী, গেলি কোথায়?

দেবনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—দেখ, মা ডাকছেন।

গিন্নী বলিলেন—ওই শোন, ওর কাছে।

বাঁড়ুজ্জে-কর্তা মেয়েটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাজিকর তোরা?

—আজ্ঞা হ্যাঁ বাবু; আপনকাদের চরণের ধূলা।

—হুঁ। সাপ আছে? বাজি দেখাতে পারিস? গান গাইতে পারিস? মন্তরতন্তর ওষুধপত্র জানিস?

—আজ্ঞা হ্যাঁ হুজুর।

—ভাটরাজাকে জানিস? ভাটরাজা?

বার বার প্রণাম করিয়া মেয়েটা বলিল—ওরে বাপ রে! দেবতা আমাদের। ভগবান আমাদের। এখনও জমি খাই। দোহাই দিয়ে বাজি দেখাই।

মৃদু হাসিয়া কর্তা বলিলেন—ভাটরাজা নয়। তাঁর নাম হ'ল ভবদেব ভট্ট। আর তোদের গ্রামের নাম কি জানিস? সীথল গাঁ নয়—সিদ্ধল, সিদ্ধল।

গিন্নী রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন, বলি হ্যাঁগা! ঐ সব জিজ্ঞেস করতে তোমায় ডাকলাম বুঝি? যত বাজে—

—বাজে নয়। রাঢ়দেশে সিদ্ধলে ভবদেব ভট্ট মহা প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি—

—এই দেখ, এইবারে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

কর্তা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন।

মেয়েটারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না; সীথল গ্রামের নাম সিদ্ধল, ভাটরাজার নাম ভবদেব ভট্ট! সে বলিল—কর্তা বাবু, আপনি এত কি কর‍্যা জানলা গো?

গিন্নী বলিলেন—বউমার কথা জিজ্ঞেস কর ওকে। ও নিজের চোখে দেখেছে।

—জিজ্ঞেস আর কি করব! আজই ব্যবস্থা করছি আমি—কর্তা চলিয়া গেলেন পড়ার ঘরে। সিদ্ধলে ভবদেব ভট্টের ইতিহাসটা আজও তাঁহার অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আজ এই বাজিকরীকে দেখিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নেরও শেষভাগ।

বাজিকেরর দল গ্রাম ছাড়িয়া আপন গ্রাম সীথল গ্রামের দিকে চলিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া সেই বাজিকরীটা থমকিয়া দাঁড়াইল।

—তুরা চল গো। সবরাজপুরের হোথা দাঁড়াস খানিক, আমি এলাম বল্যে।

দলের কেহ কোনো প্রশ্ন করিল না, বলিল—আচ্ছা।

—হ্যাঁ, ও নটবর, তুর বাজির ঝোলা আর ঢোলকটা দিবি ?

নটবর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তু বড় বাড়াবাড়ি করছিস কিন্তুক।

মেয়েটা উত্তরে কেবল হাসিল। নটবর মুখে ওকথা বলিলেও ঝুলি ও ঢোলক দিতে আপত্তি করিল না। কাঁকালের ঝুড়িতে কাপড় চাপা দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া লইয়া মেয়েটা দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। আসিয়া উঠিল ডোমপাড়ায়।

ডোমপল্লী—এ অঞ্চলের বিখ্যাত চোর-ডাকাতের পল্লী। পল্লীর প্রত্যেক মানুষটির রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে অসংখ্য কোটি চৌর্যপ্রবণতার বীজাণু যেন কিলবিল করে।

—গান শোনবা। গান! নাচন দেখ। নাচন!—মেয়েটা শশী ডোমের বাড়ি আসিয়া ঢুকিল। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিল না, গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান গাহিতে গাহিতে চকিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সহসা নজরে পড়িল কোঠার জানলায় একখানি মুখ। বাইশ-চব্বিশ বৎসরের জোয়ানের মুখ। মুখখানা তাহার ভালো লাগিল। গান শেষ করিয়া সে শশীকে ডাকিল—শোন।

—কি ?

—উপরের মানুষটি কে ?

শশী ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল।

হাসিয়া মেয়েটি বলিল—রাগ করছ কেনে, ভালো বলছি। তুমার জামাই, হামি জানি।

শশী স্তম্ভিতের মত মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি বলিল—ভরতপুর থেকে দারোগা এসেছে। সেপাই এসেছে। কাল সকালে তুমার ঘর খানাতল্লাশ হবে, উয়ার নামে পরোয়ানা আছে।

শশী এবার শুকাইয়া গেল।

—তুমার তুয়ারে সারাদিন লোক মোতায়েন আছে। সাঁজের পরে ঘর ঘেরাও করবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল, জানি।

—এক কাজ কর। এই ঢোলক দাও, এই ঝুলি দাও উয়ার কাঁধে। মাথায় মুখে গামছাটা বেঁধ্যা দাও ফেটা করে। আমার সাথে সাপ আছে। আমি ধরি মুখটা—উ ধরুক লেজটা। তুমরা চেঁচাও সাপ সাপ বল্যা। আমি উয়াকে নিয়ে চল্যা যাই, পুলিশের লোক বুঝতে লারবে, ভাববে আমরা বাজিকর।

মেয়েটা হাসিতে আরম্ভ করিল, সে যেন আকণ্ঠ মদ খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছে।

বাজিকরী চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার নকল বাজিকর। দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া গ্রাম পার হইয়া চলিতেছে। দক্ষিণপাড়া ভদ্রলোকের পল্লী, পল্লীপথে একখানা পাল্কি আসিতেছে। সঙ্গে তুইজন লোকের মাথায় বাক্স ও কুটুম্ব-বাড়ির তত্ত্বতল্লাশের জিনিসপত্র।

পাল্কিটা আসিয়া থামিল বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে। পাল্কি হইতে নামিল বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির বধূ—মুখুজ্জে-বাড়ির মেয়ে রমা। বাঁড়ুজ্জে-গিন্নী আজই দেবনাথকে পাল্কির সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার বধূ আজই সন্ধ্যার পূর্বে মাহেন্দ্রযোগে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুখুজ্জে-কর্তার অমত কোনোকালেই ছিল না। মুখুজ্জে-গিন্নীও আর অমত করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল—দেবনাথ নিজে আসিয়া কন্যার অভিমান ভাঙাইয়া লইয়া যাইবে, তবে পাঠাইবেন। দেবনাথ নিজে লইতে আসিয়াছে, কন্যার অভিমান নাই, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্মত হইয়া পাঠাইয়া দিলেন। জামাইয়ের হাত ধরিয়া চোখের জলও ফেলিয়াছেন। কাল তিনি বেয়ানের কাছেও আসিবেন। বাপ রে, তিনি জামাইয়ের মা, তাহার উপর তিনি গাহিতে পারেন। মেয়ে পাঠাইয়া তিনি কর্তার কাছে চলিলেন—মেয়ে-জামাইয়ের পূজার তত্ত্বের ফর্দ লইয়া।

মুখুজ্জে-গিন্নী কর্তার ঘরে ঢুকিয়া লজ্জায় গালে হাত দিলেন। তাঁহার প্রতিবেশীর ঘরের খোলা জানালা দিয়া যাহা তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার লজ্জার অবধি রহিল না। প্রতিবেশিনী মেয়েটি তো খুকী নয়, সে আজ রঙীন শাড়ি পরিয়াছে, ব্লাউজ পরিয়াছে, কেশ-বিন্যাসের কী পারিপাট্য, খোঁপায় ফুল। স্বামীর সহিত যাহার দিনরাত ঝগড়া হইত—সে হাসিয়া স্বামীর হাতে পান দিতেছে। স্বামীও হাসিতেছে।

রমা পাল্কি হইতে নামিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া নীরবে অপরাধিনীর মত দাঁড়াইল।

শাশুড়ী সেইটুকু অনুভব করিয়া সস্নেহে বধূর মাথার সিঁদুর দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—ছি মা, কী সর্বনাশ হ'ত, বল দেখি!

রমার চোখ হইতে টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। গিন্নী বলিলেন—যাও, আপনার ঘর দেখেশুনে নাও গে। আমি বুড়োমানুষ, পারব কেন, তবু যা পেরেছি গুছিয়ে রেখেছি।

গিন্নী কর্তার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। কর্তা ঘার গুঁজিয়া লিখিতেছিলেন।

—দেখ, কথাটা সত্যি।

—হুঁ।

আফিং যদি সত্যি না খেতে চাইবে, তবে বৌমা কাঁদল কেন? বাজিকরী ভাগ্যে দেখেছিল। ছুঁড়িটা এইদিন এলে একখানা কাপড় দেব।

কর্তা মুখ তুলিয়া বিজ্ঞের মত খানিকটা হাসিয়া বলিলেন—ওদের খবর মিথ্যা হয় না গিন্নী। ওরা কারা জান?—আবার খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, ওরা নিজেরা অবশ্য জানে না; বাংলাদেশেই বা ক'জন জানে? শোন—রাঢ়ের সিদ্ধলরাজ ভবদেব ভট্ট—গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায়। নারী এবং পুরুষ—উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ-দেশান্তরের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিত। তৎকালীন অন্যান্য রাজারাও এই দৃষ্টান্তে—

গিন্নী চলিয়া যাইতেছিলেন, কর্তা বলিলেন—শেষটা শোন—

গিন্নী পিচ কাটিয়া বলিলেন—ওসব শুনবার আমার এখন সময় নেই। যত সব উদ্ভট কথা।

গ্রামের প্রান্তে নকল বাজিকরকে বিদায় দিয়া বাজিকরী বলিল—চললাম লাগর। এইবার চল্যা যাও সোজা।

দ্রুতপদে বাজিকরী সবরাজপুরের দিকে চলিল।

এত বড় ডোম জোয়ানটি বার বার কথা বলিতে চাহিয়াও পারিল না। বহু কষ্টে অবশেষে তাহার কথা ফুটিল, সে ডাকিল—শোন।

কেহ উত্তর দিল না। রাত্রির অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখে ডোম ছেলেটি দৃষ্টি হানিয়া তাকাইল—কিন্তু দেখিতে পাইল না। বাজিকরী যেন মিলাইয়া গিয়াছে।

## বেদেনী

শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বৎসর আসে। তাহার বসিবার স্থানটা মা কঙ্কালীর এস্টেটের খাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে, ভোজবাজি—'ছারকাছ'। ছোট তাঁবুটার প্রবেশপথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও লেখা আছে 'ভোজবাজি—সার্কাস'। লোকটার এক পাশে একটা বাঘের ছবি, অন্য পাশে একটা মানুষ, তাহার এক হাতে রক্তাক্ত তলোয়ার, অপর হাতে একটা ছিন্নমুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুই পয়সা। ভোজবাজি অর্থে 'গোলোকধামের' খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দায় শম্ভু মোটা লেন্স লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের যুদ্ধ', 'দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়', 'তাজবিবিকা কবর'। তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্বশেষে একটা পর্দা ঠেলিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দী একটা চিতাবাঘ। বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর

চাপাইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বাঘটাকে খাওয়ায়, শেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয় মাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। সরল পল্লী-বাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া উঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়, দর্শকের দল বাহির হইয়া যায়। সর্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাকটা পিটিতে থাকে—দুম দুম দুম। জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রাধিকা বেদেনী একজোড়া প্রকাণ্ড করতাল বাজায়—ঝন-ঝন-ঝন।

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে—বাঘ! ওই বড় বা-ঘ!

বেদেনী প্রশ্ন করে—বড় বাঘ কি করে?

—পক্ষিরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের চুমা খায়, জ্যান্ত মানুষের মাথা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলো শেষ করিয়াই সে ভিতরে গিয়া বাঘটাকে তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশ দিয়া খোঁচা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা বার বার গর্জন করিতে থাকে। তাঁবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিপূর্ণ কৌতূহল-কম্পিত বক্ষে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এ ছাড়াও বেদেনীর নিজের খেলা আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর ও গোটাকতক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি-ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করিয়া আনে।

এবার শম্ভু কঙ্কালীর মেলায় আসিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আর একটি বাজির তাঁবু আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুট অনেক বড় এবং কায়দাকরণেও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহিরে দুইটা ঘোড়া, একটা গরুর গাড়ির উপর একটা খাঁচা রহিয়াছে, নিশ্চয়ই উহাতে বাঘ আছে।

গরুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে মর্মান্তিক ঘৃণায় হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপর আক্রোশভরা নিম্নকণ্ঠে বলিল, শালা

তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ছাপ যেন মাখানো আছে। ক্রুর-নিষ্ঠুরতাপরিব্যঞ্জক একধারার উগ্র তামাটে রঙ আছে—শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে; আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নীচেই একটা খাঁজ, সাপের মত ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সে দন্তুর, সম্মুখের দুইটা দাঁত যেন বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে। হিংসায় ক্রোধে সে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রাধিকাও হিংসায় ক্রোধে ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে চকমক করিয়া উঠে, তেমনিই ঝকমক করিয়া উঠিল; সে বলিল—দাঁড়া, বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁকা ছেড়্যা!

রাধিকার উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধ দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নূতন তাঁবুটার ভিতরে ঢুকিয়া বলিল—কে বটে, মালিক কে বটে?

—কি চাই?—তাঁবুর ভিতরের আর একটা ঘরের পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সবল এবং দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; লম্বা হাল্‌কা দেহ;—তেজী ঘোড়ার যেমন মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে—লোকটির হাল্‌কা অথচ সবল দৃঢ় শরীরের তেমনই একটি লাবণ্য আছে। রঙ কালোই, নাকটি লম্বা টিকালো, চোখ সাধারণ, পাতলা ঠোঁট দুইটির উপর তুলি দিয়া আঁকা গোঁফের মত একজোড়া গোঁফ সূচ্যগ্র করিয়া পাক দেওয়া, মাথায় বাবরি চুল, গলায় কারে ঝুলানো একটি সোনার ছোট চাকা তক্তি—সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। দুইজনেই দুইজনকে দেখিতেছিল।

—কি চাই?—নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল, কথার সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে শম্ভুর নাকের নীচে বায়ুস্তর ভুরভুর করিয়া উঠিল।

শম্ভু খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল—এ জায়গা আমার। আমি আজ পাঁচ বৎসর এইখানে বসছি।

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডান হাতে শম্ভুর বাঁ হাত চাপিয়া ধরিল, মাতালের হাসি হাসিল, বলিল—সে হবে, আগে মদ টুক্‌চা—

শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্র দ্রুততম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল, বলিল, ক'টি বোতল আছে তোমার নাগর—মদ খাওয়াইবা?

ছোকরাটি শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চাহিয়া রাধিকাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহে কথা হারাইয়া নির্বাক হইয়া গেল। কালো সাপিনীর মত ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সুতার মত সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে টানা টানা অর্ধনিমীলিত-ভঙ্গির মদির দৃষ্টি দুইটি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিল। মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় একটা নেশা। শুধু রাধিকারই নয়, এই বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত রূপবৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য রাধিকার রূপের একটা প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের মত ধারের ইঙ্গিত, চারিদিকে হিংস্র তীক্ষ্ণ উগ্রতার আভাস, মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়, ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

রাধিকার খিলখিল হাসি থামে নাই, সে নূতন বাজিকরের বিস্ময়বিহ্বল নীরব অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল, বাক হর‍্যা গেল যে নাগরের?

বাজিকর এবার হাসিয়া বলিল—বেদের বাচ্চা গো আমি। বেদের ঘরে মদের অভাব! এস।

কথা সত্য, এই জাতিটি মদ কখনও কিনিয়া খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, ধরাও পড়ে, জেলেও যায়। কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখনও ছাড়ে না। শাসন-বিভাগের নিকট পর্যন্ত ইহাদের এই অপরাধটা অতি সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শম্ভুর বুকখানা নিশ্বাসে ভরিয়া এতখানি হইয়া উঠিল। আহ্বানকারীও তাহার স্বজাতি, নতুবা—সে রাধিকার দিকে ফিরিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—তুই আইলি কেন এখেনে?

রাধিকা এবারও খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরণ তুমার! আমি মদ খাব নাই?

তাঁবুর ভিতরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে মদের আড্ডা বসিল। চারিদিকে পাখির মাংসের টুকরা টুকরা হাড়ের কুচি ও

একরাশি মুড়ি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; একটা পাতায় এখনও খানিকটা মাংস, আর একটায় কতকগুলো মুড়ি পেঁয়াজ লঙ্কা, খানিকটা নুন, দুইটি খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্ধসমাপ্ত। বিস্রস্তবাসা একটি বেদের মেয়ে পাশেই নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, মাথার চুল ধুলায় রুক্ষ, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া উর্ধ্বাহুর ভঙ্গিতে মাটির উপর লুণ্ঠিত, মুখে তখনও মদের ফেনা বুদ্বুদের মত লাগিয়া রহিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটি।

রাধিকা তাহাকে দেখিয়া আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—তোমার বেদেনী? ই যি কাটা কলাগাছের পারা পড়েছে গো!

নূতন বাজিকর হাসিল, তারপর সে স্খলিতপদে খানিকটা অগ্রসর হইয়া একটা স্থানের আলগা মাটি সরাইয়া দুইটা বোতল বাহির করিয়া আনিল।

মদ খাইতে খাইতে কথা যাহা বলিবার বলিতেছিল নূতন বাজিকর আর রাধিকা।

শম্ভু মত্ততার মধ্যেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। প্রথম পাত্র পান করিয়াই রাধিকা বলিল—কি নাম গো তুমার বাজিকর?

নূতন বাজিকর কাঁচা লঙ্কা খানিকটা দাঁতে কাটিয়া বলিল, নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

—কেনে?

—নাম বটে কিষ্টো বেদে।

—তা গালি দিব কেনে?

—তুমার যে নাম রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই সে আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষিপ্র হস্তে কি বাহির করিয়া নূতন বাজিকরের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—কই, কালিয়াদমন কর দেখি কিষ্টো, দেখি!

শম্ভু চঞ্চল হইয়া পড়িল; কিন্তু কিষ্টো বেদে ক্ষিপ্র হাতে আঘাত করিয়া সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কালো কেউটের বাচ্চা। আহত সর্পশিশু হিস্-হিস্ গর্জনে মুহূর্তে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়া উঠিল; শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল—আ-কামা—অর্থাৎ বিষদাঁত

এখনও ভাঙা হয় নাই। কিষ্টো কিন্তু ততক্ষণে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে ডান হাতে ট্যাক হইতে ছোট একটা ছুরি বাহির করিয়া দাঁত দিয়া খুলিয়া ফেলিল; এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুই-ই কাটিয়া ফেলিয়া রাধিকার গায়ে আবার ছুঁড়িয়া দিল। রাধিকাও বাঁ হাতে সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগে সে মুহূর্তপূর্বের ওই সাপটার মতই ফুলিয়া উঠিল, বলিল, আমার সাপ তুমি কামাইলা কেনে?

কিষ্টো বলিল, তুমি যে বলল্যা গো দমন করতে।—বলিয়া সে এবার হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাধিকা মুহূর্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই।

নূতন তাঁবুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে মাচা বাঁধিয়া সেটার উপর বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে; একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাধিকা আপনাদের ছোট তাঁবুটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের খেলার তাঁবু এখনও খাটানো হয় নাই। রাধিকার চোখ দুইটি হিংস্রভাবে যেন জ্বলিতেছিল।

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল, আরও একটু দূরে একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কেষ্টো। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে, বলে—বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসা পূজা করে, মঙ্গলচণ্ডী-ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু-পুরাণ-কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। এমনই আর একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দু-পুরাণ গান করে, তাহারা নিজেদের বলে—পটুয়া, বিপুল চিত্রকরের জাতি। বিবাহ আদান-প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামী পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়। জীবিকায় বাজিকরেরা সাপ ধরে, সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়। অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ

লইয়া খেলা দেখায়, কিন্তু নূতন তাঁবুর মত সমারোহ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কখনও খেলা দেখায় নাই। রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া বাঘটাকে সে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকণ লোম; মুখে হাসির মত ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাবটা স্থবির শিথিলদেহ, অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠে। কতবার সে শম্ভুকে বলিয়াছে একটা নূতন বাঘ কিনিবার জন্য, কিন্তু শম্ভুর কি যে মমতা ঐ বাঘটার প্রতি, তাহার হেতু সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না।

নামাজ সারিয়া শম্ভু ফিরিয়া আসিতেই সে গভীর ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল—তুর ওই বুড়া বাঘের খেলা কেউ দেখতে আসবে নাই।

ক্রুদ্ধ শম্ভু বলিল—তু জানছিস সব!

রাধিকা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল—না, জেনে না আমি! তু-ই জানছিস সব!

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রাধিকা থামিল না, কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল—ওরে মড়া, মড়ার নাচ দেখতে কার কবে ভাল লাগে রে! আমারে বলে তুই জানছিস সব।

শম্ভু মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, পরিপূর্ণভাবে তাহার হিংস্র দুই পাটি দাঁত ওই বাঘের মত ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল—ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিনীর মত গর্জন করিয়া উঠিল—কি বুললি বেইমান?

শম্ভু আর কোনো কথা বলিল না, অঙ্কুশভীত বাঘের মত ভঙ্গিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেইমান! তাহাকে এতবড় কথাটা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের বয়সটাও তাহার মনে নাই। চল্লিশ বৎসরের পুরুষ। তুই তো বুড়া! রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই বুড়া ছাড়া আর কি? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে? রাধিকা তাড়াতাড়ি আপনাদের তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

সত্য কথা সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতেরো। তাহারও তিন বৎসর পূর্বে শিবপদ বেদের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বৎসর তিনেকের বড়। আজও তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ। সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি। সাপ, বাঁদর, ছাগল এসবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ, ধামা বুনিত, চেয়ার পালিশের কাজ করিত, ফুলের শৌখিন সাজি তৈয়ার করিত, তাহাতে তাহার উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশী। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বাহির হইত; সে কাঁধে ভার বহিয়া লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস, রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঁদর ছাগল। শিবপদর সঙ্গে আরও একটি যন্ত্র থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা থাকিত বাঁশের বাঁশী। রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশী বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদর আর একটি বড় গুণ ছিল। তাহাদের সামাজিক মজলিসে বৃদ্ধদের আসরেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ, এবং লেখাপড়াও কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল, এইজন্য তাহার পরামর্শ প্রবীণেরাও গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে সম্মান কত তাহার। আর সেই শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মত। টাকাকড়ি সব থাকিত রাধিকার কাছে। তাঁতে বোনা কালো রঙের জমির সাদা সূতার ঘন ঘন ঘরকাটা শাড়ি পরিতে রাধিকা খুব ভালবাসিত, শিবপদ বারো মাস সেই কাপড় তাহাকে পরাইয়াছে।

এই সময় কোথা হইতে দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর আসিল এই শম্ভু, সঙ্গে এই বাঘটা, ছেঁড়া তাঁবু, আর এক বিগতযৌবনা বেদেনী। বাঘ ও তাঁবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। রাধিকা প্রথম যেদিন শম্ভুকে দেখিল, সে দিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। সে এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠদেহ মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভুও তাহাকে দেখিতেছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত, সে-ই প্রথম ডাকিয়া বলিল—এ-ই বেদিনী, দেখি তুর সাপ কেমন।

রাধিকার কি যে হইয়াছিল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—শখ যে খুব ? পয়সা দিবা ?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল, পয়সা দিব না ; তু সাপ দেখালে আমি বাঘ দেখাব।

বাঘ ! রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা ? যেমন অদ্ভুত চেহারা, তেমনই কী অদ্ভুত কথা ; বলে—বাঘ দেখাইবে। সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল, সত্যি বলছ ?

—বেশ, দেখ, আগে আমার বাঘ দেখ ! সে তাহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া গিয়া সত্যই বাঘ দেখাইয়াছিল। রাধিকা সবিস্ময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—ই বাঘ নিয়া তুমি কি কর ?

—লড়াই করি, খেলা দেখাই।

—এঁ্যা !

—হ্যাঁ, দেখবি তু ?—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা দুই হাতে ধরিয়া বাঘের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল—তু এইবার সাপ দেখা আমাকে !

রাধিকা সেকথার উত্তর দেয় নাই, বলিয়াছিল—উটা তুমার পোষ মেনেছে ?

হি-হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সবলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, হি, বাঘিনী পোষ মানাতেই আমি ওস্তাদ আছি।

কি যে হইয়াছিল রাধিকার, এক বিন্দু আপত্তি পর্যন্ত করে নাই। দিনকয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদর বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা-বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ছি-ছি করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা সে-সব গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার আনীত শিবপদর অর্থেই শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার অন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল। সে অর্থ আজ নিঃশেষিত হইয়া

আসিয়াছে, দুঃখেই দিন চলে আজকাল; শম্ভু যাহা রোজগার করে, সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্য দুঃখ করে নাই। আর বেইমান কিনা এই কথা বলিল? সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।

ওদিকে নূতন তাঁবুতে আবার বাজনা বাজিতেছে। দোসরা দফার খেলা আরম্ভ হইবে। মদ খাইয়া রাধিকা হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, ওই বাজনার শব্দে তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। উহাদের তাঁবুতে নিশীথ রাত্রে আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

সহসা তাহাদের তাঁবুর বাহিরে শম্ভুর ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে মত্ততার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিষ্টো। তাহার পরনে ঝকঝকে সাজপোশাক, চোখ রাঙা, সে-ই তখন কথা বলিতেছিল, কেনে ইথে দোষটা কি হ'ল? তুমরা বসে রইছ, আমাগোর খেলা হছে। খেলা দেখবার নেওতা দিলাম তা দোষটা কি হ'ল?

শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল—খেল দেখাবেন খেলোয়াড়ী আমার। অপমান করতে আসছিস তু।

কিষ্টো কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই উত্তেজিত রাধিকা একটা ইট কুড়াইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া বসিল। অব্যর্থ লক্ষ্য, কিন্তু কিষ্টো অদ্ভুত, সে ইটটা বলের মতো লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল। বিস্ময়ে রাধিকা সামান্য কয়টা মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সে ঘোর কাটিতেই সে বর্ধিত উত্তেজনায় আবার একটা ইট কুড়াইরা লইল; শম্ভু তাহাকে নিবৃত্ত করিল, সে সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল আবেগে শম্ভুর গলা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভু বলিল—এই মেলার বাদেই বাঘ কিনে লিয়ে আসব।

ওদিকের তাঁবু হইতে কিষ্টোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, খোল কানাত, ফেলে দে খুল্যে।

তাঁবুর একটা ছেঁড়া ফাঁক দিয়া রাধিকা দেখিল, তাঁবুর কানাত খুলিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ভিতরে না গেলেও তাহারা যেন দেখিতে

বাধ হয়। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, দিব আগুন ধরাইয়া তাঁবুতে।

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরত দেখাইতেছে। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নতুন খেলা কিছু বার কর তুমি, নইলে বদনামী হবে, কেউ দেখবে না খেলা আমাগোর।

শম্ভু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, পুলিশে ধরাইয়া দিব শালাকে। মদের সন্ধান দিয়া দিব।

ওদিকে টিয়াপাখিতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের উপর ছাতা মাথায় দিয়া নাচিল, বাঘটার সহিত কিষ্টো লড়াই করিল, ই:— একটা থাবা বসাইয়া দিল বাঘটা!

রাধিকা আপনাদের খেলার দৈন্যের কথা ভাবিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশেও ফুলিতেছিল। তাঁবুতে আগুন ধরিলে ধুধু করিয়া জ্বলিয়া যায়! কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

পরদিন সকালে উঠিতে রাধিকার একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল; উঠিয়া দেখিল, শম্ভু নাই; সে বোধ হয় দুই-চারিজন মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিষ্টোর তাঁবুর চারিপাশে পুলিস দাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে একজন দারোগা বসিয়া আছেন। এ কি! সে সটান গিয়া দারোগার সামনে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন—ডাক সব, আমরা তাঁবু দেখব।

আবার সেলাম করিয়া বেদেনী বলিল—কি কসুর করলাম হুজুর?

—মদ আছে কি না দেখব আমরা। ডাক বেটাছেলেদের। এইখান থেকেই ডাক।

রাধিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই তাঁবুরই লোক ভাবিয়াছেন; কিন্তু সে আর তাঁহার ভুল ভাঙাইল না। সে বলিল—ভিতরে আমার কচি ছেলে রইছে হুজুর—

—আচ্ছা, ছেলে নিয়ে আসতে পার তুমি। আর ডেকে দাও পুরুষদের।

রাধিকা দ্রুত তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা জায়গাটার আলগা মাটি সরাইয়া দেখিল, তিনটা বোতল তখনও মজুত রহিয়াছে। সে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বোতল তিনটাকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া বুকে ধরিল যে, শীতের দিনে সযত্নে বস্ত্রাবৃত অত্যন্ত কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁবুর মধ্যেই কিষ্টো অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পায়ের ঠেলা দিয়া রাধিকা বলিল—পুলিশ আইছে, বসে রইছে দুয়ারে, উঠ্যা যাও।

সে অকম্পিত সংযত পদক্ষেপে স্তন্যদানরত মাতার মত শিশুকে যেন বুকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। তাহার পিছনে পিছনেই কিষ্টো আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগার প্রশ্ন করিলেন—এ তাঁবু তোমার?

সেলাম করিয়া কিষ্টো বলিল—জী হুজুর।

—দেখব তাঁবু আমরা, মদ আছে কি না দেখব।

মেলার ভিড়ের মধ্যে শিশুকে বুকে করিয়া বেদেনী ততক্ষণে জলরাশির মধ্যে জলবিন্দুর মত মিশিয়া গিয়াছে।

শম্ভু গুম হইয়া বসিয়াছিল, রাধিকা উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। শম্ভু তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শম্ভু ফিরিয়া আসিতে বিপুল কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিশকে ঠকানোর বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল—ভেল্কি লাগায়ে দিছি দারোগার চোখে।

শম্ভু কঠিন আক্রোশভরা দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিল। রাধিকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে আসিয়া বলিল—খাবা, ছেলে খাবা?

শম্ভু অতর্কিতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বলিল—সব মাটি করে দিছিস তু; উহাকে আমি জেহেলে দিবার লাগি পুলিশে বলে এলাম, আর তু করলি এ কাণ্ড!

রাধিকা প্রথমটায় ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুর কথা সমস্তটা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল গত রাত্রির কথা, সত্যই একথা তো সে বলিয়াছিল। সে আর প্রতিবাদ করিল না, নীরবে শম্ভুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ণ হইতে এই তাঁবুতে খেলা আরম্ভ হইবে।

শম্ভু আপনার জীর্ণ পোশাকটি বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙের চোঙের মত সরু প্যাণ্টালুন, আর একটা কালো রঙেরই খাটো-হাতা কোট। রাধিকার পরনে পুরানো রঙিন ঘাগরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুলহাতা বডিস। অন্য সময় মাথার চুল সে বেণী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত, কিন্তু আজ সে বেণীই বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞায় ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল। উহাদের তাঁবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মত গাল মোটা, স্থবিরার মত স্থূলাঙ্গী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জির মত টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর জরিদার সবুজ সাটিনের একটা জাঙ্গিয়া ও কাঁচুলী ঢঙের বডিস, কুৎসিত মেয়টাকেও যেন সুন্দর দেখাইতেছে। উহাদের জয়ঢাকটার বাজনার মধ্যে কাঁসা-পিতলের বাসনের আওয়াজের মত একটা রেশ শেষকালে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। আর এই কতকালের পুরানো একটা ঢ্যাপঢ্যাপে জয়ঢাক, ছি!

কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, জোরে করতাল পেটে।

শম্ভু বাজনা থামাইয়া হাঁকিল, ও—ই ব—ড় বা—ঘ।

রাধিকা রুদ্ধস্বর কোনমতে সাফ করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—বড় বাঘ কি করে?

শম্ভু খুব উৎসাহভরেই বলিল—পক্ষিরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মানুষের মাথা মুখে ভরে, চিবায় না।

সে এবার লাফ দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া বাঘটাকে খোঁচা দিল, জীর্ণ বৃদ্ধ বনচারী হিংস্র আর্তনাদের মত গর্জন করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ও-তাঁবুর ভিতর হইতে সবল পশুর তরুণ হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাচার উপরে রাধিকা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার শরীর যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। ক্রূর হিংসাভরা দৃষ্টিতে সে ওই তাঁবুর মাচানের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিষ্টো হাসিতেছে। রাধিকার সহিত চোখাচোখি হইতেই সে হাঁকিল—ফিন একবার।

ও-তাঁবুর ভিতর হইতে দ্বিতীয়বার খোঁচা খাইয়া উহাদের বাঘটা এবার প্রবল গর্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। রাধিকার চোখে জ্বলিয়া উঠিল আগুন। জনতা স্রোতের মত কিষ্টোর তাঁবুতে ঢুকিল।

শম্ভুর তাঁবুতে অল্প কয়েকটি লোক সস্তায় আমোদ দেখিবার জন্য

ঢুকিল। খেলা শেষ করিয়া মাত্র কয়েক আনা পয়সা হাতে শম্ভু হিংস্র মুখ ভীষণ করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা দ্রুতপদে মেলার মধ্যে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিল একটা কিসের টিন লইয়া।

শম্ভু বিরক্তি সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি উটা ?

—কেরোচিন। আগুন লাগায়ে দিব উহাদের তাঁবুতে। পুরা পেলুম নাই, দু'সের কম রইছে।—তাহার চোখ জ্বলিতেছে।

শম্ভুর চোখও হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল—লিয়ে আয় মদ।

মদ খাইতে খাইতে রাধিকা বলিল—দাউ-দাও করে জ্বলবেক যখন !

সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অন্ধকারের মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ওই তাঁবুতে তখন খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ছেঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল, কিষ্টো দড়িতে ঝুলানো কাঠের লাঠিতে দোল খাইতে খাইতে কসরত দেখাইতেছে। উঃ, একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিতে লাগিল। দর্শকেরা করতালি দিতেছে।

শম্ভু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল—এখুন লয়, সেই নিশুত রাতে !

তাহারা আবার মদ লইয়া বসিল।

সমস্ত মেলাটা শান্ত স্তব্ধ, অন্ধকারে সব ভরিয়া উঠিয়াছে, বেদেনী ধীরে ধীরে উঠিল, এক মুহূর্তের জন্য তাহার চোখে ঘুম আসে নাই।

বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দান্ত জ্বালায় সে অহরহ যেন পীড়িত হইতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার থমথম করিতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। সে খানিকটা এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কেহ কোথাও জাগিয়া নাই। সে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালিল, ওই কেরোসিনের টিনটা রহিয়াছে। তারপর শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সে শীতে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। অপমান

ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে? সে শম্ভুকে ডাকিল না, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া, টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহির হইয়া গেল।

ওই পিছন দিক হইতে দিতে হইবে। ওদিকটা সমস্ত পুড়িয়া গেলে তবে এদিকটায় মেলার লোকে আলোর শিখা দেখিতে পাইবে। ক্রূর হিংস্র সাপিনীর মতই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া শন শন করিয়া চলিয়াছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া সে হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

চুপ করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁবুর ভিতরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে কানাতটা সন্তর্পণে ঠেলিয়া বুক প্াতিয়া মাথাটা গলাইয়া দিল। সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার। সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া ফস করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।

আহার কাছেই এই যে কিষ্টো একটা অসুরের মত পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। রাধিকার হাতের কাঠিটা জ্বলিতে লাগিল, কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কী সাহস! উঃ, বুকখানা কী চওড়া, হাতের পেশীগুলো কী নিটোল! তাহার আশেপাশে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ—ইটস্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে। ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা—ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন। দেশলাইটা নিবিয়া গেল।

রাধিকার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজকের আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্তা বেদেনী মুহূর্তে যাহা করিয়া বসিল, তাহা স্বপ্নের অতীত। সে উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

কিষ্টো জাগিয়া উঠিল, কিন্তু চমকাইল না, ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, কে? রাধি—

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাধিকা বলিল—হাঁ্যা, চুপ!

কিষ্টো চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল—দাঁড়াও মদ আনি।

—না। চল, উঠ, এখুনই এখান থেক্যে পলাই চল।

রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইতেছিল।

কিষ্টো বলিল—কুথা?

—হু-ই, দেশান্তরে।

—দেশান্তরে? ই তাঁবু-টাবু—?

—থাক পড়্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উয়ার রাধিকা লিবা, উয়াকে দাম দিবা না?

সে নিম্নস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উন্মত্ত বেদিয়া, তাহার উপর দুরন্ত যৌবন, কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল—চল।

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল—দাঁড়াও।

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল—চল।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।

তমসা

ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট একটি স্টেশন।

লাল কাঁকর-বিছানো মাটির-সঙ্গে-সমতল প্লাটফর্ম, তাও একটা প্লাটফর্মের কোলে পয়েনটিং-করা ছোট একখানা ঘরে স্টেশন-রুম, বাকীটা একটা টিনের শেড, সেই শেডের মধ্যেই ইট দিয়ে ঘেরা একখানা পার্শ্বেল-রুম, তার পাশে এক টুকরো ঘরের দরজার মাথায় লেখা 'জেনানা'।

স্টেশনের পিছন দিকে চা ও খাবারের স্টল। রেলের লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডারের স্টল। স্টেশনের দেওয়ালের গায়ে টিনের চালা নামানো হয়েছে। তার পরেই গুডস্ শেডের সাইডিং লাইন। ওখান থেকেই চলে গিয়েছে সোজা উত্তরমুখে লাল মাটির গ্রাম্য রাস্তা। ইউনিয়ন বোর্ডের কল্যাণে দু'পাশে নালা কাটা হয়েছে, দড়ি ধরে বেশ সোজা লাইন নয়, সাপের দাগের মত আঁকাবাঁকা করেই কাটা, তবু তাতেই খানিকটা সম্ভ্রান্ত চেহারা হয়েছে গ্রাম্য বাবুর মত। গ্রামের লোকে বলে স্টেশন-রোড, ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাতেও তাই লেখা আছে।

স্টেশন-সীমানা বা এরিয়া সামান্য। বুকিং অফিস, রেলওয়ে-লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেণ্ডারের চায়ের স্টল, মাল-গুদাম, দুটো মাত্র শান্টিং

লাইন। ব্যস—স্টেশন-এরিয়া শেষ। স্টেশন-সীমানার পরেই রাস্তার দু'পাশে খান কয়েক ঘর, এখানকার পান-বিড়ি সিগারেট আর চা-খাবারের দোকান। দু'খানায় কয়লার ডিপোর গদী। একখানায় স্টেশন-ভেণ্ডারের বাসা। এদের পাশে এক বর্ধিষ্ণু ভদ্রলোকের পাকাবাড়ি। বাকীটা ফাঁকা। বড় খড় বট গাছের ছায়া-ঢাকা তকতকে জায়গা। এইখানে গ্রামান্তরের গাড়ি এসে আড্ডা নেয়। এখান থেকে খানিকটা গিয়ে গ্রামের বসতি।

সকালে আপ ডাউন দুটো ট্রেন। এখানে ক্রসিং হয়। লোকে বলে মীট হয়। ট্রেন দুটো চলে গিয়েছে। স্টেশনের শেডের মধ্যে স্বল্প কয়েকটি লোক। অধিকাংশই স্থানীয়। যাত্রীর মধ্যে একটা খ্যামটা নাচের দল। দুটি তরুণী, একটি বুড়ী-ঝি, পুরুষ তিনজনের একজন হারমোনিয়াম-বাজিয়ে, একজন বেহালাদার, একজন বাজায় ডুগি-তবলা। তাদের ট্রেন বেলা দুটোয়। মেয়ে দুটির একটি কালো, দীর্ঘাঙ্গী। সে সেইখানে বসেই চুল বাঁধছে। অপরটি দেখতে সুন্দরী, সে একখানি বেঞ্চে ঘুমুচ্ছে। হারমোনিয়াম-বাজিয়েটি বেশ ফ্যাশন-দুরস্ত ছোকরা, সিগারেট মুখে সে প্লাটফর্মের এধার থেকে ওধার পায়চারি করে ফিরছে।

একটা অন্ধ ছেলে বসে আপন মনেই ঢুলছিল। কুৎসিত চেহারা। চোখ দুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পাগুলো অপুষ্ট, অশক্ত, পরনে একখানা মোটা সুতোর খাটো ময়লা কাপড়। মাথার চুলের পেছন দিকটা অত্যন্ত বিশ্রীভাবে ছোট করে কাটা। একটা ডুবকি হাতে নিয়ে আপন মনেই সে দুলছে, মধ্যে মধ্যে হাসছে, মধ্যে মধ্যে ঠোঁট নাড়ছে, আপন মনেই কথা বলছে বুঝা যায়। মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে। কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। কখনও জোরে নিশ্বাস নিয়ে কিছু শুঁকতে চাচ্ছে। জন-কয়েক কুলি স্টেশনের স্টলের কাছে বসে আছে, গল্প-গুজব করছে, মধ্যে মধ্যে স্টলের উনোন থেকে কাঠি জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে। নিভে যাচ্ছে, আবার ধরাচ্ছে।

প্লাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হারমোনিয়াম-বাজিয়ে ছোকরা শিষ দিচ্ছিল। এখনও ঘণ্টা পাঁচেক এখানে কাটাতে হবে। নিতান্ত বৈচিত্র্য-হীন স্থান। দেখবার কিছুই নাই। এমন কি তার সঙ্গে তরুণী দুটিকে

দেখে ঈর্ষান্বিত হবার মত তরুণ ভদ্রগণের পর্যন্ত অভাব এখানে। চৈত্রের শেষ ; সামনে খোলা শস্যহীন মাঠে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত পাতলা ধোঁয়ার একটা ছিলকে পড়েছে যেন। মধ্যে মধ্যে তাও যেন কাঁপছে।

স্টেশন-ঘরে কোকিল আছে। কোকিল ডাকছে স্টেশনের মধ্যে।

বিস্মিত হ'ল হারমোনিয়াম-বাজিয়ে। পাপিয়াও আছে না কি ? 'চোখ গেল' ডাক ক্রমেই চড়ছে।

কী বিপদ ! চিড়িয়াখানা না কি ? ভেড়া ডাকছে ! আরে, দিনে শিয়াল ডাকে ! হারমোনিয়াম-বাজিয়ে অদম্য কৌতূহলের আকর্ষণে ফিরল স্টেশনের দিকে। ও হরি ! ও, অন্ধ ছোড়াটা ! ছোঁড়াটা তখন ডুবকি বাজিয়ে গান ধরেছে।

গলাখানি তো চমৎকার মিঠে ! ও বাবা ! ও, শুধু গলাই মিঠে নয়, রসিকও খুব। গানখানা সত্যিই রসিকের উপযুক্ত।

'চোখে ছটা লাগিল,
তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।
মরি, মরি, বলিহারি—চোখে যে আর
সইতে নারি,
ঝিকিমিকি ঝিলিক নাচে,
হাতের ঘুরি-ফিরিতে।'

বেশ জমে উঠেছে এরই মধ্যে। ছোকরা উবু হয়ে বসে ডুবকি বাজিয়ের গান গেয়ে চলেছে, দন্তুর মুখে একমুখ হাসি, তালে তালে দুলছে। কুলির দল তার দিকে ফিরে বসেছে। হারমোনিয়াম-বাজিয়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে কেশপ্রসাধনরতা কালো মেয়েটির বেণীরচনারত হাত দু'খানি থেমে গিয়েছে, যে ঘুমুচ্ছিল সে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে, তার সদ্য ঘুম ভাঙা বড় বড় চোখ দুটিতে স্মিত কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি। বুড়ী-ঝিটা দোক্তা সহযোগে পান চিবুচ্ছিল বেশ আরাম করে, তার পান চিবুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

'রিনিঠিনি রিনিঠিনি, চুড়ি আবার
তোলে ধ্বনি,
আমার প্রাণের ব্যয়্‌লা ( বেহালা )
বাজে তোমার চুড়ির ছড়িতে !'

গানের গতি দ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়াটার দোলার মাত্রাও ন্তর হচ্ছে। উল্টে পড়ে না যায়! ওপাশে বেঞ্চের উপর সন্ত ভাঙা মেয়েটি উঠে বসল। চুল বাঁধছিল কালো মেয়েটি, সে মুচকে সে বলল—মরণ!

ছোকরার তখন মাতন লেগেছে।—

'হায়—হায়, আমি যদি হতেম চুড়ি,
কাঞ্চন নয়, কাচ-বেলোয়ারী
থাকতেম তোমার হাতটি বেড়ি
জেবন ( জীবন ) সফল করিতে।
হায় হায়, থাকত না খেদ মরিতে।'

হাই দিয়েই সে গান শেষ করলে।

শ্রোতার দল উচ্ছ্বসিত কলরবে বাহবা দিয়ে উঠল। প্রশংসায় তৃপ্ত অন্ধ দন্তরের মুখ হাসিতে ভরে গেল। একজন শ্রোতা একটা বিড়ি ওর হাতে সন্তর্পণে ধরিয়ে বললে—নে, খা।

—বিড়ি?

—হ্যাঁ। খা।

হেসে অন্ধ বললে—কে সিগারেট খাচ্ছে? একটা দ্যান কেনে গা!

দোকানী বলে উঠল—বেটা আমার বালকদাসী। আমার নাম দাসী, ভালোমন্দ খেতে ভালবাসি! সিগারেট খাবে! একটা রেটের দাম কত জানিস?

—আমার গানের বুঝি দাম নাই?

—নে নে, খা। এই নে। এবার হারমোনিয়াম-বাজিয়ে একটা রেট বার করে দিলে তাকে।

সিগারেটটি নিয়ে সে সবিনয়ে বললে—পেনাম বাবুমশায়! ঘোড়া ন, চাবুক দ্যান। দেশলাই জ্বেলে দ্যান।

দেশলাই জ্বেলে দিলে হারমোনিয়াম-বাজিয়ে। ওর সাদা ছানি চোখে আলোক-শিখার প্রতিবিম্ব পড়ে না। উত্তাপ অনুভব করে সে। অন্ধ সিগারেট টানে প্রাণপণে। সে টানের শক্তি প্রয়োগে ওর ঘাড় থরথর করে কাঁপে। দম ফুরিয়ে এলে তবে একমুখ ধোঁয়া ছোঁড়াটা ধূমরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আঃ!

সকলে হাসে তার ভঙ্গি দেখে। হারমোনিয়াম-বাজিয়ে বাবুটি বললে ই তো বেশ গান গাইতে পারিস রে! এ্যাঁ!

—হ্যাঁ, ভালো। বুঝলেন বাবুমশায়, সবাই বলে ভালো;
তা—।

একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে বললে—খুব ভালো করে গাইলে,
মানে পাণ-মন সমপ্পণ করে গাইলে মোহিত করে দিতে পারি। বুঝলেন?

এবার তরুণী দুটি খিল-খিল করে হেসে উঠল। সে হাসির শব্দে
চমকে উঠল অন্ধ। হাতের সিগারেটটা পড়ে গেল মাটিতে। মাটির
উপর আঙুলের প্রান্ত দিয়ে অনুভব করে সে সিগারেটটা খুঁজতে
খুঁজতে বললে—হাসছে? কে? কারা?—তারপর মৃদুস্বরে ডাকলে—
মলীন্দ।

মলীন্দ ওই কুলীদের একজন। সে বললে—কি?

—শোন, বলি।—সিগারেটটা হাতের ইশারায় ঠিক গোড়ার দিক
ধরে তুলে নিলে।

—কি?

—সরে আয়, কানে কানে বলব।

—কি? বল।

—মেয়েছেলেতে হাসছে। ভদ্দনোক, লয়?

—হ্যাঁ। বদ্দমানের।

—হুঁ। ঠিক বুঝতে পেরেছি আমি।

—কি করে বুঝলি?—অবিশ্বাসের হাসি হাসলে মলীন্দ।

—বুঝলাম গলার রজ্ (আওয়াজ) থেকে।

—কিন্তু ভদ্দনোক জানলি কি করে?—মলীন্দ প্রশ্ন করলে।

হেসে বললে অন্ধ—চুড়ির শব্দতে আর মিষ্টি সুবাস থেকে
অনেকক্ষণ থেকেই ও দুটো পাচ্ছিলাম, মনে মনে সন্দ লাগছিল
ছোটনোক হলে গায়ে ঘাম-গন্ধ ওঠে। কাঠের চুড়িতে এমন মিঠে শব্দ
ওঠে না। সোনার চুড়ি আছে হাতে, লয়?

—হ্যাঁ।

নীরবে সিগারেট টানতে টানতে অন্ধ বার বার জোরে নিশ্বাস
টানে ওই মিষ্ট গন্ধ নেবার জন্য। হঠাৎ সে বললে—তা, ঠাকরুনরা
হাসছেন, আপনাদিগকে বলছি—

কালো মেয়েটি মুখরা, চাপলা। খোঁপায় কাঁটা আঁটছিল সে। ঘাড়
ঈষৎ ফিরিয়ে অন্ধের দিকে চেয়ে বললে—আমাদের বলছ?

—হ্যাঁ, আপনারা হাসলেন কেনে?

কালো মেয়েটিই এবার মুখ টিপে হেসে বলল—সে আমরা নই, অন্য লোকে।

—অন্য লোকে?—অন্ধ ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে বলে—উঁহু।

—উঁহু কেন? অন্য লোকেই তো হাসলে।

ছোকরা এবার একটু বেশী হেসে বললে—শিঙের বাঁশী বাজে না ঠাকরুন, ক্যানেস্তারায় তবলার বোল ওঠে না।

—ও মা গো! মেয়েটি বিস্ময়ে কৌতুকে চোখ বিস্ফারিত করে সঙ্গিনীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে।

সুন্দরী তরুণীটির মুখেও মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সে-হাসির চেহারা যেন ভিন্ন রকমের। সে এবারে বললে—আমরা হেসেছি বলে তুমি রাগ করছ নাকি?

—রাগ?—অন্ধ হেসে বললে—ওরে বাপ রে, আপনাদের ওপর কি রাগ করতে পারি মশায়? তবে হাসলেন কেনে, তাই শুধালাম, বলি—অন্যায় কিছু বললাম নাকি?

—হারামজাদা!—দোকানী বলে উঠল—ওরে শুয়ার, হাসছেন তোমার মোহিত শুনে।

—কেনে, মোহিত করে দিতে পারি না আমি?

—খুব হয়েছে, থাম!

—কেনে?

—কাকে কি বলেছিস জানিস?

অন্ধ এবার সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

—ওরা হলেন কলকাতার গাইয়ে, কলের গান শোন নাই হারামজাদা! সেই রকম গাইয়ে, বড় বড় বাঈজী! বেটা পক্ষীরাজ উঁদিকে মোহিত করে দেবেন!

অপরাধীর মত সে এবার বললে—তা হলে তো অপরাধ হয়ে যেয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হয়েছে।

কালো মেয়েটি চুল বাঁধা শেষ করে গামছা কাঁধে ফেলে স্যুটকেস খুলে সাবান বার করে নিয়ে বললে—কাছেই পুকুর-ঘাট, নেয়ে আসি আমি।

অন্ধ হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল ছুঁড়ে। উপরের দিকে মুখ করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিঃশব্দে হাঁ করে হাসতে লাগল—নাকের ডগাটা তার ফুলে ফুলে উঠছিল। অত্যন্ত হাস্যকর এবং কুৎসিত সে মুখভঙ্গি।

দোকানী বললে—দেখ, দেখ, হারামজাদার মুখ দেখ। এ
হারামজাদা পঞ্চে!

অন্ধের নাম 'পঞ্চী'। পঞ্চে আকর্ণ-বিস্তার নিঃশব্দে হাসি হে
বললে—ভারি সুন্দর বাস উঠেছে সিংজী। পরাণ একেবারে মোহি
করে দিলে।

সুন্দরী মেয়েটি বললে—তোমার সেই মোহিত-করা গান যদি গা
তবে তোমাকে ওই সাবানখানা দিয়ে যাব।

মাথা চুলকে পঞ্চী বললে—দিয়ে যাবেন? গান গাইলে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তুক। একটু চুপ করে থেকে পঞ্চী বললে—আমার আস্প
হয়ে যেয়েচে আজ্ঞে। গান কি আপনকাদের ছামনে গাইতে পা
আমি?

—কেন? তুমি তো ভালো গান গাইতে পার। ভারি সুন্দর গ
তোমার!

—ভালো লেগেছে আপনকার?—অভ্যস্ত নিঃশব্দ হাসিতে মু
ভরে গেল পঞ্চীর।

কালো মেয়েটি বললে হারমোনিয়াম-বাজিয়েকে—এস আম
সঙ্গে। ঘাটে একটু দাঁড়াবে।

পঞ্চী বললে—একটা কথা বলব ঠাকরুন?

স্নিগ্ধ হাসি হেসে সুন্দরী মেয়েটি বললে—বল।

—রাগ করবেন না তো?

—না না, বল।

পঞ্চী কিন্তু চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বললে—নেতাই
মলীন্দ! চলে গেলি না কি? নেতাই?

—কেনে, নিতাইকে কেনে?—দোকানের দরজা বন্ধ করতে করতে
দোকানী বললে—জল খাবে না সব? বাড়ি যাবে না?

হেসে পঞ্চী বললে—আপনিও দোকানে তালা দিছে
লাগছে?

—হুঁ, দিলাম। জল খাবি তো আয়—আমি যাচ্ছি বাড়ি।

—উঁহু। খিদে নাই আজ।

সাড়ে দশটা পার হয়ে গিয়েছে। চৈত্র মাসে এবার এরই মধ্যে
চারিদিক ধূলিধূসর এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। স্টেশনে টিনের উত্তাপের

প্রাখর্যে মধ্যে মধ্যে কটাং কটাং শব্দ উঠছে। লাইনের জোড়ের মুখেও শব্দ উঠছে।

সুন্দরী তরুণীটি একদৃষ্টিতে অন্ধ পঞ্চীর দিকে চেয়ে রয়েছে। পঞ্চী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কখনও কখনও মুখ তুলছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘাড় নামাচ্ছে।

মেয়েটি বলল—কই, বলল না তো ?

—আজ্ঞে ?

—কি বলবে বলছিলে বল ?

—বলছিলাম—।—পঞ্চী লজ্জিত অপরাধীর মত হেসে ঘাড় নামালে।

—বল।—বলে মেয়েটি প্রতীক্ষা করে থাকে। প্রতীক্ষার মধ্যেই অন্যমনস্ক হয়ে ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টিতে। পঞ্চী ঘাড় তোলে মধ্যে মধ্যে, আবার ঘাড় নামায়। এই অবসরের মধ্যে হঠাৎ সে বলে ফেললে—বলছিলাম—কি— ?

ঠিক এই সময়েই মাথার উপর টিনের শেডের উপর শব্দ উঠল অত্যন্ত জোরে। মেয়েটি চমকে উঠল—কি রে বাবা ?

—উঁ আজ্ঞে—। বিজ্ঞের মত হেসে পঞ্চী বললে—রোদের তাতে টিনে শব্দ উঠছে।

—তাই নাকি ? রোদের তাপে টিনে শব্দ ওঠে ?

—হ্যাঁ। এ এখন সেই সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত উঠবে। এই দেখুন—এ শব্দ কিন্তু তাতের নয়, কাক বসল চালে।

মেয়েটি বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল প্লাটফর্মের উপর। কৌতূহল হ'ল তার। সত্যিই কাক বসেছে। সে বিস্মিত হয়ে ফিরে এসে দাঁড়াল পঞ্চীর কাছে। পঞ্চী চঞ্চল হয়ে উঠল। কয়েকবার স্ফীত হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র, মৃদুস্বরে সবিনয়ে বললে—বলছিলাম কি আজ্ঞে—।

মেয়েটি দু'টি আঙুল ওর চোখের সামনে নাড়ছিল।

পঞ্চী বললে—বলব মশায়, নির্ভয়ে ?

মেয়েটি আঙুল সরিয়ে নিলে পঞ্চীর নিষ্পলক চোখের সামনে থেকে।—বলবে ? বল। বার বারই তো বলতে বলছি।

—আপুনি একটি গান যদি গাইতেন।—কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে, নিঃশব্দ হাসিতে বিস্ফারিত মুখে সে মাথা চুলকাতে লাগল।

মেয়েটি হাসলে।—গান শুনবে ?

মেয়েটি হাত বুলিয়ে অনুভব করে পঞ্চী মেয়েটির পায়ের আঙুলের প্রান্ত স্পর্শ করে বললে—আপনাদের চরণ কোথা পাব বলেন ? গানই বা শুনব কি করে ? তবে—। একটু নীরব থেকে উপরের দিকে দৃষ্টিহীন মুখ তুলে বললে—সাধ তো হয়। মনিষ্যি তো বটে। আর গান শুনতে ভালবাসি আমি।

কি মনে হ'ল মেয়েটির, করুণা হয়ত, হয়ত খেয়াল, বললে—আচ্ছা। বলেই আবার চিন্তিত মুখে বললে—হারমোনিয়ামটা যে দেখি অনেক জিনিস চাপা পড়েছে।

—হারমণি ?

—হ্যাঁ।

—হারমণি থাক। আপুনি এমনি গান। আস্তে আস্তে গান। রোদ বেজায় চড়েছে। শুধু গলায় আস্তে আস্তে গান ভারি ভালো লাগবে।

কল্পনাটি বড় ভালো লাগল মেয়েটির। ঠিক বলেছে অন্ধ। সে গান ধরলে মৃদুস্বরে—

'কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু পথের পরে, কভু নদীর পারে
চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার
কাজল-পরা জোড়া আঁখি।'

পঞ্চীর সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের শিরায় উপশিরায় ওই গানের ধ্বনি-ঝঙ্কার বীণের বহুতন্ত্রী ঝঙ্কারের মত ধ্বনি তুলে সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তার।

গান শেষ হয়ে গেল। অন্ধকে গান শুনিয়ে মেয়েটির ভারি তৃপ্তি হ'ল। ঈষৎ হেসে সে প্রশ্ন করলে—কেমন ? ভালো লাগল ?

—আজ্ঞে ?—চকিত হয়ে উঠল পঞ্চী। তার অসাড় নিস্পন্দ শরীরে মুহূর্তেই চেতনার প্রবাহ বয়ে গেল।

—ভালো লাগল ?

পঞ্চী বললে—জেবন ধন্য হ'ল আমার, ঠাকরুন।

মেয়েটি এবার হেসে ফেললে।

—হাসছেন ? তা—। একটু চুপ করে থেকে পঞ্চী বললে—তা এমন গান জেবনে কোথা শুনতাম বলেন।

পঞ্চীর কথাগুলির মধ্যে একটি বেদনার সুর ছিল, তার স্পর্শে

মেয়েটি আর হাসতে পারলে না। চুপ করে গেল। কোনো কথাও খুঁজে পেলে না।

পঙ্খী বললে—একটি পেনাম করব আপনকাকে।

—প্রণাম? কেন?

—ভারি সাদ হচ্ছে।

লোভ হ'ল মেয়েটির। মুগ্ধ দৃষ্টি, অজস্র প্রশংসা, প্রেম-গুঞ্জন, অনেক পেয়েছে সে এবং পায়। কিন্তু প্রণাম? মনে পড়ল না তার। নিজেদের সমাজের ছোটরা অবশ্য প্রণাম করে। কিন্তু এ প্রণামের দাম অনেক বেশী বলে মনে হ'ল তার। সে প্রতিবাদ করলে না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

পঙ্খী হাত বুলোলো তার পায়ের উপর, তারপর মেয়েটির দু'খানি পায়ের উপর নিজের মুখখানি রাখলে।

মেয়েটির ভারি ভালো লাগল।

মেয়েটি পায়ে উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলে, পঙ্খীর বিকৃত চোখ থেকে জল ঝরে তার পায়ে লাগছে। তবু সে পা সরিয়ে নিলে না। ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে অর্থহীন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করলে—তোমার কে কে আছে বাড়িতে? মা। মা আছে? বাপ আছে?—শুনছ? ওঠ। ওঠ। অনেক প্রণাম করা হয়েছে। ওঠ। ওঠ।

—আরে, এই বেটা! এই! ও হচ্ছে কি? এই?—হারমোনিয়াম-বাজিয়ে এবং সেই কালো মেয়েটি স্নান সেরে ফিরে এসেছে। হারমোনিয়াম-বাজিয়ে ধমক দিলে পঙ্খীকে।

কালো মেয়েটি বললে—মরণ!

সুন্দরী তরুণীটি মৃদুস্বরে আবার বললে—ওঠ। ওঠ।

এবার পঙ্খী উঠল। তার দিকে চেয়ে কালো মেয়েটি এবং হারমোনিয়াম-বাজিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠল। পঙ্খীর চোখের জলে ভিজে মেয়েটির পায়ের আলতা অন্ধের মুখময় লেগেছে। গালে নাকে কপালে ঠোঁটে—মুখময় লাল রঙ।

মেয়েটি বললে—মুখটা মোছ। গোটা মুখে তোমার লাল রঙ লেগেছে।

—লাল রঙ?

—হ্যাঁ, আলতা লেগেছে।

—আলতা?

—হ্যাঁ, ঠোঁটে, মুখে, গালে, নাকে—মুছে ফেল।

—থাকুক আজ্ঞে।

কালো মেয়েটি বললে সঙ্গিনীকে—নে নে, ওর সঙ্গে আর ন্যাকামি করতে হবে না। ওদিকে দেখে এলাম ভাত হয়েছে। নেয়ে নিবি তো নেয়ে আয়। সুন্দর জল পুকুরের।

—কত দূর?

পঞ্খী উঠে দাঁড়াল।—এই কাছেই আজ্ঞে। কাছেই। চলেন, আমি নিয়ে যাচ্ছি। আসুন।

—তুমি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কানাদের পথঘাট মুখস্থ। ঠিক নিয়ে যাবে। যা না। —কালো মেয়েটি একটু হেসে বললে—নিশ্চিন্দি চান করবি, ও বসে থাকবে ঘাটে।

সত্য কথা। দিব্য পথে পথে চলে পঞ্খী। মধ্যে মধ্যে পা বুলিয়ে অনুভব করে নেয়। স্টেশন-রাস্তার ধারে প্রথম বটগাছটার তলার ছায়ায় এসে বলে—এই বটতলা এয়েছে। আসেন এই বাঁ ধারে।

একটু অগ্রসর হতেই পুকুর দেখা যায়। কালো কাজলের মত জল।

মেয়েটি বললে—তোমার নাম কি?

—আমার নাম? আমার নাম 'পঞ্খে'। পঞ্খী আর কি।

—পঞ্খী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলেবেলায় পাখীর মতন চিঁ চিঁ করে চেঁচাতাম কিনা। কানা বলে মা হেনস্থা করত। ভুঁয়ে পড়ে চেঁচাতাম।

—মা-বাবা আছে তোমার?

—হ্যাঁ। যাই আমি বাড়ি মাঝে মাঝে। বাবা আমার নোক ভালো। বাবার নাম—এখানে—। হঠাৎ কথায় ছেদ ফেলে দেয় নিজেই—উপরের দিকে মুখ তুলে বলে—হ হ। মরালের বড় ঝাঁকটা এসেছে লাগছে।

মেটে রঙের বুনো হাঁসের একটা প্রকাণ্ড ঝাঁক সত্যই মাথার উপর পাক দিচ্ছিল, তাদের পাখার ডাক ধরেছে আকাশে।

মেয়েটিও আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে।

পঞ্খী বললে, তার অর্ধসমাপ্ত কথা শেষ করলে সে।—বাবার নাম এখানে সবাই জানে। কৃত্তিবাস বাগ্দীর নাম।

বাবার নাম কৃত্তিবাস। অন্ধ অপরিণত অপুষ্টাঙ্গ ছেলের চীৎকার শুনেই তার নামকরণ করেছিল—পঞ্খী। ভালো মিষ্ট গৌরবজনক নাম রাখার প্রয়োজনই অনুভব করেনি কোনোদিন।

পঞ্চা বসলে। ঘাটের ধারে বসেছিল সে, মেয়েটি ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে তার কথা শুনছিল। পঞ্চী বললে, আমার এক দিদি আছে। দিদি আমাকে ভালবাসত, কোলে নিত। তা—এই আপনকার মতন বয়েস হবে তার।

—আমার মত ? ঈষৎ হেসে মেয়েটি বললে—আমার বয়েস কি করে বুঝলে তুমি ?

সলজ্জ হাসি হেসে মাথা চুলকে পঞ্চী বললে—তা আপনি আমার চেয়ে এই খানিক বড় হবেন। তার বেশী নন। একটু চুপ করে থেকে বললে—গলার রজ্ ( আওয়াজ ) শুনে বুঝতে পারি কিনা। খানিক-আধেক। আপনকার গলা এখনও বাঁশের বাঁশীর মত। খাদ মেশে নাই। তা ছাড়া—

পঞ্চী থেমে গেল। সে বলতে পারলে না কথাটা। পায়ের উপর মুখ রেখেছিল সে. কোমল মসৃণ স্পর্শ এখনও সে যেন অনুভব করছে।

কথাটা পাল্টে বললে—এখান থেকে বাড়ি আমার ক্রোশ চারেক হবে। বছর খানেক আগে মা একদিন খুব মেরেছিল। তা দিদি বললে —পঞ্চে, তুই তো গান গাইতে পারিস, তা ভালো বাজারে-জায়গায় যা না কেনে। গান গাইবি, ভিখ করবি। কথাটা মনে লাগল আমার। দিদিই একদিন আমার হাত ধরে এখানে রেখে গেল। সেই অবধি—। নিঃশব্দে হেসে সে চুপ করে গেল।

হঠাৎ এক সময় বলে উঠল—আপনকার গানের ওইটুকুন ভারি সোন্দর। সেই কি—কালো তোমার যখন বাজে বাঁশী—বলতে বলতে সে সুরেই গাইতে আরম্ভ করলে।—

'ঘর-কন্না সব ভুলে যাই ছুটে যে আসি।
আমার গা ঘষা হয় না, আমার কেশ বাঁধা হয় না।
আরও হয় না কত কি !'

মেয়েটি সাবান মাখছিল, বিস্ময়ে তার হাত থেকে সাবানখানা পড়ে গেল। অবিকল সুরে নির্ভুল গানখানি গাইছে পঞ্চী।

—আঃ, নাইতে আর লাগে কতক্ষণ ? ওদিকে যে ট্রেনের সময় হয়ে এল।

হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ডাকলে ঠিক এই সময়ে। ঘাট থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে ডাকতে এসেছে।

সত্যই স্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা বেজে উঠল।

ট্রেন চলে গেল। খ্যামটার দলটিও চলে গেল। দোকানী সিং ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের চা-সরবৎ, জলখাবার বিক্রি শেষ করে ডাকলে—পঞ্চে! পঞ্চে!

পঞ্চের সাড়া পাওয়া গেল না। গেল কোথায়?

দোকানী ওকে সত্যই ভালবাসে। দোকানীর স্ত্রীও ভালবাসে। যেদিন পঞ্চীর কোথাও অন্ন না জোটে সেদিন দোকানী ডেকে খেতে দেয়। দুটোর ট্রেন গেলেই দোকানী একবার পঞ্চীর খোঁজ করে। পঞ্চীর সাড়া পাওয়া গেল না। বোধ হয় গ্রামের মধ্যে গোবিন্দ-বাড়িতে গিয়েছে প্রসাদের জন্য, কিংবা গিয়েছে চণ্ডীতলায়। চণ্ডীতলায় পঞ্চপর্বে বলি হয়—পঞ্চে হিসাব রাখে—কবে অমাবস্যা, কবে চতুর্দশী, কবে অষ্টমী, কবে সংক্রান্তি—সেদিন সে চণ্ডীতলায় যাবেই। নিশ্চয় দু'জায়গার এক জায়গায় গিয়েছে সে। দোকানী আপনার দোকানের কাজে মন দিলে। দুটোর ট্রেনের পর আবার চারটেয় আসবে আর একখানা ট্রেন।

চারটের ট্রেন এল, চলে গেল। দোকানী এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল—পঞ্চে এখনও ফিরল না কেন? সে গেল কোথায়? ট্রেনে খ্যামটার দলের সঙ্গে চলে গেল না কি?

সত্যই তাই। পঞ্চী চুপি চুপি ট্রেনে চেপে পড়েছিল। বেঞ্চের তলায় ঢুকে শুয়েছিল। জংশন স্টেশনে নেমে কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাদের হারিয়ে ফেললে।

ব্রাঞ্চ লাইনের গার্ড ড্রাইভার সবাই পঞ্চীকে চেনে। তারা বললে—তুই এখানে?

আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে সে বললে—হ্যাঁ। এখানেই এলাম। বলি, একবার ঘুরে-ফিরে আসি।—একটু চুপ করে থেকে হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত করে বললে—নতুন জায়গা দেখতে শুনতে তো সাধ হয়।

হেসে দত্তবাবু গার্ড বললে—বেশ, দেখা তো হ'ল। এইবার চল।

ফিরে যেতে কিন্তু পঞ্চীর কেমন লজ্জা হ'ল। সে বললে—না। থাকব এইখানে দু'দিন দশদিন।

—থাকবি ?

—হ্যাঁ। এখানকার বাজারটা কি রকম দেখি একবার !

উত্তর শুনে হেসে দত্ত গার্ড চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই পঙ্খীর একটা কথা মনে হ'ল।—গাডবাবু! গাডবাবু!

গার্ডবাবুকে সে বলতে চাইছিল এখানকার স্টেশন-মাস্টার, জমাদার, স্টলওয়ালা, এদের কাছে তার জন্যে একটু বলে দেবার জন্য।

গার্ডবাবুর সাড়া পাওয়া গেল না। গার্ড তখন স্টেশনের ভিতরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পঙ্খী চলতে আরম্ভ করিলে। ঠিক এসে উঠল স্টলের সামনে।

—কি ভাজছেন দোকানীমশায় ? সিঙাড়া-কচুরী ?

দোকানী তার দিকে চেয়ে বললে—সরে বস।

সরেই একটু বসল পঙ্খী। তারপর সে তার ডুবকিতে আঙুলের ঘা দিয়ে আরম্ভ করলে—ও কালা !....

দত্ত গার্ডকে প্রয়োজন হ'ল না। নিজেকে নিজেই ছিনিয়ে নিলে পঙ্খী। দোকানী, স্টেশন-মাস্টার, জমাদার, জমির উপর পাতা লাইন, সিগন্যালের তার, বাজার, পথ, ঘাট, সব তার পরিচিত হয়ে গেল। কালীমায়ের স্থান, গৌরাঙ্গের আখড়ার পথও তার মুখস্থ। জংশনের সারি সারি রেললাইন প্রায় অনায়াসেই পার হয়ে যায় যে। প্রথমে এসে একটুখানি দাঁড়ায়, লোকের সাড়া পেলে জিজ্ঞাসা করে—কে বটেন গো ? লাইনে গাড়ি রয়েছে না কি ?

লোক না থাকলে—কান পেতে শোনে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যায় কি না। তারপর এগিয়ে এসে লাইনের উপর পা দেয়। স্পর্শ করে বুঝে নেয় চলন্ত ট্রেনের গতিবেগ তার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে কিনা। পঙ্খী বলে—ভয় লাগলে শিরদাঁড়া যেমন শির-শির করে, তেমনি শির-শিরিনি বয় লাইনে। সন্দেহ হলে লাইন ছেড়ে সে ওভারব্রিজের দিকে যায়, এক পাশের রেলিং ধরে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায় সে। সিঁড়ির সংখ্যা তার মুখস্থ।

ডুবকির সঙ্গে এখন একটা হাঁড়ি সুদ্ধ রেখেছে। আঙুল দিয়ে বাজিয়ে অনেক পরীক্ষা করে কিনেছে। হাঁড়ি বাজিয়ে গান করলে লোক জমে বেশী।

মধ্যে মধ্যে স্টেশন-ঘরের দরজায় গিয়ে বসে। বসবার সময়টি তার দুপুর বেলায়, একটা থেকে আড়াইটার মধ্যে। এ সময়টায় মাস্টার-

বাবুরা বসে গল্প-গুজব করে। সে শোনে। গল্পের মধ্যে ছেদ পড়লেই বলে—মাস্টারবাবু!

—কি রে ব্যাটা? এসেছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা কি বলছ?

—আজ্ঞে!—মাথা চুলকায় পঞ্চী।

—কি জিজ্ঞাস্য? বর্ধমান কত দূর? কত ভাড়া?

—আজ্ঞে না, বলছিলাম বলি—। হাসির ভঙ্গিতে দন্তুর পঞ্চী আরও একটু দন্ত বিস্তার করে বাবুদের কাছ থেকে উৎসাহ-বাক্য প্রত্যাশা করে, পায়ও সে উৎসাহ বাক্য।

—কি বলছিলে? বর্ধমান শহরটা কেমন? কত বড়?

—হ্যাঁ। আরও একটু বেশী দন্ত বিস্তার করে সবিনয়ে।

—বর্ধমান যাবি? দেব একদিন চড়িয়ে গাড়িতে?

পঞ্চী চুপ করে থাকে। সম্মতি জানাতে শঙ্কিত হয়। গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন, গলি-ঘুঁজি, প্রকাণ্ড বড় শহর—তার মধ্যে কোথায় –? টেলিগ্রাফের যন্ত্রটা শব্দ করে ওঠে, ওদিকে টেলিগ্রাফের ঘণ্টা বাজে ঠিন—ঠিন। বাবুরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পঞ্চী উঠে আসে। ভাবতে ভাবতে প্ল্যাটফর্মের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। কাছেই টেলিগ্রাফের পোস্টে বাতাসের প্রবাহে শব্দ ওঠে, গায়ে-লাগানো মাইল-লেখা লোহার প্লেটটা অত্যন্ত দ্রুত শব্দ করে কাঁপে। পঞ্চী ধীরে ধীরে টেলিগ্রাফ-পোস্টে কান লাগিয়ে দাঁড়ায়। পোস্টের গায়ে আঙুল বাজিয়ে বলে—টরে-টক্কা, টরে-টক্কা, টক্কা-টক্কা টরে।—তারপর বলে—হ্যালো! হ্যালো ঠাকরুন, বর্ধমানের ঠাকরুন। আমি পঞ্চী। গান গাইছি আমি।—ও তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি!

দিন যায়। এক বৎসর হয়ে গেল। পঞ্চী জংশনেই রয়েছে। টাকা পয়সা কিন্তু জমেছে তার। দোকানীর কাছে রাখে তার কিছু অংশ। দোকানী জানে ঐ তার সব। কিন্তু পঞ্চী তার উপার্জনকে ভাগ করে। কিছু নিজের কাছে রাখে। বাকীটা রাখে কাঠে-ঘেরা ছোট্ট চোর-কুঠরীর মত জেনানা ওয়েটিং-রুমের এক কোণে মাটিতে পুঁতে। জংশন হলেও ব্রাঞ্চ লাইনের প্লাটফর্মটা পাকা নয়। জেনানা ওয়েটিং-রুমটার মেঝেও কাঁকরমাটির মেঝে। তার উপর রাখে তার বিছানাটা। বিছানা

একখানা বস্তা। রাত্রে ওইখানে বস্তা বিছিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে।

বর্ধমানের বাতিকটা কমে গিয়েছে। কালা তোর তরে—গানখানা সে গায়, লোকে তারিফ করে, পঞ্চী সবিনয়ে হাসে, কিন্তু আর সেই চৈত্র-দুপুরে গেঁয়ো স্টেশন-প্লাটফর্মে নরম দু'খানি পায়ের উপর মুখ রেখে প্রণাম করার কথা মনে পড়ে না। সেই মিষ্টি প্রাণমাতানো গন্ধের কথাও মনে পড়ে না। মনে পড়ে না ঠিক নয়, মনে পড়ে কিন্তু বুকের ভেতরটা তেমন 'আকুলি' করে ওঠে না।

কত দিন পর। অনেক দিন।

হঠাৎ সেদিন সমস্ত শরীরে তার শির শির করে কি বয়ে গেল! লাইনের উপর ট্রেন গেলে যেমন শব্দ-স্পর্শে শিহরণ জাগে। সেই গান! সেই গলা! আজ আর গান শুধু নয়, গানের সঙ্গে যন্ত্র বাজছে। স্টেশনের ঘরের সামনে ঠাকরুন গান করছে। কালা তোর তরে—!

পঞ্চী প্রায় ছুটে দাঁড়াল। বেশ বুঝতে পারলে ঠাকরুনের সঙ্গে অনেক লোক রয়েছে। ছোট ছেলেও রয়েছে।

গান শেষ হতেই সে হাত জোড় করে বললে—ঠাকরুন!

—কে রে তুই?

—আজ্ঞে যে ঠাকরুন গান গাইলেন তাকেই বলছি আমি।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। একজন বলেন—মরণ!

আবার গান আরম্ভ হ'ল। 'চোখে ছটা লাগিল'—পঞ্চীর বুক একেবারে দুলে উঠল। তার সেই গান। নিতাই কবিয়ালের কাছে সে শিখেছিল, ঠাকরুন শিখেছিল তার কাছে।

গান শেষ হ'ল।

—আমাকে চিনতে পারলেন না ঠাকরুন? আমি পঞ্চ—।

—এই ব্যাটা, এই ভাগ!

ভাগিয়ে দিলেও সে এবার সঙ্গ ছাড়বে না। সে সজাগ হয়ে বসে থাকে। ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল। যাত্রীর দলটির আসর গুটিয়ে নিলে। একজন বললে—গ্রামোফোনটা ভালো করে বন্ধ কর্‌রিস! রেকর্ডগুলো বাক্সের মধ্যে পুরে নে।

গাড়ি এল, চলে গেল। স্টেশন-স্টাফ, স্টলওয়ালা বিস্মিত হ'ল—পঞ্চী নাই।

আরও অনেক কাল পর। অনেকগুলি বৎসর চলে গিয়েছে। পঞ্চীর চুলে সাদা ছোপ পড়েছে। দন্তুর মুখের দাঁত পড়েছে কয়েকটা। কানে শোনার শক্তি কমে এসেছে! লাইনে পা দিয়ে দূরে ট্রেন আসছে কি না আর ধরতে পারে না।

পঞ্চী এক তীর্থক্ষেত্রে পথের ধারে বসে ভিক্ষা করে। গানও আর তেমন গায় না। বলে—অন্ধজনে দয়া কর বাবা। অন্ধকে একটি পয়সা দাও মা! মা-লক্ষ্মী জননী!

মা-জননীরা যখন যায় তখন পঞ্চী বেশী আকুলতা প্রকাশ করে। জুতোর শব্দ থাকে না—অথচ খস-খস শব্দ ওঠে গরদের কাপড়ের, পূজার ফুলের গন্ধ ওঠে, পঞ্চী বুঝতে পারে মা-লক্ষ্মীরা আসছেন।

যেদিন ভিক্ষে কম হয়, সেদিন গান করে।

সেদিন সে গান গাইছিল। 'চোখে ছটা লাগিল'—গাইতে আজকাল ভালো লাগে না। ভক্তিরসের গানই বেশী গায়। 'কালা তোর তরে' গানখানা মাঝে মাঝে গায়। সেইদিন গাইছিল সে ওই গানখানাই।

গান শেষ হতেই একজন হেসে বললে—খুব গেয়েছিলে গানখানা রেকর্ডে। ঘাটে মাঠে হাটে ছড়িয়ে গেল।

নারী-কণ্ঠের অতি মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলে পঞ্চী। মেয়েটি বললে—গাইলাম, কিন্তু কালা শুনলে কই?

—ওই তোমার এক ঢং! আর তীর্থে কাজ নেই। চল, ফিরে চল।

—নাঃ, বয়স অনেক হ'ল। অন্ধকার হয়ে আসছে দুনিয়া। আর—

অসহিষ্ণু পঞ্চী বলে উঠল—কিছু দয়া হবে মা? অন্ধ—

তার হাতে এসে পড়ল কি একটা।

পুরুষটি বললে—আধুলি; পয়সা নয় রে বেটা।

—আধুলি?

—হ্যাঁ।

আধুলি! মেকী নয় তো? হাত বুলিয়ে—মাটিতে ফেলে শব্দ পরখ করে নিলে পঞ্চী। তারপর পরম কৃতজ্ঞতাভরে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির পায়ে হাত বুলিয়ে প্রণাম করলে।

তারা চলে গেল। পায়ের শব্দ উঠল।

পাখীরা ডাকছে। দিন বোধ হয় শেষ হ'ল। পঞ্চীও উঠল।

ডাক্তারখানার সামনে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। শব্দ করে ধোঁয়া ছেড়ে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

ডাক্তার প্রেসক্রপশন লিখতে লিখতে মুখ তুললেন। ওই ইঞ্জিন বন্ধ করার শব্দেই ডাক্তার বুঝলেন ডাক্তারখানাতেই কেউ এল মোটরে করে। যুদ্ধের বাজারে পেট্রল র‍্যাশন এবং মোটরের দুষ্প্রাপ্যতায় মোটর এসে থামলে ঔৎসুক্য একটু হয় বৈকি। বিশেষজ্ঞ বড় বড় ডাক্তার যাঁরা—বত্রিশ-চৌষট্টি-একশ যাঁদের ফি—তাঁদের দরজার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মাঝারি খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তার, আট টাকা যাঁর বাড়িতে ফিস, এ বাজারে যাঁরা মোটরে চড়ে আসেন, তাঁর দরজায় না এসে তাঁকে তো তাঁরা বাড়িতে ডাকতে পারেন। আরও একটু বিস্মিত হলেন ডাক্তার, একা একটি মেয়ে নামছে। ডাক্তার পর মুহূর্তেই আবার চোখ নামিয়ে প্রেসক্রপশন লিখতে আরম্ভ করলেন। ডাক্তারের কাছে লোকের যাওয়া-আসার ভঙ্গিটা বিচিত্র। এবং রোগ, বিশেষতঃ রোগীর বিষয়ে ডাক্তারদের মন প্রায় নির্বাণের কোঠাবাড়ির সিঁড়ির মাথায় এসে পৌঁছেছে। বিস্ময়ও নাই, ঔৎসুক্যও নাই। রোগী আসে, ডাক্তার দেখেন টেম্পারেচার, হার্ট, লাংস, জিভ, পেট ; কয়েকটা প্রশ্ন করেন, প্রেসক্রপসন লেখেন, কি খাবে বলে দেন। তারপর আর একজনকে বলেন, আপনার কি ?

আড়ষ্ট মুখে বোল টেনে লোকটি বলে, অসহ্য বেদনা।

—বেদনা তো বটে। কোথায় ?

লোকটি মুখ উঁচু করে সামনের একটি মাত্র দাঁতের কাছে আঙুল নিয়ে গিয়ে বলে—ডাঁ-ট।

গোটা 'ত' বর্গটাই উচ্চারণ করতে গেলে দাঁতের সঙ্গে জিভের স্পর্শ প্রয়োজন। তাই জিভকে তালু পর্যন্ত এনে সন্তর্পণে 'দ'কে ড এবং 'ত'কে ট বলে কাজ সারেন। ডাক্তার বলেন, ডেন্টিস্টের কাছে যান।—তারপর বলেন, নাড়ুন তো আঙুলে করে, দেখি।

আঙুল দিয়ে দাঁত নাড়াতে নাড়াতে ভদ্রলোক 'হুঁ হুঁ' করে ওঠেন।

ডাক্তার বলেন—প্রফুল্ল, দাঁত-তোলা যন্ত্রটা দাও তো।

শিউরে ওঠেন ভদ্রলোক—না-না।

—তবে এলেন কেন আমার কাছে ?

—একটু কোকেন।

—দিচ্ছি। হাঁ করুন। আর একটু—হ্যাঁ—। এমন করে হাত দেবেন না। হাত সরান। ব্যাস, হয়ে গেছে। জল দিয়ে কুল্লি করুন। দাঁতটা ফেলে দিন। ধরুন।—এই, তুমরা কেয়া? অঁা?

—পেটমে বহুত দরদ। পা'খানা যাচ্ছে বাবু। জ্বরভি হইয়েছে—

—হুঁ। দেখি। উতারো, গায়ের কাপড়া উতারো। পেট টিপে দেখেন, হাত দেখেন।—পা'খানার সময় পেট কামড়ায়? আম আছে?

—হাঁ বাবু।

—রক্ত আছে?

—হাঁ বাবু। তাজা রক্ত নিকলাচ্ছে

—কতবার পা'খানা গিয়েছ?

—দশ-বারো দফে।—একটু ভেবে আবার বলে—বেশি হোবে বাবু।

—হুঁ।—ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লেখেন—খুব সাবধানে থাকবে। খারাপ বেমার। ব্যাসিলারী ডিসেনট্রি। শক্ত জিনিস কিছু মৎ খাও। ছানার জল, বার্লি, ডাবের জল এই খাবে।—আপনার?

ভদ্রলোক বলেন, সেই যে পরশু আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছিলাম। কমলা।

—কোন্ মেয়েটি বলুন তো?

—আমার মেয়ে।

—হ্যাঁ। কোন্ মেয়েটি? বয়স কত? অসুখ কি?

—কমলা বলে মেয়েটি। পনরো-ষোলো বছর বয়স। বুকে বেদনা জ্বর।

—ওঃ। হুগলী থেকে অসুখ নিয়ে এসেছে?

—হ্যাঁ।

—কি খবর? কেমন আছে?

—কমেনি কিছু। জ্বরটা একটু বেশী হয়েছিল বরং।

—হুঁ। কই, এনেছেন?

—না। বলেন তো ওবেলা আনব।

—আনবেন। প্লুরিসি হয়েছে আপনার মেয়ের। ভালো চিকিৎসার দরকার। ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দিতে হবে। না হলে ভবিষ্যতে খারাপ হতে পারে।

—খারাপ হতে পারে?

—হ্যাঁ। টি-বি-তে দাঁড়াতে পারে।

ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ডাক্তার আর একজনকে বলেন—আপনার?

—আমার বাড়িতে একবার যেতে হবে।

—বারোটার পর। ঠিকানা রেখে যান কম্পাউণ্ডারের কাছে।—এই, তোর কি রে? এ্যাঁ? তোর তো সেই সাতখানা রোগ। ওষুধ খাচ্ছিস? কই দেখি, আয়।

এ পাড়ারই একজন দরিদ্র রুগ্ণ ব্যক্তি।

—আর মদ খাচ্ছিস?

—আজ্ঞে না।

ডাক্তার চোখের পাতা টেনে দেখলেন। লিভার টিপলেন—লাগে? বেশ কাতর মুখভঙ্গি করেও লোকটি বললে—আজ্ঞে, আগের চেয়ে কম।

—হুঁ! ওষুধ নিয়ে যা। মদ খেলে বাঁচবি না তুই।

প্রেসক্রুপশন লিখতে বসলেন ডাক্তার। ঠিক এই সময়ে ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল। ডাক্তার একবার চোখ তুলে দেখলেন। একটি মেয়ে নামল—একা। বিস্ময়ে মুহূর্তের জন্য ডাক্তারের ললাটে প্রশ্নের কটি রেখা জেগে উঠল। তারপরই তিনি আবার প্রেসক্রুপশনে মন দিলেন।

মেয়েটি এসে পরিচিতের মত সপ্রতিভভাবে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা ঘরটির মধ্যে ঢুকে বসল। অল্পবয়সী লম্বা গড়নের মেয়েটির আবির্ভাবে রোগীর দলও একটু উৎসুক, এমন কি খানিকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল যেন। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ির রঙের প্রতিচ্ছটার আভায় তাদের চোখে যেন প্রসন্নতা এনে দিলে খানিকটা।

ডাক্তার আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার?

সে বললে—ভদ্রমহিলাটিকে দেখে নিন আগে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ডাক্তার বললেন—সেই ভালো।

চেম্বারে ঢুকে ডাক্তার বললেন—আপনার কি?

মেয়েটি হাসলে। ডাক্তার বিস্মিত হলেন। মেয়েটির হাসির জন্যে য়। মুখখানা অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটির সুন্দর

মুখে দুই গালে ঠিক এক জায়গায় দুটি প্রায় সমান আকারের তিল। অত্যন্ত চেনা।

মেয়েটি বললে—রোগী দেখা শেষ করুন। আমার খানিকটা সময় লাগবে।

ডাক্তার সবিস্ময়ে মেয়েটির দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মেয়েটি বললে—চিনতে পারছেন আমাকে?

—ঠিক মনে হচ্ছে না। আপনি—

—আমি আপনি নয়। আমি তুমি। যান রোগীদের বিদায় করুন।

ডাক্তার অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এলেন।....কে? কে? কে?

—আমার হাতটা দেখুন ডাক্তারবাবু।

চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ডাক্তার তার দিকে চাইলেন—কি তোমার? হাতখানা ধরলেন।....কে? উঁহু। তা কি হয়!

মেয়েটি হেসে বললে—চিনতে পারলেন না আমাকে?

—আপনি—তুমি কে বলতো?

—দেখেই চিনতে পারলেন না, তখন নাম বললে মনে পড়বে?

—মনে হচ্ছে একজনের কথা। কিন্তু সে কেমন করে হবে? সে তো—

মেয়েটি উঠে ডাক্তারকে প্রণাম করে বললে—বুঝতে পারছি আপনি চিনতে পেরেছেন। আমি সেই।

—নির্মলা? তুমি—?

তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে নির্মলা হেসে বললে—তুমি বাঁচলে কি করে? সশব্দে সে হেসে উঠল; তারপর বললে—আমি বেঁচেছি, নিউমোথোরাক্স করে বেঁচে উঠেছি। যাদবপুরে চোদ্দো মাস বিছানায় পড়েছিলাম। উঠতে দেয়নি। বাঁচার সে এক যন্ত্রণা।—সে আবার হেসে উঠল।

ডাক্তারের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল।—বাঃ। ভারি আনন্দ হল তোমাকে দেখে। চমৎকার চেহারা হয়েছে তোমার। আর কোনো কমপ্লেন নেই তোমার?

—আপনি দেখুন।

ডাক্তার সযত্নে পরীক্ষা করে দেখলেন।—নাঃ কিছু না। তবু একটা এক্সরে ফটো নিয়ো।

আঁচলের ভিতর থেকে বড় একখানা খাম বার করে মেয়েটি দিলে —নিয়েছি, দেখুন। মাথার ঘোমটা ঈষৎ বাড়িয়ে দিয়ে সে হাসতে লাগল।

ফটোখানা দেখতে দেখতে ডাক্তার বললেন—যাদবপুরেই বেড পেয়েছিলেন তাহলে?

—হ্যাঁ, পেয়েছিলাম।—একটু হেসে সে আবার বললে, ফ্রি বেড নয়, পেয়িং বেড।

—পেয়িং বেড!—ডাক্তার বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।—সে তো—

আবার সে ডাক্তারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—সে তো অনেক খরচ!—আবার হাসলে মেয়েটি। আবার বললে—ট্যাক্সি করে এসেছি দেখছেন না? আমার বেশভূষা—গয়না দেখে বুঝতে পারছেন না আমার সে-দিন আর নেই!

ডাক্তার একটু অপ্রতিভের মত বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভারি আনন্দ হল, ভারি খুশী হয়েছি আমি। কিন্তু ডাক্তার একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন—রমেন তো এখন সেই ফ্যাক্টরীতে চাকরি করছে, তাকে দেখে তো মনে হয় না টাকাকড়ি করেছে যথেষ্ট।

মেয়েটি বললে, ডাক্তারবাবু, লোকে বলে—স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য দেবতাতেও বুঝতে পারে না। আমি তো স্ত্রীলোকের চরিত্রে দুর্বোধ্য কিছু দেখি না। স্ত্রীলোকের ভাগ্য বুঝাই কঠিন। পুরুষেরা কাজ করে তার ফল পায়, আমরা ভাগ্যফলেই পুরুষের হাতে পড়ি। বুঝা কঠিন পুরুষের চরিত্র।

ডাক্তার চুপ করে রইলেন একটু। তারপর বললেন—ভারি খুশী হয়েছি তোমাকে দেখে। আচ্ছা, তাহলে আজ এস। আমার আবার বাইরে কল্ রয়েছে কতকগুলো।

মেয়েটি বললে—বেশ লোক আপনি। আমার রোগের চিকিৎসার কথা কিছু হল না, আর বলছেন তুমি এস!

—আবার কি রোগ তোমার?

মেয়েটি একখানা কাগজ বার করে ডাক্তারের হাতে দিলে। একটি ক্লিনিকের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট। রোগিণী নির্মলা দেবী। রক্তে উপদংশ বিষ রয়েছে। পরিমাণ—আট-দশ।

নির্মলা বললে—আমি এখন—।—একটু থামলে। তারপর মৃদু হেসে অকম্পিত স্বরে বললে—আমি এখন—।—একটু থেমে বললে—এখন আমি বেশ্যা, ডাক্তারবাবু।

অতর্কিতে অল্প-একটু ধাক্কা খাওয়ার মত একটা অনুভূতি অনুভব না করে ডাক্তার পারলেন না। নির্মলা আপনার বাঁ হাতখানি প্রসারিত করে নিজের চোখের সামনে ধরলে, ডান হাত দিয়ে এ হাতের কনুইয়ের ভিতর দিকে সুগোর-সুডোল হাতের নীল শিরার উপর হাত বুলিয়ে বললে—ইনজেকশন নিয়ে নিয়ে শিরাগুলো সব বসে গেছে।

ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে থাকেন বাঁ হাতে। অবহেলা করে বা অবলীলাক্রমে দিচ্ছেন এটা প্রমাণ করার জন্য নয়, ওটাই তাঁর অভ্যাস। তবে লোকে মনে করে তাই। ইনজেকশনে এমন নিপুণ হাত খুব কম দেখা যায়। প্রায় চোখের পলকে বললে অত্যুক্তি হয় সামান্যই। ডাক্তার সিরিঞ্জের নিড্‌ল বার করে নিলেন। এক টুকরো বেনজুইন ভিজানো তুলা বসিয়ে দিলেন। হেসে বললেন—ব্যাস একটু বসে থাক।

ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।

ভিতর থেকে নির্মলা ডাকলে—ডাক্তারবাবু!

—কি? অসুস্থ বোধ করছ?

—না।

—তবে?—ডাক্তার ভিতরে এলেন।

—আপনার ফি। মেয়েটি দুখানি নোট তুলে দিলে।

—একখানি নোট ফেরত দিয়ে ডাক্তার হেসে বললেন—এতেই হবে। এইবার উঠতে পার তুমি। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তোমার।

—থাক।—মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।—একটা কথা।

—বল।

—একটু ড্রিঙ্ক করতে পাব?

—ড্রিঙ্ক? ডাক্তার অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন নির্মলার দিকে মুহূর্তের জন্য। পর মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করলেন তিনি, বললেন, —না।

—আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে। তাছাড়া—সে হেসে বললে—পুরুষ-চরিত্র রহস্যময়—উনি আবার ড্রিঙ্ক না করলে খুশী হন না।

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললেন—না। ও এখন বন্ধ রাখতে হবে।

একটি নমস্কার করে নির্মলা বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন নিজের অজ্ঞাতসারেই।

নির্মলা অসঙ্কোচে বললে—আমি—।—আমি এখন—। অবলীলাক্রমে বললে—ড্রিঙ্ক করা আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে। অসঙ্কোচে—অবলীলাক্রমে। পরক্ষণেই সব ঝেড়ে ফেলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। 'কল্' আছে। টি-বি পেশেন্ট প্রভাকে ক্যালসিয়াম দিতে হবে। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার পেশেন্টটাকে কুইনিন। তিনটে টাইফায়েড কেস। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

মানুষ বিচিত্র। ডাক্তার ভাবছিলেন সেই কথা সন্ধ্যার সময়।

সন্ধ্যাতেও ডাক্তারখানায় রোগী আসে, কিন্তু সংখ্যায় কম; দু-চারজন। ডাক্তার সন্ধ্যাতে কোট-পেন্টলুন পরেন না। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে চেয়ারে বসে থাকেন; দু-একটা সিগারেট খান, কখন শখ হলে গড়গড়ায় তামাকও খান। রোগীদের বিদায় করে বই পড়েন। মনোবিজ্ঞানে ডাক্তারের বেশী ঝোঁক। সাইকোলজীর বই বেশী পড়েন। চিকিৎসাতেও সাহায্য হয়। এক বন্ধুর স্ত্রী সম্প্রতি মধ্যে মধ্যে দুরন্ত বেদনা অনুভব করছেন বুকে, বেদনা উঠলেই ডাক্তার তাকে এ্যাকোয়া অর্থাৎ শুধু জল ইনজেকশন দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমহিলা সুস্থ হয়ে উঠে বসেন। এক বিন্দু বেদনা থাকে না। ডাক্তারের ধারণা রোগে যারা ক্রমাগত ভোগে তাদের শতকরা যাট জনেরও বেশী সংখ্যক লোকের ব্যাধিই মনের ব্যাধি। একটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে এইমাত্র বিদায় হ'ল; ছেলেটি প্রায় রোজ সন্ধ্যায় আসে, গল্প করে চলে যায়। সপ্তাহে একবারও অন্ততঃ হৃদ্‌যন্ত্রটি পরীক্ষা করায়; ওর ধারণা, ওর হার্টের দুর্বলতা আছে, যে কোনো মুহূর্তে তা থেকে কঠিন বিপদ হতে পারে; সেইজন্য ভদ্রলোক বিবাহ পর্যন্ত করলেন না। এবং বুঝিয়েও ডাক্তার ওকে বিশ্বাস করাতে পারলেন না। ডাক্তারের কাছে গল্প করতে আসাটা ওর গল্পের আকর্ষণ নয়, আসল ব্যাপার হ'ল ডাক্তারের সান্নিধ্য লাভ করে খানিকটা আশ্বাস লাভ করা। এসেই যেন তার ডাক্তার দেখানো হয়ে যায়। লোকটি চলে যেতেই ডাক্তার হাতের

বইখানা খুলে বসলেন। শক্তিশালী লেখকের লেখা ভালো বই। সমারসেট মমের ভক্ত তিনি, মমের বই 'রেজারস এজ'।....কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে রাস্তার দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইলেন। রাস্তায় লোকজন অবিরাম চলেছে—জনস্রোত। এই দিকেই গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার পথ। লোকে ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে আসছে ঘাট থেকে। পুণ্যলোভী মেয়েরা অনেকে এই রাত্রেও গঙ্গাস্নান করে আসছে। বোধ হয় কোনো পার্বণ আছে আজ। সেজেগুজে অনেক মেয়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়েও ফিরছে। দু-চারটি চতুরা দেহ-ব্যবসায়িনীও সঞ্চরমাণ শিখার মত অনুসারী পতঙ্গ পিছনে নিয়ে আসছে, সামনেই একটা গলি, সেই গলিতে ঢুকে যাচ্ছে। ঢুকবার সময় এদের একটা বিশেষ ভঙ্গিতে পিছনে ফিরে চাওয়ার অভ্যাস আছে। যেন ঝাপটা মেরে চকিতে ফিরে পিছনের দিকে চেয়ে দেখে নেয়। বোধ হয় অনুসরণকারীকেও দেখে নেয় এবং অভয় দিয়ে আহ্বানও জানায়।

মনে পড়ে গেল নির্মলাকে। তার কথাগুলো কানের কাছে বেজে উঠল যেন।—আমি এখন—আমি এখন বেশ্যা, ডাক্তারবাবু।

সেই মেয়ে। সুদীর্ঘ আট মাস ধরে তিনি তার চিকিৎসা করেছিলেন, একদিন মাত্র কথা বলেছিল। একদিন মাত্র।

এক একটা কেস ডাক্তারদের অদ্ভুতভাবে মনে থাকে।

বিচিত্র ধরনের রোগ, বিচিত্র ধরনের রোগী—বিচিত্র ধরনের রোগীর বাড়ি—এগুলো মনে রেখাপাত করাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে তার কোনোটাই এমন কিছু বিচিত্র ছিল না। শুধু রোগিণী—ওই নির্মলা মেয়েটির মধ্যে ছিল শান্ত ভাবের এবং সহনশীলতার মাত্রাতিরিক্ততার—কি বলব? বৈচিত্র্য, হ্যাঁ—বৈচিত্র্য বলাই ভালো। ডাক্তার মধ্যে মধ্যে বিস্মিত হতেন, মনে মনে প্রশংসা করতেন।

বৎসর তিনেক হবে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থা সেটা, ১৯৪১ সাল। মনে আছে ডাক্তারের, তিন বৎসর আগে সকালে এল একজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক। সুদর্শন চেহারার একটি তরুণ, পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের বেশী বয়স হবে না। রোগীর ভিড় রয়েছে। সে টেবিলের ওপাশটা ধরে দাঁড়িয়ে বললে—ডাক্তারবাবু, আপনাকে একবার আমাদের বাড়ি আসতে হবে।

ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকালেন—ভদ্রলোকের মুখে-চোখে উদ্বেগের আকুলতা দেখতে পেলেন।

ডাক্তার কিছু বলবার আগেই সে আবার বললে, এখনি আসতে হবে একবার দয়া করে। খুব আরজেন্ট।

—কি কেস? আরজেন্ট বলছেন? কেসটা কি?

—একটি মেয়ের অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মেয়েটি প্রেগনেণ্ট। ফার্স্ট প্রেগনেন্সি।

—প্রেগনেণ্ট! যন্ত্রণা কোথায় হচ্ছে?

—পেটে।

—আমি জিজ্ঞাসা করছি—যন্ত্রণাটা কি ডেলিভারি—

—না—না—ডাক্তারবাবু। সে সময় নয় এখন, তা ছাড়া সে যন্ত্রণাও নয়।

—তাহলে একটু বসুন। এঁদের কয়েকজনকে দেখে যাব।

জোড়হাত করে সে বললে—না। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। একবার এখুনি আসতে হবে আপনাকে।—চোখ তার ছল ছল করে উঠল।

ডাক্তার আর না বলতে পারলেন না। উঠলেন। সে-ই নিজে নিলে কল্-বাক্সটা।

বস্তির মধ্যে দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের বস্তি। ডাক্তার হাসলেন। বাসিন্দারাই ভদ্র এবং গৃহস্থ। বস্তি কিন্তু বস্তি। খোলার চাল, ছিটেবেড়ার দেওয়াল, সরু স্যাঁতসেঁতে গলি-পথ, মাছি-মশা-দুর্গন্ধ সবই আছে। একখানি ঘর আর সামনে একটু করে বারান্দা নিয়ে এক-একটি সংসার, ময়লা হাফ-প্যাণ্ট-পরা অপরিচ্ছন্ন ছেলের দল, কেউ কাশছে, কেউ কাঁদছে, কেউ মুড়ি খাচ্ছে, সঙ্কীর্ণ লম্বা মেটে উঠানে কাক এসে নেমেছে, একজন শৌখিন ব্যক্তির একটা লোমওয়ালা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে কাকগুলোকে দেখে; উঠানের একপাশে ঘেরা-দেওয়া একটা স্নান করবার এবং বাসন মাজবার জায়গা, তার মধ্যে সনাতন পাতকুয়া—কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগের ইনকিউবেটার; এসে জমে ওইখানে—মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ে। ওরা ভোগে, মরে। তবু অদ্ভুত এদের জীবনের সহ্যশক্তি। বৈজ্ঞানিক মতে ওদের মরে যাওয়া উচিত—তবু ওরা বেঁচে আছে ওই সহ্যশক্তির জোরে।

তবু বস্তিটা ওরই মধ্যে ভালো। বারান্দা মেঝে সিমেণ্ট করা, সিমেণ্টের সঙ্গে লাল রঙ মিশিয়ে বস্তি বাসিন্দাদের যাদের কিছুটা

গোপন শৌখিন রুচি আছে—তাদের সেই রুচিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা আছে বস্তির মালিকের। পলকা-হালকা কাঠের সেই সনাতন দরজা, তবু তাতে সবুজ রঙ ধরানো হয়েছিল প্রথমে। জানালাগুলিও আকারে একটু বড়। দেড় ফুট লম্বা মাপে। কতকগুলোয় শিক, কতকগুলোয় কাঠ দেওয়া, কেউ কেউ জানালায় পর্দা দিয়েছে। এর দরজাতেও একটা পর্দা ঝুলছিল। আরও দুটি অল্পবয়সী ভদ্রলোক বসেছিল।

ভিতরে একখানা তক্তপোষের উপর শুয়েছিল মেয়েটি। সাদা সায়া-ব্লাউজের উপরে একখানি পরিচ্ছন্ন ধুতি ছিল পরনে, হাতে ছিল দু'গাছি রুলি, দেখলেই বুঝতে পারা যায় মেয়েটি বিধবা। মুখ ঘোমটায় ঢাকাই ছিল—তবু সে আরও একটু টেনে দিলে ঘোমটা। তারপর স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। সে-স্তব্ধতা, সে শান্ত সহনশীলতা ডাক্তারের ভারি ভালো লেগেছিল। ধপধপে বিছানায় পরিচ্ছন্ন শুভ্র পরিচ্ছদ আবৃত মেয়েটির যন্ত্রণার মধ্যেও সেই শান্ত সম্বৃত স্তব্ধ অবস্থার কথা আজ স্মরণ করে ডাক্তারের মনে হ'ল সে অবস্থার সঙ্গে রাত্রের নীরব রূপের অনেকটা মিল আছে—তুলনা চলে বোধ হয়। ডাক্তার অনেকদিন রাত্রে এগারোটা-বারোটার সময় গঙ্গার ধারে বেড়ান। নদীর যে নিজস্ব তরঙ্গক্ষুব্ধ গতিশীল রূপ, দিন-রাত্রির মধ্যে তার সত্যকার কোনো অবস্থান্তর কি রূপান্তর ঘটে না; কিন্তু মানুষের চোখে রাত্রির অস্পষ্টতার মধ্যে তার রূপের পরিবর্তন ঘটে, তখন নদীর তরঙ্গক্ষুব্ধ গতি চোখে দেখা যায় না। মনে হয় শান্ত শুভ্র সুদীর্ঘ জলধারা নিথর হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে! মধ্যে মধ্যে মৃদু আলোড়নে আবর্ত উঠে এখানে ওখানে সেখানে এক-একটা। মেয়েটির অঙ্গ সেদিন মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণার আধিক্যে এক-একবার অবাধ্য আক্ষেপে জেগে উঠছিল। কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছিল মেয়েটি। আবার নিজেকে সংযত করে শান্ত স্থির হয়ে শুচ্ছিল।

—কি যন্ত্রণা হচ্ছে আপনার? কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?

মেয়েটি শান্ত হাতখানি রাখলে লিভারের কাছটায়। ডাক্তার দেখলেন। জ্বর একটু হয়েছে। ডাক্তারের মনে হ'ল, পাকস্থলী এবং মলস্থলীর মধ্যে গণ্ডগোল কিছু হয়েছে। প্রশ্ন করলেন—কোষ্ঠ পরিষ্কারের কথা।

মেয়েটি ঘাড় নাড়লে। 'না' বললে এটা বুঝা গেল। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন—ক'দিন পরিষ্কার হয়নি?

ভদ্রলোকটি এবার মেয়েটির মুখের কাছে তার কান নিয়ে গেল। মেয়েটির ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়ল। ভদ্রলোকটি বললে—তিন-চারদিন চলছে।

ডাক্তার বললেন—এ অবস্থায় পারগেটিভ তো চলবে না। ডুস দিতে হবে। ডুস দিন, কমে যাবে বেদনা। আর একটা ওষুধও দেব।

চিন্তিত মুখে ছেলেটি বললে—ডুস দিতে তো জানি না ডাক্তারবাবু।

হেসে ডাক্তার বললেন—কঠিন কিছু নয়, আপনি ডুসটা নিয়ে আসবেন, আমি বুঝিয়ে দেব। আপনি লেখাপড়া জানেন। দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেই পারবেন।

—না ডাক্তারবাবু, এমনিই আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি। আমি—।

—সে আর কিছু বলতে পারলে না।

ডাক্তার বুঝলেন, ভদ্রলোক অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তিনি বললেন—তা হলে আমার কমপাউণ্ডারকে আনতে পারেন; সে দিয়ে দেবে। সে এক্সপার্ট লোক। একটা টাকা দিয়ে দেবেন তাকে।

একটু চুপ করে থেকে সে বললে—মেয়েছেলে, কমপাউণ্ডারবাবু পুরুষমানুষ—।

অন্য যারা বসেছিল দাওয়ায় তাদের একজন এবার ভেতরে এসে বললে, একজন নার্স আনলেই তো হয়!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। কাছাকাছি নার্স কোথায় পাওয়া যাবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন—আসুন আমি চিঠি দিয়ে দেব একখানা। এই তো বড় রাস্তার চৌমাথাটার উপরেই একটা নার্সদের আড্ডা আছে। আজ ডাক্তার সে কথা মনে করে একটু হাসলেন। সেদিন কিন্তু হাসেন নাই। মন তাঁর খুশীতে ভরে উঠেছিল। রোগী দেখতে গিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর চোখে পড়ে রোগীর পরিবারের মনোভাব। কোথাও দেখা যায় রোগীর প্রতি ঘরের মানুষের নিদারুণ উদাসীনতা; অবহেলিত অবজ্ঞাত রোগী পড়ে থাকে, মাথার গোড়ায় এক গ্লাস জল কোথাও থাকে, কোথাও তাও থাকে না। কোথাও কোথাও এই নিষ্করুণ অবহেলা এমন নিষ্ঠুরভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছেন ডাক্তার যে, আজও তা মনে অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর; ভাবলেও শিউরে ওঠেন তিনি। চাকরদের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন প্রায়ই ঘটে। ডাক্তার

সেগুলো ধরেনই না। আত্মীয়-স্বজনেরা আপনার জনের বেলায় এই অবহেলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখায় বিধবা মেয়েদের রোগশয্যায়। আবার দেখা যায় রোগীর জন্য সমগ্র পরিবারের সে কী ব্যাকুলতা! সকল স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রতিটি মানুষ ব্যগ্রতায় সস্নেহ চোখে চেয়ে আছে রোগীর মুখের দিকে। তারা যেন সকল কষ্ট, সকল উপসর্গ, সকল রোগ আপনাদের হাত দিয়ে, বুক দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে মুছে নিতে চায়। অবশ্য অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের জন্য অনেক ক্ষেত্রে তার গণ্ডগোল ঘটায়। তবুও এমন ক্ষেত্রে, তাঁর চিকিৎসকের মনও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বর্তমান ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব থাকলেও এদের সে অভাব-বোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল। ছেলেটির নার্স আনার প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন তিনি।

ছেলেটি তার সঙ্গে আসতে আসতে বলেছিল—কিছু কি কঠিন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

—না-না-না। ডুস দিলেই সেরে যাবে, সামান্য ব্যাপার।

গাঢ়কণ্ঠে ছেলেটি বলেছিল—আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই ডাক্তারবাবু। বিধবা মেয়ে, ওই একটা সন্তান হয়ে যদি বাঁচে তবে জীবনে হয়ত সুখী হবে।

একটি মেয়ে হয়েছিল নির্মলার।

ডাক্তারের মুখে বিচিত্র হাসি দেখা দিল।

ডাক্তারবাবু।—

ডাক্তারের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হ'ল। হাতে মমের বইখানা খোলাই আছে। বইখানা রেখে তিনি একটু নড়েচড়ে বসলেন। একটি প্রৌঢ়া মেয়ে একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়েকে নিয়ে এসেছে। এবার বস্তির বাসিন্দা। ডাক্তারের জীবনে ডাক্তার যত রোগী দেখলেন তার মধ্যে বস্তিবাসিন্দাই বোধ হয় শতকরা সত্তর-পঁচাত্তর জন। এদিকটায় একটা প্রকাণ্ড অঞ্চল জুড়ে বস্তি। মেয়েদের নিয়ে যারা আসে, তারা প্রায় রাত্রেই আসে।

—কি?

—একে একবার দেখুন বাবা! বড় ভুগছে। কুচো-কাঁচা ভাঁড়-খুরির মত চারটি ছেলেপুলে। এই-এই-এই একটি কোলে। তার ওপরে এই রোগ।

চেম্বারে ঢুকে ডাক্তার টেনে নামালেন ওপরের ঝোলানো জোরালো আলোটা। রক্তহীন পাংশু একখানা কচি মুখ, চোখের পাতায় অপার্থিব অবসন্নতা ঘনিয়ে রয়েছে—মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা অপরাহ্ণের মত। ডাক্তার তাঁর ব্যবসায়সুলভ নিরাসক্তির সঙ্গে তাকে দেখতে চেষ্টা করলেন। পরীক্ষার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, চোখের দৃষ্টিতেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন নিষ্ঠুর নিষ্করুণ ক্রূর ক্ষয় রোগ, যক্ষ্মা। দারিদ্র্যের আচ্ছাদন তলে অবরুদ্ধ অন্ধকারে তার বাস। রোগ মাত্রেই নিষ্করুণ। তবু সকল রোগের মধ্যে এই রোগটি ক্রূর এবং নিষ্ঠুর। তিলে তিলে হত্যা করে। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাকে পরীক্ষা করলেন। চমকে উঠলেন তিনি। রোগের ধরনটা ঠিক নির্মলার মত ড্রাই প্লুরিসি থেকে যক্ষ্মায় পরিণতি লাভ করেছে। একটা দিক যেন ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে।

নির্মলার কথা মনে করতে করতে ডাক্তার খানিকটা ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, নিজের ব্যবসায়সুলভ নিরাসক্তিকে কিছুতেই সজাগ করে তুলতে পারলেন না। চোখে তাঁর জল এসে গেল।

সঙ্গিনী প্রৌঢ়া বললে—ডাক্তারবাবু!

দ্রুত চিন্তার স্রোত বয়ে গেল ডাক্তারের মনের মধ্যে।

দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের বধূ; চারিটি সন্তানের জননী। বাঁচতে হয়ত পারে নিউমোথোরাক্স করলে। নির্মলা বেঁচেছে। আজকের দু'বৎসর, সওয়া দু'বৎসর আগে যেদিন তিনি শেষবার নির্মলাকে দেখেছিলেন, এর অবস্থা প্রায় তেমনি, হয়ত কিছু ভালো। নির্মলা বেঁচেছে, এও বাঁচতে পারে সে চিকিৎসায়।

আজ সকালবেলায় নির্মলার মুখ মনে পড়ল—সজীব লাবণ্যে ঝলমল করছে। এক্সরের ফটোটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ডাক্তার শিউরে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে।

কানের পাশে বেজে উঠল—আমি—। আমি এখন—। আবার বেজে উঠল—ড্রিঙ্ক—একটু—ওটা আমার হ্যাবিট হয়ে গিয়েছে।

প্রৌঢ়া মেয়েটি আবার বললে—ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন—এ আমার অসাধ্য বাপু। যক্ষ্মা!

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বললে—সে বুঝেছি ডাক্তারবাবু। কিন্তু কোনো উপায়—

ডাক্তার বললেন—হাসপাতালে অনেক—অনেক খরচ, উপায় আমার জানা নেই বাপু।

ঠিক নির্মলার মত রোগের ধরনটা। অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। প্রথম দিন ধরতে পারেননি ডাক্তার। মেয়েটি যন্ত্রণায় সঠিক স্থান নির্দেশ করতে পারে নাই।—রাত্রেই আবার সেই ছেলেটি এল। অপরিসীম উদ্বেগ ছিল তার মুখে।—ডাক্তারবাবু!

—কি? ও, আপনার বাড়িতেই তো সকালে গিয়েছিলাম আজ। ড্রুস দেওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু যন্ত্রণা তো কমল না ডাক্তারবাবু।

—কমেনি? সে কি!—ডাক্তার একটু চিন্তিত হলেন।

—একবার চলুন আপনি। যন্ত্রণাটা উপর দিকে উঠছে, বলছে।

কেরোসিন তখনও এমন দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। একটি বেশ শৌখিন উজ্জ্বল আলোই জ্বলছিল। দিনের আলো সত্য রূপ ধরিয়ে দেয়, রাত্রে যত উজ্জ্বল আলোই হোক, সে যেন রূপের উপর একটা উজ্জ্বল সূক্ষ্ম আস্তরণ টেনে দিয়ে তাকে বেশী সুন্দর করে দেখায়। রাত্রের নদীর উপর জ্যোৎস্না এবং পাতলা কুয়াশা পড়েছিল বলে মনে হয়। তেমনি ধপধপে পরিচ্ছন্ন মহিমায় আবৃত হয়ে তেমনি নিথরভাবেই পড়েছিল। এখন সে দেখালে ব্যথাটা বগলের প্রায় নিচেই। জ্বর বেশ একটু হয়েছে।

ডাক্তার ধীরভাবে পরীক্ষা করলেন, অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। প্লুরিসি ধরা পড়ল এবার।

—ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার বললেন—প্লুরিসি হয়েছে। ভালো চিকিৎসার প্রয়োজন। ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দিতে হবে। ভালো খাদ্যের প্রয়োজন।

—যা দরকার হয়, করুন আপনি। বলুন কি পথ্য দিতে হবে। আজ থেকে আরম্ভ করুন ইনজেকশন।

প্রায় সমারোহ করেই চিকিৎসা শুরু হ'ল।

ডাক্তার যেতেন। মাথার গোড়ায় টেবিলে দেখতেন ফল সাজানো রয়েছে। দামী পেটেণ্ট ওষুধ। মেয়েটি স্তব্ধভাবে শুয়ে থাকত। মুখের খানিকটা দেখা যেত। একটা তিল কালো রঙের ফুলের মত ফুটে থাকত গালের উপর। দীর্ঘকাল ধরে ডাক্তারের ধারণা ছিল—

গালে তিল ওর একটা। নীরবে হাতখানি বাড়িয়ে দিত। ডাক্তার রবারের নলটা টেনে বাঁধতেন বাহুর উপর। ইনজেকশন দিতেন। এতটুকু স্পন্দন কি চাঞ্চল্য দেখা যেত না।

উপকারও হ'ল। জ্বর একেবারে কমে গেল। ব্যথাটাও আর অনুভব করত না। একদিন ছেলেটি বললে—আর কতদিন লাগবে ডাক্তারবাবু?

—চিকিৎসাটা এখন চালাতে হবে অন্ততঃ প্রসবের আগে পর্যন্ত।

ছেলেটা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ডাক্তার বললেন—এটা একটা ট্রেচারাস ব্যাধি। বিশেষ করে—

বাধা দিয়ে ছেলেটি বললে—দেখলে সেরে গিয়েছে বলেই মনে হয়।

—হ্যাঁ। কিন্তু ক্যালসিয়াম ইনজেকশনের এখনও দরকার আছে।

তারপর, তারপর বোধহয় দুটো ইনজেকশন দিয়েছিলেন মনে হচ্ছে এরপর আর ডাকলে না। শেষের দিন বলেছিল—ডেলিভারির সময় তো এগিয়ে এসেছে ডাক্তারবাবু। ডেলিভারিটা হাসপাতালে হওয়াই ভালো, কি বলেন? আর কেউ মেয়েছেলে নেই। আমি কাজে যাই।

ডাক্তার বললেন—সবচেয়ে ভালো হবে। আমি বরং হাসপাতালে একখানা চিঠি লিখে দোব।

ছেলেটির সে কি কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল চোখের দৃষ্টিতে—আজ দেবেন? সময়ে নিয়ে রাখাই ভালো, নয়?

—আসুন।

চিঠি নিয়ে গেল। তারপর আর কোনো খবর ডাক্তার পান নাই। ইনজেকশন দেবার নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তার অপেক্ষা করেছিলেন। প্লুরিসির পিছনে ক্ষয়রোগের কঙ্কালসার তীক্ষ্ণ নখর যে হাতখানা মেয়েটির দিকে প্রসারিত হয়ে আসছিল—তাকে তিনি হাত গুটাতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট চোখে দেখতে পেতেন—হাতখানা সঙ্কুচিত করে সরিয়ে নিচ্ছে সে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ের আনন্দ অনুভব করেন তিনি এমন ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, যাকে উপলক্ষ করে এ দ্বন্দ্ব বাধে এমন জয়ের ক্ষেত্রে সেই শরণাগত জনটিকে বড় ভালো লাগে। সকল ডাক্তারেরই লাগে। যে রোগীকে বাঁচায় তাকে যেন মনে হয় পরম স্নেহাস্পদ, পরম প্রিয়জন। এ মেয়েটিকে আরও ভালো লাগত। শুভ্র পরিচ্ছন্ন-

মহিমায় স্নিগ্ধ সহনশীল মেয়েটি জ্যোৎস্না রাত্রের নিথর নদীর মত নীরব শান্ত ; ক্রূর ক্রোধী ক্ষয়ের শোষণ-গণ্ডুষ থেকে তিনিই রক্ষা করেছেন। ক্ষয়ের শোষণ-গণ্ডুষ শিথিল হয়ে গিয়েছে, সে বয়ে চলেছে নিরুদ্বেগে কোমল মৃত্তিকার বুক বেয়ে।

কয়েক দিনই মনে হয়েছিল তার কথা! একবার ভেবেছিলেন খোঁজ করবেন। কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবন। অভিশপ্ত পরাধীন দেশের রোগজর্জরিত মানুষের মধ্যে এ অবকাশ ঘটে নাই তাঁর। ডাক্তারের একটা কথা মনে পড়ে লজ্জা হ'ল। যেদিন তিনি খোঁজ করবেন ঠিক করেছিলেন, সেদিন প্রায় সেই সময়েই এসেছিল ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট ; চারটে কেস নিয়ে এসেছিল। অর্থলোলুপতা ঠিক নয় ঃ অর্থের প্রয়োজন হয়। ইনসিওরেন্স কোম্পানির ডাক্তার তিনি। খোঁজ করা হয়ে ওঠে নি।

ক্রমে ক্রমে ভুলেই গিয়েছিলেন প্রায়। অনুরূপ দুঃখীর রোগক্লিষ্ট জীবনের সঙ্গে নিত্য পরিচয় হয়ে চলেছে। প্রত্যেকের দুঃখ দেখে মনে হয়, এর চেয়ে দুঃখ আর কারও বেশী নয়। নিরাসক্তির বর্মের মধ্যে হৃদয়কে ঢেকে চলেন ডাক্তার।

মাস দুয়েক পর—হঠাৎ একদিন এল সেই অল্পবয়সী ভদ্রলোক। ঠিক প্রথম দিনের মত টেবিলের ওপাশ ধরে দাঁড়াল। মনে হ'ল তেমনি উদ্বেগে কাতর। ডাক্তার তাকে দেখবামাত্র চিনলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনের চোখে ভেসে উঠল—ধপধপে বিছানায় শুয়ে আছে পরিচ্ছন্ন শুভ্র পরিচ্ছদ-পরিহিত একটি শান্ত স্তব্ধ মেয়ে। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন —কি খবর মশাই ?

—একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু।

—কেন ? মেয়েটি আছে কেমন ?

—ভালো নেই। দিন বিশেক হ'ল ডেলিভারি হয়েছে। আবার সেই কমপ্লেন। এবার জ্বরও বেশি, ব্যথাও বেশি।

ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কারণ, কার্য, ফল সবই তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন—দিন বিশেক ডেলিভারি হয়েছে ? তা ডেলিভারির আগে হঠাৎ চিকিৎসাটা বন্ধ করলেন কেন ?

মাথা নিচু করে ছেলেটি টেবিলের কোণটা নখ দিয়ে খুঁটতে আরম্ভ করলে। একটু পরে বললে—বেশ সেরে উঠল। দুটো-তিনটে ইনজেকশনের দিন চলে গেল—দেখলাম ভালোই রয়েছে। ভাবলাম

সেরে গেছে।—কথাটার মধ্যে অসমাপ্তির রেশ রয়ে গেল, সে চুপ করে গেল। অপরাধ স্বীকারের এটা একটা ভঙ্গি।

ডাক্তার বললেন—বড় অন্যায় করেছেন। আমি তো বলেছিলাম আপনাদের। বার বার করে বলেছিলাম।—একটু চুপ করে থেকে বললেন—আপনার আগ্রহ দেখে আমি খুব আশা করেছিলাম।

ছেলেটি এবার উপরের দিকে মুখ তুলে উপরের দিকে চেয়ে রইল।

ডাক্তার বললেন—চলুন দেখি।

দেখলেন ডাক্তার।

সেই মেয়ে—সেই ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। কোলের কাছে একটি শিশু-কন্যা! শীর্ণ কঙ্কালসার শিশু; মরণোন্মুখ গাছের ফুলের মত। ডাক্তার এবার দেখলেন পারিপার্শ্বিকও পাল্টে গিয়েছে। চারিদিক মালিন্যে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। বিছানা ময়লা, মেয়েটির কাপড় জীর্ণ, ঘরে একটা গন্ধ রয়েছে।

মেয়েটির জ্বর অনেকটা। বুকের ভিতরটাও জীর্ণ হয়েছে।

ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটা ইনজেকশনও দিলেন। তারপর বললেন—চলুন। একটা খাবার ওষুধও নিয়ে আসবেন।—ঘর থেকে বার হবার সময় একবার ফিরে দেখলেন। পারিপার্শ্বিক পাল্টেছে—মেয়েটিও যেন ঈষৎ পাল্টেছে। আরও শান্ত হয়ে গিয়েছে মেয়েটি। রাত্রের নদীতে মধ্যে মধ্যে যে একটা-দুটো আবর্তের আভাস পাওয়া যায়, তেমনিভাবে এক-আধবারও মেয়েটির দেহে যন্ত্রণার আক্ষেপ আগে দেখা যেত। এখন আর তাও দেখা যায় না।

ছেলেটির নাম ডাক্তার সেদিন জেনেছিলেন। ছেলেটির নাম রমেন। কায়স্থ। ছেলেটি হঠাৎ পথে ডাক্তারকে বললে—ডাক্তারবাবু, আমি যে বড় বিপদে পড়লাম।

—হ্যাঁ, বিপদ বৈকি!

একটু চুপ করে থেকে সে অকস্মাৎ বললে—মেয়েটি আমার সত্যিকারের কেউ নয় ডাক্তারবাবু।

চমকে উঠলেন ডাক্তার।—কেউ নয়?

—না।

বস্তি অঞ্চলের পথ। সেই পথে চলতে চলতে সে বললে—ডাক্তার

শুনে গেলেন।—একটি ভুলের জন্য আমার এই বিপদ। ও আমার কেউ নয়।

মেয়েটি পনরো-ষোলো বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছিল। ছেলেটির বাপ তাকে দেশ থেকে এনেছিলেন রুগ্ণা স্ত্রীর সাহায্য করতে। ছেলেটির বাপ মধ্যবিত্ত অবস্থার চাকুরে। ছেলেটি চাকরি করে ফ্যাক্টরিতে, নাম রমেন। সে বিবাহ করেনি। বাড়িতে রুগ্ণা মা ছাড়া আর কোনো ছেলেমেয়ে নাই। ওই মেয়েটিই ছিল তাদের সংসারের সব। বড় ভালো মেয়ে। শান্ত-স্বভাবা, মিষ্ট কথা, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। বড় ভালো লেগেছিল রমেনের।

তারপর—। রমেন চুপ করলে। ডাক্তার কোনো প্রশ্ন করলেন না। রাস্তাটা ছিল প্রায় জনহীন, দু-একজন লোক যারা চলছিল—তাদের খালি পা, ডাক্তার এবং রমেনের জুতোর শব্দ বেজে বেজে চলছিল।

একটু পরে রমেন বললে—তারপর যা হবার হ'ল। মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হ'ল। উপায়ান্তর না পেয়ে ওকে লুকিয়ে এনে এখানে রাখলাম। আমি অবশ্য বাড়িতে রইলাম—এখনও আছি। বাড়িতে জানলে—ও-ই কোথায় চলে গেছে। আমি ওকে এখানে রাখলাম, সন্ধ্যেয় আসতাম, দশটায়-এগারোটায় বাড়ি যেতাম। ইচ্ছে ছিল—যখন আমা হতেই ওর এই অবস্থা, তখন আজীবন ওকে রাখব আমি। সন্তান হলে তাকেও প্রতিপালন করব। না-হয় বিয়ে-থাওয়া করব না আমি।

আবার সে চুপ করলে। আবার শুধু বাজতে লাগল জুতোর শব্দ। কিছুক্ষণ পর রমেন পুনরায় আরম্ভ করলে—কিন্তু এতটা ভাবতে পারিনি।—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—ওভার টাইম খেটেও আর পারছি না।

ডাক্তারখানায় এসে পড়েছিলেন। উজ্জ্বল আলোয় ডাক্তার দেখলেন, রমেনের চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে। পরগাছা চড়ালে কাঁচা গাছ যেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অবস্থা হয়েছে রমেনের।

এরপর সচরাচর যা হয়ে থাকে তাই।

রমেনের ক্লান্তি ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। ডাক্তার বললেন, ফিস্ লাগবে না আপনার। করবারও বিশেষ কিছু নাই।

দু-একটা গোল্ড ইনজেকশন দিয়ে দেখব। অনেক সময় এতে উপকার হয়।

কিছুই হ'ল না তাতে। রোগ অব্যাহত গতিতে ছুটতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—শান্ত সহনশীল মেয়েটির সহনশীলতা তবুও ভাঙল না।

রমেন যেন ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ডাক্তারও পীড়া বোধ করলেন। সেদিন এসে সে বললে—ডাক্তারবাবু, একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে।

চমকে উঠলেন ডাক্তার।

রমেন বললে—মেয়েটা তো মরবেই। বোধ হয় আজ রাত্রেই মরবে। সে রাত্রে আপনাকে কোথায় পাব?

মেয়েটা—অবশ্য নির্মলা নয়, শিশু-কন্যাটি। শিশুটাও শুকিয়ে আসছিল—তার উপর হয়েছিল জ্বর। বাঁচবে না একথা ডাক্তারই বলে এসেছেন। কিন্তু তবু তিনি চমকে উঠলেন। বিরক্ত হয়ে উঠলেন। শঙ্কিত হলেন। সন্দিগ্ধও হলেন। রমেনের চোখে মরিয়া মানুষের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। তিনি রূঢ়স্বরে বললেন—না।

মেয়েটা মরল দু'দিন পরে। দিনেই মরেছিল।

তারপর একদিন রমেন এল—তার নিজের ব্যাধি হয়েছে। যৌন-ব্যাধি। নিজে ইনজেকশন নিয়ে বলে গেল—আমি তো কাজে যাব ডাক্তারবাবু! আপনি যদি দয়া করে দেখে আসেন; দু'দিন থেকে আরও বেড়েছে। ছটফট করছে যেন।

ডাক্তার গেলেন।

মেয়েটিও আজ কথা কইল। কিন্তু কন্যাটি যেদিন মরেছিল—সেদিনও ডাক্তার গিয়েছিলেন। মেয়েটি তেমনিভাবে পড়েছিল। নিথর নিস্তব্ধ। মজা নদীর মত অবস্থা হয়েছে যেন তার। মালিন্যে সর্বাঙ্গ মলিন, মজা নদীর পঙ্কিল জলের মত। জীর্ণ-শীর্ণ-স্তব্ধস্রোতা শুকিয়ে আসছে।

হঠাৎ মেয়েটি উঠল। ডাক্তার শঙ্কিত হয়ে বললেন—উঠ না, উঠ না। শুনলে না। ডাক্তারের পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে—ডাক্তারবাবু, কেন আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন? আমার বেঁচে কি লাভ? আমারই লাভ, না সংসারের কোনো লাভ? বুঝতে পারছেন না ওই লোকটা কত কষ্ট পাচ্ছে? তার চেয়ে এমন কোনো

ইনজেকশন থাকে তো-আমায় দিন—যাতে আমি দু-একদিনে আস্তে আস্তে মরে যাই !

ডাক্তার বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। তবু তিনি আত্মসম্বরণ করে বললেন—একথা আমাকে অন্যায় বলছ তুমি। আমি ডাক্তার। রোগীকে বাঁচানো আমার ধর্ম। মারতে তো আমি পারি না। না—না, আমি পারি না।

তবু মেয়েটি পা ছাড়ে না।

ডাক্তার বহু কষ্টে নিজেকে মুক্ত করলেন। মেয়েটি বললে—লোকটা কি হয়ে গেছে দেখছেন না ? ও বড় ভালো ছেলে ছিল ডাক্তারবাবু। আমিই ওর কাল হয়েছিলাম। একটু চুপ করে থেকে বিচিত্র হাসি হেসে বললে—বিয়ে করলে না আমার জন্যে। আমার এই অবস্থা। খারাপ ব্যারাম ধরিয়েছে—

ডাক্তার বেরিয়ে চলে এলেন।

সে-বারের মত তিনি সেই দেখেছিলেন নির্মলাকে। মুখে না বললেও মনে মনে বলেছিলেন—আর বেশী দুঃখ তোমায় পেতে হবে না। আর বড় জোর দু-তিনটে মাস। হয়ত তারও কম।

তারপর—আর কেউ ডাকতে আসে নাই। খবর দেয় নাই ! রমেনও আসে নাই। তিনি জানতেন মজা নদী শুকিয়ে গিয়েছে।

সেই মেয়ে হঠাৎ ফিরে এল। এসে সে বললে – আমি – । ডাক্তার শিউরে উঠলেন।

ক'দিন পর। ইনজেকশন নেবার নির্দিষ্ট দিনে এল না নির্মলা। ডাক্তার তাকে প্রত্যাশা করছিলেন। না আসায় ক্ষুব্ধ হলেন। রাত্রে বসে বই হাতে সেদিনের মত ওই মেয়েটার কথাই ভাবছিলেন। মোটর এসে দাঁড়াল। ডাক্তার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে—নির্মলা নামছে। আজ গাড়িখানা 'প্রাইভেট কার' —ঘরের গাড়ি।

নিপুণ প্রসাধন-মার্জিত রূপে লাবণ্যে বেশভূষায় ঝলমল করে সপ্রতিভ হাসি মুখে এসে দাঁড়াল সে—উজ্জ্বল আলোর সামনে।—সকালবেলায় আসতে পারিনি। উনি আজ শিলং গেলেন – আমাকে জবরদস্তি—তোমাকেও যেতে হবে। বেলা দেড়টা পর্যন্ত। তারপর খালাস।

ডাক্তার বললেন—কিন্তু রাত্রে এলে কেন? খালি পেট ভিন্ন তো ইনজেকশন দেব না।

সে বসে পড়ল—সেই ঘরেই একটা চেয়ারে—তাই তো।

—কাল সকালেই এস—কিছু না খেয়ে আসবে। তারপর হেসে তিনি বললেন—তুমি তো জান একথা। অন্তত সেদিন তুমি তাই বলেছিলে।

নির্মলা বললে—ওঁর কাছে শুনেছিলাম। এ রোগে ইনজেকশন আমার তো এই প্রথম।

ডাক্তার হঠাৎ অন্যায় প্রশ্ন করে বসলেন। প্রশ্নটা করে ফেলে তাঁর মনে হ'ল অন্যায় হয়ে গেল। বললেন—তুমি তো ইনজেকশন নিচ্ছ; কিন্তু তিনি ইনজেকশন নিচ্ছেন তো?—সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় বোধ জেগে উঠল। বললেন—প্রশ্নটা আমি অন্যায় করলাম। কিছু মনে করো না।

হাসলো নির্মলা। বললে—আমার কাছে আপনার অন্যায় হয়নি।

ডাক্তার চুপ করে রইলেন। মেয়েটির কৃতজ্ঞতা-বোধ তাঁকে তৃপ্তি দিলে।

নির্মলাই একটু পরে হেসে বললে—তাঁর অবশ্য অনেকবারই এ রোগ হয়েছে। তবে এবার তিনি ভালোই আছেন।

ডাক্তার অস্বস্তি বোধ করলেন এবার। কথা কোন্ পথে চলেছে? কিন্তু সেই নির্মলা এত নির্লজ্জ হয়েছে যে, সে কি বলছে বুঝতে পারছে না।

নির্মলা বললে—কনট্রাক্টর মানুষ, যুদ্ধের বাজার, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। মধ্যে মধ্যে আমাকেও লগেজের সামিল করে নেন। গিয়েছিলেন আসাম। সেখানে—। কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে বললে —ডাক্তারবাবু, লোকটি শিক্ষিত লোক, অনেক শিখিয়েছে আমাকে, অনেক জানে, কিন্তু দুর্দান্ত মাতাল। সেদিন বলেছি তো আমাকে সুদ্ধ মদ খেতে শিখিয়েছে। আমি না খেলে সে রাগ করে। মদ খেলে আর তার জ্ঞান থাকে না। সেখানে—। একটু হাসলে— তারপর বললে—সেখানে মদ খেয়ে সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে এল দু'জন বিদেশী। এসে আবার মদ খেলে—আমাকে খাওয়ালে। তারপর মদের নেশার উদারতায় আমাকে সেই দু'জনকে উপহার দিয়ে দিলে রাত্রির মত। কয়েকদিন পর হঠাৎ ব্যাধি দেখা দিলে।

বললাম, শুনে হাসলে। বললে—ও কিছু না। ইনজেকশন নিয়ে নাও।

ডাক্তারের ললাটে কুঞ্চন-রেখা ফুটে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পরে মসৃণ হয়ে গেল আবার। মৃদু হেসে ডাক্তার বললেন—অদ্ভুত তো!

—অদ্ভুত। ডাক্তারবাবু, প্রথম দিন যেদিন তাকে দেখলাম—। নির্মলা আজও শিউরে উঠল। বললে—সেই দিন রাত্রে, যেদিন আপনার পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম, সেই দিনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম আস্তে আস্তে, রমেন রাত্রেও আসেনি। বেরিয়ে পড়লাম মরব বলে। কোথায় যাব? গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হ'ল না। ভয়ও হ'ল। অনেক ভেবে ঠিক করেছিলাম—রাত্রি একটু বেশী হলে—গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। মরণও হবে—আর গঙ্গায় মরব। অনেক পাপ করেছি। মরবার সময় কষ্ট যাই হোক—ঠাণ্ডা জলে শরীরের জ্বালাটাও অনেকটা জুড়োবে।—নির্মলা থামল। চোখের দৃষ্টি তার শূন্যতায় যেন স্বপ্ন দেখছে।

—উঃ, সে কী রাত্রি! আর গঙ্গার তীরের সে কী জায়গা! থম-থম করছে রাত্রি।

কেউ কোথাও নাই, মধ্যে মধ্যে গঙ্গার জল কল-কল করে ঘুলিয়ে উঠছে, পাক খাচ্ছে। মরতে এসে তীরে দাঁড়িয়ে ভয় হ'ল। সে কী ভয়! সর্বাঙ্গ থর-থর করে কেঁপে উঠল। বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হ'ল আমার হাত-পা সব যেন অসাড় হয়ে আসছে, হয়ত গড়াতে গড়াতে কখন গঙ্গার জলে পড়ব।

তারপর দুরন্ত ভয়ে সে ফিরে আসতে চাইলে। উঠে দাঁড়াতে পারলে না, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করলে। পোর্ট রেলওয়ে লাইনে আঘাত খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত পড়েই রইল, তারপর মনে হ'ল যদি রেলগাড়ি আসে, তাকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে যাবে! সে আবার উঠল। তার সর্বশরীর কাঁপছে, সে বুঝতে পারলে তার চামড়ার নিচে স্নায়ু-শিরাগুলো থর-থর করে স্পন্দিত হচ্ছে দুরন্ত ভয়ে। প্রাণপণ চেষ্টায় হামাগুড়ি দিয়েই সে রেল-লাইন পার হয়ে চিৎপুর রাস্তায় এসে পড়ল। একটু বিশ্রাম করে রাস্তা এবং পোর্ট রেলের সীমানার মধ্যে যে রেলিং দেওয়া আছে তাই ধরে উঠে দাঁড়াল। ভাবছিল—মরতে হয় রোগেই মরবে সে তিলে তিলে। এমনভাবে মরতে সে পারবে না। তারপর মনে হ'ল বাড়ি ফেরার

কথা। কেমন করে সে বাড়ি ফিরবে? এই জনহীন কলকাতার পথ। রাস্তায় বড় বড় বাড়িগুলো এই নির্জন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে মনে হ'ল তার। আবার মনে হ'ল বাড়িতেও সদর দরজা বন্ধ এখন, ভিতর থেকে তালা পড়েছে। সে যেন এবার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলে তার অজ্ঞাতসারেই।

একটা মোটর চলে গেল। খানিকটা গিয়েই থামল সেখানে। পিছিয়ে এল—এসে থামল তার পাশে। মোটর থেকে নামল একজন ফুলপ্যান্ট হাফসার্ট পরা লোক। টর্চের আলো তার মুখের ওপর ফেললে। নির্মলার চোখ বন্ধ হয়ে গেল আপনি; কিন্তু মদের গন্ধ পেল সে; সঙ্গে সঙ্গে কানে এল জড়িত কণ্ঠস্বরের কথা।—হুঁ? বেশ তো? সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে একটু ঝাঁকি দিয়ে বললে—কে রে তুই?—আবার বললে—কেয়াবাৎ রে? তুই গালে দুটো তিল! আঁকা নয় তো! নির্মলা অনুভব করলে—গালে আঙুল দিয়ে ঘষলে সে। তারপর কানে এল—না, আঁকা নয় তো।—কে রে তুই? কে তুই? এখানে এত রাত্রে? থাকিস কোথায়?

অনেক কষ্টে নির্মলা বললে—আমি মরব বলে—

হেসে উঠল লোকটা। সেই জন্যই কথা শেষ হ'ল না তার। তারপর সে তাকে টেনে নিয়ে বললে—আয়।

একটু বাধা, যতটুকু শক্তি তার ছিল—দিয়েছিল সে। লোকটি ধমক দিয়ে বললে—এ্যাও। ধমক দিয়ে টেনে ঠেলে তুলে দিলে গাড়িতে। গাড়িটা আবার ফেরালে। খালের পোল পার হয়ে গাড়িটা ছুটল। তাকে এনে তুললে একটা বাগান-বাড়িতে। সাজানো ঘর। একটা সোফার উপর ফেলে দিলে। ঘরের সব ক'টা আলো জ্বেলে দিলে। নির্মলা ঘোমটা টেনে দিয়েছিল, সেটা টেনে খুলে ফেললে। কিছুক্ষণ দেখলে। ঘরের আলমারিতেই মদ ছিল—বার করলে, নিজে খেলে। নির্মলাকে বললে—খাবি?

নির্মলা কেঁদে উঠল। সে হাসলে। তারপর—। সেই দিনের আলোর মত আলোর মধ্যেই—!

শিউরে উঠল নির্মলা। তারপর আবার হাসলে বললে—মদ খেলে জানোয়ার ছাড়া আর কিছু নয় সে। পশু!

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডাক্তার।

নির্মলা বললে—ওটা তার বাগান-বাড়ি। প্রচুর টাকা করেছে। সেদিন আমাকে দশ টাকার একখানা নোট দিয়ে বাগান থেকে বার করে দিলে। আমার তখন নিরুপায় অবস্থা। কি করব? কেমন করে ফিরব? কোন মুখেই বা ফিরব? শরীরেও তখন অসহ্য যন্ত্রণা। নির্মলা থেমে একটু হাসলে; বললে—যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারি; কিন্তু হাঁটবার ক্ষমতা তো চাই। বাগানের মালীটাকেই দশ টাকার দুটো টাকা ভাগ দিয়ে বললাম—দু'টাকা তুমি নাও, বাকী টাকা থেকে আমাকে হোটেল থেকে একমুঠো ভাত এনে দাও। আর আমাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে, আমার জ্বর, একটু সুস্থ হলে চলে যাব। চলে আসতে পারিনি। রাত্রে সে আবার এল—আমি শুয়েছিলাম মালীর ঘরের বারান্দায়। হঠাৎ টর্চের আলো এসে পড়ল। সে এসে দাঁড়াল। মদের গন্ধ পেলাম। তারপর—।

হাসতে লাগল নির্মলা। বললে—মদ খেলেই সে জানোয়ার। বাঘে শুনেছি শিকারের মাংস পচিয়ে খায়।

একটু থেমে বললে—পরের দিন আর তাড়িয়ে দিলে না। সকালে বসে বসে শুনলে আমার কথা। তারপর ডাক্তার ডাকলে। আমি বলেছিলাম আপনার কথা। সে ঠোঁট বেঁকালে। তারপর ডাকলে একজন বড় ডাক্তারকে—টি বি স্পেশালিস্টকে। ডাক্তার বললে—হাসপাতালে দিয়ে নিউমোথোরাক্স করে দেখতে পারেন। সেরে যেতে পারে, একটা লাংস ঠিক আছে এখনও। চৌদ্দ মাস রইলাম হাসপাতালে। সে কী সমারোহ ডাক্তারবাবু! তারপর এনে রেখেছে একটা খুব ভালো ফ্ল্যাট ভাড়া করে। কিন্তু এখনও সেই বাগান-বাড়ি আছে। সেখানে হৈ-হৈ করতে যায় মধ্যে মধ্যে—মদ খেয়ে অনেক সময় আমাকে ভালো লাগে না। তখন খোঁজে কুৎসিত মেয়ে, দরিদ্র মেয়ে, রুগ্ণ মেয়ে।

ডাক্তার শিউরে উঠলেন; বললেন—বল কি?

হেসে নির্মলা বললে—দেখুন না মাথার দিকে চেয়ে। চুলে তেল দেবার হুকুম নেই। চকচকে চুল তার ভালো লাগে না। বলে কি জানেন? বলে—ভালো-লাগা আর নেশা-লাগা দুটো পৃথক জিনিস। চকচকে চুল ভালো লাগে—কিন্তু নেশা লাগে না। এই সে আজ গেল—কাল চুলে তেল মাখব। মদ খেলে চকচকে চুল দেখলে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

ডাক্তার হাসলেন। সে হাসি যে কিসের, এবং কেন যে হাসলেন তা তিনিও বুঝলেন না।

নির্মলা বললে—করুণা হচ্চে আপনার?

—তোমাকে স্নেহ করি, করুণা একটু হয় বৈকি।

—না, ডাক্তারবাবু। আর একটা দিক আছে তার। সে আমাকে পড়ায় সাহায্য করে, একজন মাস্টার রেখে দিয়েছে। গান শেখাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ভালো যখন থাকে তখন আমার গালের তিল দুটো নিয়ে খেলা করে, নাড়ে। বলে—একটা তিলের জন্যে কবি বোখারা সমরখন্দ বিকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি দুটো তিল পেয়েছি।

ডাক্তার বললেন—এইবার খুশী হলাম। তুমি তাহলে তাকে ভালবেসেছ?

চুপ করে রইল নির্মলা।

—কি, উত্তর দিচ্ছ না যে?

নির্মলা বললে—ভালো-লাগা আর ভালবাসা-বোধ আলাদা জিনিস ডাক্তারবাবু। ভালো লাগে, কিন্তু।—একটু চুপ করে থেকে বললে—জানি না ঠিক। আবার একটু চুপ করে থেকে বললে—সময় সময় সব তেতো মনে হয়। সব। আবার মনে হয়—বেশ আছি। খুব ভালো আছি। এর চেয়ে ভালো আর ক'জন থাকে! অনেকের বউয়ের স্বামীও তো মদ খায়, চরিত্রহীন হয়।

মনস্তত্ত্ব-বাতিকগ্রস্ত ডাক্তার উৎসুক উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরও নেশা লেগেছে। একটু ঝুঁকে টেবিলের উপর কনুই রেখে বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—বলুন!—হেসেই উত্তর দিলে নির্মলা।

—রমেনকে, রমেনের কথা মনে হয় এখনও? তাকে—

নির্মলা ডাক্তারের মুখের কথাটা নিয়েই বললে—তাকে ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা করছেন? ঠোঁটে তার মৃদু হাসি ফুটে উঠল, বললে—'হ্যাঁ' বললে খুশী হন বোধ হয়!

ডাক্তার হেসে বললেন—কেন?

নির্মলা যা জবাব দিলে—সে শুনে ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন। সে খিল-খিল করে হেসে বললে—মেয়েদের একনিষ্ঠতায় পুরুষরা সান্ত্বনা পায় ডাক্তারবাবু। মনে হয় আমাকে ভালবাসলে একনিষ্ঠ হয়েই ভালবাসবো।

ডাক্তার তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—একথা তোমায় শেখালে কে ?

—এই লোকটি।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইলেন। মেয়েটি হঠাৎ বললে—রমেনের উপর কোনো আকর্ষণ সত্যিই আমার নাই। একটু থেমে আবার বললে—তার উপর কোনো ঘৃণাও নাই। বরং—। সেও আমার জন্যে অনেক করেছে—অনেক সয়েছে। রমেনের টাকা থাকলে সেও হাসপাতালে খরচ করে আমার এমনি চিকিৎসাই করাত।—

নির্মলা একটু আকস্মিকভাবেই উঠে চলে গেল।

ডাক্তার চুপ করে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারের মনে হ'ল—মানুষের জীবনটা তরল পদার্থ।

পর পর ক'দিন এল নির্মলা। ইনজেকশন নিলে। তারপর আর সে এল না। ডাক্তার ভেবেছিলেন—নির্মলা এর পর তার নিজের অসুখে তাঁকেই কল দেবে। সেই লোকটিকে দেখবার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল ডাক্তারের। কিন্তু আর তার খবর পেলেন না।

ডাক্তার নিজের ব্যবসায় নিয়ে চলেছেন। টাইফয়েড, কলেরা, টি-বি, ইনফ্লুয়েঞ্জা—এ ছাড়া উদ্ভট উদ্ভূত কত ব্যাধি! রোগীর পর রোগী আসে। কত মনে থাকে, কত ভুলে যান। যাদের কিছু দিন মনে থাকে, কিছু দিন পর তাদের ভোলেন। আবার কত জন নতুন রোগী, মনে থাকে কিছু দিন। শুধু দু-একজনের কথা কিছুতেই ভোলা যায় না।

প্রভা বলে জেলেদের মেয়েটিকে টি-বি থেকে বাঁচিয়েছেন। নরেনবাবুকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছেন। সে বাঁচা আশ্চর্য। তাকে মনে আছে। কালীঠাকুরের পূজারীকে মনে আছে—সে বেঁচেছে টাইফয়েড থেকে। নির্মলাকেও মনে হয় মধ্যে মধ্যে।

বৎসর দেড়েক পর আজ—হঠাৎ ডাক্তার একটা টেলিফোন পেলেন। একটি বড় হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করে জানালো—আপনাকে একবার আসতে হবে।

—আমাকে ? কেন ?

—একটি মেয়ে, আমাদের এখানকারই একটি নার্স—বিষ খেয়েছে, বাঁচবে না। আপনাকে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিস্মিত হলেন ডাক্তার। কে ? নার্সদের অনেককেই তো জানেন,

কিন্তু এ কে? কে বিষ খেলে? বিষ খেলেই বা কে নার্স তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে? তবুও তিনি গেলেন।

ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন।

ধপধপে বিছানায় শুভ্র পরিচ্ছদ-আবৃত মেয়েটি পড়ে আছে। রাত্রের নদীর মত। মধ্যে মধ্যে আক্ষেপে দেহ সঙ্কুচিত হচ্ছে। যেন রাত্রের নদীতে আবর্ত উঠছে। নির্মলা শুয়ে আছে।

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—মাস কয়েক আগে এসে চাকরি নিয়েছিল। বললেন—অত্যন্ত হাসি-খুশী ছিল। কেন যে—। জানি না। মেয়েদের চরিত্র। কয়েকজন তরুণ ডাক্তার তো যন্ত্রাহত হয়ে গিয়েছিল ওকে নিয়ে। মেয়েটির অভ্যাস ছিল—খেলা করার। আপনি চেনেন?

—চিনি। কিন্তু ও যে নার্স হয়েছিল তা তো জানি না। এক সময় ও আমার পেশেণ্ট ছিল। টি-বি হয়েছিল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—দেখুন কি বলতে চায়। অবশ্য—। হাসলেন ডাক্তার। এ ডাক্তারও জানেন জ্ঞান আর হবে না।

জ্ঞান আর হ'ল না। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ভ্রান্ত প্রায়ই হয় না। ডাক্তার পেলেন একখানা চিঠি। তাঁকেই লিখেছিল নির্মলা। সুদীর্ঘ চিঠি। অনেক কথা। অনেক ঘটনা। হঠাৎ নির্মলার মন তিক্ত হয়ে ওঠে। সে নিষ্কৃতিই খুঁজছিল। ঠিক এমনি সময়ে কন্‌ট্রাক্টর ভদ্রলোককে গভর্নমেণ্ট এ্যারেষ্ট করলেন—কয়েক লক্ষ টাকা প্রবঞ্চনা করার অভিযোগ। নির্মলা বেঁচে গেল। সে অনেক ভাবলে।

লিখেছে—আপনার সেদিনের কথা মনে হয়েছিল ডাক্তারবাবু। ভেবে দেখেছিলাম রমেনকে ভালবাসি কি না। আমার হাতে তখন অনেক টাকা। সে ভদ্রলোক—গহনায় টাকায় অনেক দিয়েছিলেন আমাকে। আমি স্বচ্ছন্দে রমেনকে নিয়ে সুখে থাকতে পারতাম। কিন্তু ঠিক বুঝেছিলাম—তাকে ভালবেসে আমি সুখী হতে পারব না। একবার ভেবেছিলাম—টাকা নিয়ে তীর্থ-ধর্ম করব। ভালো লাগেনি। একবার ভেবেছিলাম—সিনেমায় নামব। প্রায় ঠিকও করে ফেলেছিলাম। তার পর সেও বাদ দিলাম। তার পর নার্সিং শিখতে ইচ্ছা হ'ল। খুব ভালো লাগল। মনে হ'ল—এই যেন চাইছিলাম। কিছু তো চায় মানুষ জীবনে। মনে হয়েছিল—রমেনকে আশ্রয় করে প্রথমে

যা পাইনি, এই লোককে আশ্রয় করে টাকায়, গহনায়, পড়ায়, গানে যা পাইনি, এইবার এই নার্সিংয়ের মধ্যে তাই পাব। প্রথম প্রথম মনেও তাই হ'ত। পেয়েছি। নিজের পরিশ্রমে উপার্জন করে তাই থেকে দিন চালাতাম। সে ভদ্রলোকের দেওয়া টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রেখেছিলাম। হাত দিইনি। দিতে ইচ্ছা হ'ত না। হয়ত বলবেন—নারী চায় পুরুষকে, এ ক্ষেত্রে তুমি সেই ভুল করেছিলে। না। তরুণ ডাক্তারেরা গুঞ্জন করত চারিপাশে। প্রথম বেশ ছিলাম। মনে হয়েছিল—সব পেয়েছি। তারপর ক্রমশঃ এর রঙও ফিকে হয়ে গেল। আর ভালো লাগল না। অত্যন্ত তেতো হতে আরম্ভ হ'ল সব। ক'দিন থেকে—রাত্রে ফের মদ খেতে শুরু করেছি। মদের সঙ্গেই বিষ মিশিয়ে খাব। বেঁচে কি লাভ ? ভালো লাগছে না। কি চেয়েছিলাম বুঝতে পারলাম না। বোধ হয়, ডাক্তারবাবু, মানুষ তা বুঝতে পারে না। হঠাৎ পেয়ে যায়। পেলে বুঝতে পারে—কি চেয়েছিল। বিষ খাবার কল্পনায় বেশ আনন্দ পাচ্ছি ডাক্তারবাবু।

পুনশ্চ—লিখেছে সে—আমার যে টাকাগুলো আছে ব্যাঙ্কে, সেগুলোর ট্রাষ্টি করেছি আপনাকে। উকীল জানাবে আপনাকে যথাসময়ে। মেয়েদের কোনো কিছুতে দিয়ে দেবেন।

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

কি চেয়েছিল নির্মলা ? সংসার—সন্তান ? কিন্তু কোনো পুরুষের আশ্রয়ই তো তার ভালো লাগেনি !

কি চেয়েছিল ? অন্য কাউকে চেয়েছিল ? ডাক্তার হঠাৎ অত্যন্ত বেদনা বোধ করলেন। হয়ত তাঁকেই—। ভক্তি থেকে বলে তো বিজ্ঞানে—।

হঠাৎ মনে হ'ল—তাঁর কানের কাছে নির্মলা খিল-খিল করে হাসছে—বলছে—পুরুষদের মনে হয়—আমাকে ভালবাসলেও তো—।

লজ্জিত হলেন ডাক্তার।

কমলা বলে মেয়েটি—প্লুরিসির রোগী—তাকে নিয়ে এল তার বাপ।

ডাক্তার উঠে বসলেন—বিজয়, ক্যালসিয়াম।

—বাঃ, বেশ সারছে মেয়েটি। বাঃ।

বিজয় দেরি করে বড়। ডাক্তারকে বসে থাকতে হ'ল নিষ্ক্রিয় হয়ে।

—কি চেয়েছিল নির্মলা ?

একখানা চিঠি।

"ডিয়ার গ্র্যাণ্ড-পা অথবা প্রিয় মহাশয়

(যো তুমহারা পসন্দ),

অমৃত বলিয়া সাপ্তাহিক কাগজে বিচিত্র চরিত্র নামের পাগড়ী মাথায় চড়াইয়া পুরনো দিনের মানুষগুলোর যে সপিণ্ডীকরণ বাহির করিতেছে, তাহা পড়িয়াই তোমাকে পত্র লিখেতেছি। তিল-মধু-সহযোগে পিণ্ড নামক দ্রব্যটি ব্যাড লাগিল না, গুডই লাগিল। ইনটেনশনে গলদ পাইলাম না।

বলি, আমাকে মনে পড়িতেছে তো? হেভেনে যে বাতি জ্বালিয়া দেয়, সে হইল গ্র্যাণ্ড-সন অর্থাৎ নাতি। কথিত আছে—নাতি স্বর্গে দেয় বাতি। তোমার জন্য তাহা আমি পারিব না, কারণ আমি তোমা হইতে বয়সে অনেক বড়। আমার নাম শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তোমার এক্সপেণ্ডিচার (Expenditure) মানে ব্যয় অর্থাৎ বেই বা বেয়াই অলওয়েজ কাউবয় অর্থাৎ নিত্য-গোপাল—বিচিত্র চরিত্রের 'সোনার তলোয়ার' আমাকে ক্লেভার মংকি বলিয়া ডাকিত। তোমার বাবার চেয়ে বয়সে পঁচিশ তিরিশ বছরের বড় ভাইপো বরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, যিনি তোমার পরমসমাদরের বড়দা হইতেন, তিনি আমার বাবার বাবা অর্থাৎ ঠাকুরদা হইতেন এবং আমাকে বলিতেন—'হারামজাদ—বজ্-জা-ত'।

এখন মনে পড়িয়াছে তো? না পড়িলে শালা বলিয়া গালি দিব—কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হইব না। আমার উপর তুমি প্লিজড ছিলে না। বোধহয় এখনও রাগ পড়ে নাই। না হইলে মেমারির গোরস্তানে যাহাকে জ্যান্তে পুঁতিয়াছ, তাহার কবরটা খুঁড়িয়া তুমি নিশ্চয় এতদিন আর্কেলজিক্যাল ফাইণ্ড হিসাবে গ্রীন মুনকে আবিষ্কার করিয়া সর্বজনসমক্ষে নিশ্চয় তুলিয়া ধরিতে।"

গ্রীন মুন—নির্মলচন্দ্র।

এ-বিচিত্র অনুবাদ ওই নির্মলেরই। আমি সম্পর্কে তার ঠাকুরদা।

খুব ফ্যালনা সম্পর্ক নয়। তবে খুব কাছেরও নয়। নির্মলের ঠাকুরদা বরদাবাবুর বাবা আমার ঠাকুরদার আপন ভাগ্নে। অর্থাৎ বরদাবাবুর বাবা আমার বাবার আপন পিসতুতো ভাই। বাবা বরদাবাবু থেকে পঁচিশ বছরের ছোট হয়েও তাঁর কাকা হতেন। সেই হিসেবে বরদাবাবু আমার দাদা হতেন। সম্পর্কটা এই। কিন্তু এর সঙ্গে আরও কিছু ছিল। আমার পিতামহ দীনদয়ালবাবু এবং তাঁর দাদা —দুই ভাই—তাঁদের ভাগ্নেদের জমিজেরাত দিয়ে বাড়ীর জায়গা দিয়ে গ্রামেই বাস করিয়েছিলেন। কিন্তু নির্মলের ঠাকুরদা বরদাকান্তবাবু সেকালের কৌলিন্য মূলধনে বা বীর্যবলে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী এক অতিপ্রাচীন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে বিবাহ করে সেখানে জমিদার হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের বাড়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বা ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্পর্ককে কোনদিন তিনি ভুলতে পারেন নি বা শুকিয়ে নীরস ও কটু করেও তোলেন নি। আমি তাঁকে 'বড়দা' বলতাম। স্পষ্ট মনেও রয়েছে আমার। প্রতি বছরই একবার করে তিনি আসতেন। সঙ্গে কোন ছেলে আসত। বেশী আসত সুধীরভাইপো অর্থাৎ বড়দা বরদাবাবুর ছোট ছেলে। বড় ছেলে ইন্দ্রবাবু ছিলেন সেকালের নাম-করা ডাক্তার।

বড়দা আমাকে বলতেন—সোনাভাইটি। এবং তাঁর মিষ্ট রসনায় শব্দটি সত্যকারের খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে আসত। গল্প বলতেন অনেক। সেবার তাঁর সঙ্গে এল তাঁর বড় পৌত্র ওই নির্মল। আমার বাবা তখনও বেঁচে। সুতরাং আমার বয়স আট বছরের নিচে। বাবা যখন মারা গিয়েছিলেন, তখন আমার বয়স আট বছর তিন মাস। নির্মলের বয়স তখন ষোলো-সতেরো বছর।

বড়দা সকালবেলাতেই আমাদের বৈঠকখানা বাড়িতে এসে ডাকলেন—কই গো, খুড়ো কই। বাবাজীবন।

ডাকলেন আমার বাবাকে। ভাইপো হলেও বয়সে তিনিই ছিলেন বাবার খুড়োর বয়সী; বয়সে পুত্রের বয়সী এই ভাইপোটিকে বাবাজীবন বলে সম্বোধন করতেন।

বাবা সমাদর করে আহ্বান করলেন—আরে আরে ভাইপো, কখন এলে বাবা? রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তো তোমার গাড়ি পৌছয়নি, আমি তো খবর নিয়েছিলাম।

বরদা বড়দা ঘরে ঢুকলেন একমুখ হাসি নিয়ে—এই রাত্রির শেষ

প্রহরে গো। তিন-প্রহরের শেয়ালগুলো ডাকছে তখন গাঁয়ে ঢুকেছি। মাঝপথে গাড়ির লিঘে ভাঙল বাবা। কপালের দুঃখের কথা বল কেন? শেষে পাশের গাঁয়ের একখানা গাড়ি নিয়ে সেই খোলা গাড়িতে চেপে গাঁয়ে ঢুকেছি। ভাগ্যে কেউ দেখেনি, দেখলে পরে জমিদারি মানমর্যাদা মাটি হ'ত। তারপর? তোমাদের সব ভাল?—কই, সোনাভাইটি কই?

আমার বয়স তখন বছর-সাতেক হবে। বড়দার সাড়া পেয়ে পাশের পড়বার ঘর থেকে ছুটে এসেছি—বড়দা!

—এই যে। আয়, আয় আয় বলে দুই হাতে ধরে বুকে তুলে নিলেন। বড়দার কতকগুলি বিচিত্র প্রশ্ন ছিল। তুমি ভাল আছ? তোমার চুল ভাল আছে? নাক? কান?

প্রশ্নগুলি করেই ডাকলেন—নিমু! নিমু রে! তারপর বাবাকে বললেন—বাবাজীবন, এবার নাতিকে নিয়ে এসেছি।

পনরো-ষোলো বছরের হাল্কা-পল্কা এবং একালে যাকে বলে শার্প অর্থাৎ ধারালো অথচ মিষ্টি চেহারার একটি তরুণ এসে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল।

বাবা বললেন—বাঃ, এ যে চমৎকার চেহারা নাতির!

—ওই পর্যন্তই। নইলে শালা বড় পাজী, যাকে বলে রাম-বদমাশ। দেখ না, দাঁড়িয়ে রইল দেখ না। যেন সিরাজুদ্দৌলা। নবাবের নাতি। আমি মা রাজার ছেলে প্রণাম নাহি জানি—কেমন করে করব প্রণাম দেখিয়ে দাও মা তুমি। হ্যাঁরে হারামী পেনাম করতে হয় জান না?

সপ্রতিভ নির্মল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল—জানি।

—তবে? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ যে?

—দেখছি।

—দেখছ? কি দেখছ?

—যাকে প্রণাম করব। আগে দর্শন তবে প্রণাম। কাকে প্রণাম করছি দেখতে হবে তো। বলে প্রণাম করলে বাবাকে। বাবা তাকে আশীর্বাদ করলেন।

বড়দা বললেন—একে প্রণাম কর। আমার সোনাভাইটিকে।

—এই বাচ্চাটাকে?

—হ্যাঁরে। বাচ্চাটা কার দেখতে হবে। তোর বাবার ঠাকুরদার।

তোর এই ঠাকুরদার খুড়ো ওই হরিদাসবাবু, তাঁর বাচ্চা। তুলসী-পাতার ছোট বড় আছে নাকি ?

—তা নেই। তা বেশ করছি প্রণাম।

হেঁট হয়ে নমস্কার করলে নির্মল। কিন্তু বড়দা তাতেও ছাড়লেন না, নাতিকে দিয়ে আমার পা ছুঁইয়ে প্রণাম করিয়ে ছাড়লেন। এবং আমাকে বললেন, সোনাভাইটি, এ হ'ল তোমার নাতি। বুঝেছ! তুমি হবে ওর দাদু, ঠাকুরদাদা।

নির্মল বললে—হ্যাঁ, ঠাকুরদাদা পাছায় কাদা বাগবাজারের দই। এসো তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কই। এস বাবু, এস।

ততক্ষণে ঠাকুরদাদাত্বের গৌরবে পুলকিত হয়ে এবং ওই ষোলো-সতেরো বছরের ছিপছিপে দীপ্তিমান তরুণটির রূপমাধুর্যে বাকচাতুর্যে মোহিত হয়ে প্রায় আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি। আমি তার হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিলাম ঘর থেকে। বাইরে বাগানে একটা বেদী ছিল, সেই বেদীর উপরে বসে গান ধরে দিলে মিহি সুরে—ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়। কাঁচা খায়, ডাঁসা খায়, পাকা পেলে আরও চায়। ঠা—কুর—দা-দা পেয়ারা—। হা। বলে গালে একটি মৃদু চপেটাঘাত করে অত্যন্ত মিষ্টিমুখে গাল দিয়ে উঠল।—শা-লা। আমার ঠাকুরদাদা! কই একটা পয়সা দে দেখি? ঠাকুরদাদা মারাতে এসেছ....? ডট-ডটগুলির মধ্যে এক-একটা অশ্লীল গালাগাল ছিল। সেগুলি প্রয়োগের এমন একটি বিশেষত্ব ছিল যে, অশ্লীল বলে লজ্জায় আমি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম; রাগ করতে সময় বা সুযোগ পাইনি। চীৎকার করতেও ভয় পেয়েছিলাম।

তাছাড়া রাগ হতে হতে তাতে জল ঢেলেছে নির্মল, বলেছে—দাদু আমার কি ভাল ছেলে! বাঃ বাঃ! দেখি দেখি তোমার আঙুলগুলি তো খুব সুন্দর। চোখ দুটি তো খাসা ঢলঢলে। বা-বা-বা! তোমার বোন আছে ঠাকুরদাদা—বড় বোন হওয়া চাই, থাকলে আমি তাকে বিয়ে করব, কেমন? তোমাকে শালা বলে ডাকব। তুমিও আমাকে শালা বলবে। কেমন? ভাল হবে না?

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাগ করতে পারিনি। এরপর দিনকয়েক নির্মল আর আমাদের বৈঠকখানায় আসেনি; বড়দা একলাই আসতেন বাবার কাছে। নির্মল আমাদের গ্রামের সমবয়সী ছেলেদের দলের মধ্যে তখন প্রবেশ করে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

এবং তার বোলচালের দৌলতে একটি সহজ স্থান করে নিয়ে যেতে গেছে। শুধু মাতেনি, মাতিয়েও তুলেছে।

সেকাল অর্থাৎ এখন থেকে ষাট বছর আগে। এবং রাঢ় দেশ। তন্ত্রপ্রধান দেশ। জমিদারপ্রধান দেশ। তখন নেশার একরকম রাজত্ব। ছেলেরা তামাক খেতে ধরত সাত-আট বছরে। গাঁজা যারা ধরত, তারা চোদ্দো-পনরোতেই দীক্ষা নিত। তার উপরে অর্থাৎ ভরাভাদরে যারা সাঁতারের প্রয়াসী, তারা ষোলো বছরেই ঝাঁপ দিত। গার্জেনদের বলার কিছু ছিল না। কারণ, ষোলো বছর হলেই আমাদের দেশে পুত্রের সঙ্গে মিত্রসম আচরণের বিধি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট। তবে তখন সবে বাধানিষেধ চল্ হতে শুরু করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বাতাস তখন মৃদুমন্দ বেগে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

নির্মল তখন কত কি ধরেছিল, তা জানতাম না, তবে যা ধরেছিল, তা যে অনেক কিছু তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের তারামায়ের বাগানে রামজী সাধু থাকতেন, তাঁর ওখানে গিয়ে তারা সিদ্ধি খেতো একথা সকলে জানতো। এবং বলতো—শুধু সিদ্ধি না, গাঁজা মদ সব।

যাই ধরে থাক নির্মল কয়েকদিন পর সেদিন আমাদের বৈঠকখানায় এসেছিল বিকেল বেলা। বোধ করি তার নিজের ঠাকুরদা অর্থাৎ বরদা বড়দার সন্ধানে এসেছিল। কিন্তু বড়দা তখন বাবার সঙ্গে বেড়াতে চলে গেছেন। আমি বাগানে ঘুরছিলাম। নির্মল আসতেই আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু লজ্জায় কেমন বাধছিল। নির্মল আমাদের অনন্ত চাকরের সঙ্গে কথা ব'লে চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল।

—ঠাকুরদা!

বেশ মনে আছে, আমি হেসেছিলাম। সত্যকার আনন্দের হাসি।

—এঃ! একেবারে চাবাল (চোওয়াল) ফেড়ে বত্রিশপাটি মেলে দিলে!

কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে পরবর্তী জীবনে এমনি কথা বলতে শুনেছি। সেই হিসেবেই মনে হচ্ছে, এই কথাগুলোই সে বলেছিল। তারপর কাছে এগিয়ে এসে বলেছিল—ভাল আছ?

—হাঁ।

—চুল ভাল আছে ? তার ঠাকুরদার প্রশ্ন, এগুলি সে তার কাছ
থেকেই কপি করেছিল।

—হ্যাঁ।

—কান ? নাক ? চোখ ? দাঁত—

—হ্যাঁ।

—দাঁতে পোকা লাগেনি ?

—না।

হঠাৎ এবার প্রশ্ন করে বসল—ভাল আছে ? লজ্জা কি ?....ভাল
আছে তোমার ? একটি অশ্লীল প্রত্যঙ্গের নাম করলে।

আমি লজ্জা পেয়েছিলাম। বয়স তখন সাত। কিন্তু নির্মল লজ্জা
পায়নি। ওই শব্দটিকে আশ্রয় করে এক ঝুড়ি অশ্লীল গালিগালাজের
ব্যবহার করে আমাকে কাঁদিয়ে সে সেদিন চলে গিয়েছিল। আজ
পর্যন্ত, যে-ঘটনা ক'টি বললাম, এর স্মৃতি আমার মনে অত্যন্ত স্পষ্ট
চেহারা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এতটুকু ম্লান হয়নি। পরবর্তীকালে
নির্মলকে যখন এ-কথা বলেছিলাম তখন নির্মল অম্লান মুখে বলেছে—
গ্র্যাণ্ড-পা, আজও সেই ট্রিক চালাই আমি। ছোট ছেলে—যাদের বাপি
বা বাপের ওপর চটে যাই—তাদের ঠিক এই কথাগুলোই বলি। বুঝেছ
ওই শব্দটাতে তুমি যখন লজ্জা পেলে—কর্ণমূল রেড হয়ে উঠল—
লজ্জাবতী লতার মত মাথা নোয়ালে তখনই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড করলাম যে
হয়েছে—ফ্রুট অব দি ফরবিডন ট্রিতে দাঁত বসিয়েছে। ব্যাস্ আর কি
চাই। তখন প্রাণ ভরে খিস্তি বাক্য প্রয়োগ করেছি, কারণ আর যে
কাউকে বলে দিতে পারবে না যে নির্মল আমাকে এইসব বাক্য বললে
বড়জোর একটি বাক্য।—'অসভ্য'। মাস্টারমশায় অসভ্য কথা বলছে
দেখ মা, দাদা অসভ্য কথা বলছে। রাত্রে বাপকে মায়ের চুমো খেতে
দেখলে সকালে ফিস-ফিস করে সকলকে বলে বেড়াবে—"জানিস ভাই
'কাল রাত্রে বাবা, মায়ের ঠোঁটে অসভ্য খেলে'।"

যাক; ছেলেবেলায় সেই প্রথম আলাপের কথা থেকে ঝাঁপ খেয়ে
অনেক পরে চলে এসেছি। ক্রমবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রথম অর্থাৎ সেবারের কথাটাই বলে শেষ করি, কারণ সেইটেই
হল 'নির্মল চন্দ্র' বা 'ক্লীন মুনের' যে স্ট্যাচুটি আমার জীবনের
মনোলোকের স্মৃতির যাদুঘরে অসংখ্য মানুষের স্ট্যাচুর সঙ্গে খাড়া করে
রাখা আছে তার পাদপীঠ।

সেদিন এই ঊনবিংশ শতাব্দীর এই গ্রাম্য ব্রাহ্মণ জমিদার সন্তানটি আমাকে এমন একটি কুৎসিত বাক্য বলেছিল যে তার প্রতি চিত্ত আমার যত বিমুখ এবং ভয়ার্ত হয়েছিল ঠিক ততখানি বোধও আকৃষ্ট হয়েছিল। কারণ বাল্যকালের স্বভাবধর্মে কুৎসিতের প্রতি কদর্যতার প্রতি যত তার আতঙ্ক ও আশঙ্কা, গোপনে গোপনে তার প্রতি ততখানি বা তার থেকেও বেশী তার আকর্ষণ।

* * *

এরপর আমার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ; তখন আবার নির্মলের সঙ্গে দেখা হ'ল। এর মধ্যে আর নির্মল আমাদের গ্রামে আসেনি। আমার বিয়েতে নির্মলের জ্যাঠামশাই আমার ইন্দ্রভাইপো—সাধারণের কাছে যিনি ইন্দ্রবাবু ডাক্তার—তিনিই ছিলেন আমাদের তরফের কর্মকর্তা। আমার বাবা যখন মারা গিছলেন, আমার তখন বয়স ছিল আট বছর তিন মাস। এরপর আমার বাবার মামা আমাদের বাড়ির বিষয়-আশয় দেখতেন এবং আমাদের অভিভাবক হয়েছিলেন। বছর কয়েক পরে তিনি মারা গেলেন, তখন আমার বয়স চৌদ্দ। এর বছর দুই আড়াই পর আমার বিয়ে হয়ে গেল একরকম অকস্মাৎ। আমার বোনের বিয়ের জন্য আমারও বিয়ে হ'ল। আমার বোনের সঙ্গে নারানের বিয়ে হ'ল এবং পরিবর্তে আমার বিয়ে হল নারানের বোনের সঙ্গে। সে সময় আমাদের বিষয়-আশয় দেখত নায়েব-গোমস্তায় এবং বুঝে নিতেন আমার মা-পিসীমা। পুরুষ অভিভাবক নেই। অভিভাবক আমার পিসীমা। তিনি পড়তে জানেন লিখতে জানেন না। বিয়ের সময় পুরুষ অভিভাবক হলেন বড়দা বরদাদা'র বড় ছেলে ইন্দ্রবাবু ডাক্তার। ইন্দ্রবাবু তখন সরকারী চাকরি থেকে রিটায়ার করে লাভপুরে প্র্যাকটিস করছেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার এবং আন্তরিক মমত্বের আকর্ষণেই ইন্দ্রভাইপো এগিয়ে এসে সব কাজের ভার নিয়েছিলেন। তাঁর গ্রাম তাঁর বাড়ি থেকে কুটুম্বও এসেছিল। সুধীরভাইপোও এসেছিল কিন্তু নির্মল আসেনি।

নির্মল তখন কাশিমবাজারের মহারাজা প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের শিল্পপ্রচেষ্টার মধ্যে একজন উৎসাহী কর্মী। মহারাজার উইভীং বা ট্যানারী বা ঐরকম কোন একটি প্রতিষ্ঠানে ভাল মাইনেতে কাজ করে। ছুটি ছিল না বলে আসেনি। অন্ততঃ সেই অজুহাত দেখিয়ে নির্মল একখানা পত্র আমাকে লিখেছিল—

"গ্র্যাণ্ড-পা, লাকি ব্রাদার ইন ল" লাকি চ্যাপ হে তুমি; এই সতেরো বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে গেল। আমাদেরও হয়নি হে। কনগ্র্যাচুলেশন। দেখ ছুটি পেলাম না বলে গেলাম না। তার উপর জ্যাঠা আছে। খুড়োর নেফ্যুউ কোনরকমে হওয়া যায় কিন্তু জ্যাঠার নেফ্যুউ সে অসহ্য ব্যাপার। তার উপর যাকে বিয়ে করছ সে হ'ল চারুদার কন্যে আমার ভাইঝি। না থাক কোন রক্তের সম্পর্ক। এ পাতানো সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের বাবা। মাইরি খুব উৎসাহের সঙ্গে বিয়েটা করে ফেলবে। ভয় পেয়ো না—"

এরপর কয়েকটা অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ রসিকতা ছিল। যার চলত সেকালে অর্থাৎ ১৯১৫।১৬ সালে একেবারে বাতিল হয়নি। তবে আমার জীবন থেকে বাতিল হয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণরূপে। কারণ তখন আমার জীবনে দেশপ্রেম ও দেশসেবায় দীক্ষা হয়ে গেছে। বৈষ্ণবেরা যেমন 'কাটা' শব্দ শুনে শিউরে উঠে কানে আঙুল দেয় মুখে আনে না; কারণ কাটলে রক্ত পড়ে; হরি হরি বলে চিত্ত শুদ্ধ করে নেয়; নির্মলের চিঠিখানা পড়ে সেদিন আমার মনে তেমনি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এবং সেই শৈশবের ক'খানা ইটের উপর আরও ক'খানা ইট গাঁথা হয়েছিল সেদিন। সে ইট ক'খানা গাঁথনীর মসলার মধ্যে প্রেম বা মধুর কিছু একেবারেই ছিল না।

এরপর নির্মলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হ'ল আরও দশ বারো বছর পর। ১৯২৬-২৭ সালে।

দেশসেবার পালার প্রথম পর্ব শেষ করে তখন আমি অসহায়ভাবে মামাশ্বশুরদের হাতে আত্মসমর্পণ করেছি এবং তাঁরাও আমাকে সেকালের দস্তুরমত ওয়েষ্ট কোট নেকটাই এবং ফেল্ট হ্যাটসহ স্যুট পরিয়ে কয়লার আপিসে কাজ শেখাচ্ছেন। কাঠের পার্টিশনে বেড়া দেওয়া খুপরীর মধ্যে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে সেদিন আমি কাজ করছি এমন সময় সুইংডোরে টোকা মেরে খোনা গলায় কে বললে—

—হ্যালো,—আই অ্যাম কামিং ইন—ইউ সি।

বিরক্ত হয়েই বললাম—হু ইউ প্লিজ?

নির্মল ঘরে ঢুকে বললে—আই এ্যাম ইয়োর ব্রাদার ইন ল ইয়োর সেকেণ্ড ওয়াইফস এল্ডার ব্রাদার, ইউ ক্যান কল মি ইন শালা—। কুলীনের ছেলে শালা তোমার সঙ্গে আমার এক

বোনের দ্বিতীয়পক্ষের বিয়ে দিতে রাজী আছি। যদিও তেমন কোন বোন আমার নেই।

সবিস্ময়ে বললাম—নির্মল!

নির্মল অত্যন্ত মৃদুস্বরে কতকগুলো অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে গেল অবলীলাক্রমে। সবশেষে বলল—হ্যাঁ। রাগ হলেও চীৎকার করে বা রব তুলে প্রতিবাদ করতে পারলাম না। শুনে লোকে যে হেসে আরও কোলাহল করবে। এবং অপ্রস্তুত যে আমিই হব।

নির্মল আমার অবস্থা অনুমান করে একাই হেসে কাঠের ঘেরা-দেওয়া খুপরীটার বাতাস উতলা ও চঞ্চল করে তুলেছিল। আমি অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সে নিজে আসন পরিগ্রহ করে আমারই আসনখানা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল—বস। Sit down—you faultless donkey.

বসেছিলাম এবং চমকেও উঠেছিলাম সম্বোধন শুনে। সে বলেছিল—ডোণ্ট বি এ্যাংরি গ্র্যাণ্ডপা, মাই ডিয়ার শালা এ্যাণ্ড ফল্টলেস ডাংকি। তারপর ডট-ডট-ডট। অর্থাৎ অশ্রাব্য গালাগাল। বললে—এটা তুমি কি করলে বলত? লেখাপড়ায় ইতি করলে; পুলিশের খাতায় নাম লেখালে; এতে তোমার হ'লটা কি? অবশেষে শালা তোমার শ্বশুর-বাড়িতে ধান ভানতে আসা ছাড়া গতি রইল না? হে মা কালী, হে খোদাতালা, ও গড্! এ করলে কি তুমি? ডট-ডট! সেই জন্যে তোমার নাম দিয়েছি ফল্টলেস ডাংকি। একেবারে দোষশূন্য-গাধা।

এতক্ষণে আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলাম, তা না হয় মানলাম এবং স্বীকার করে নিলাম নামটা। কিন্তু তুমি? মুরশিদাবাদ থেকে কবে এলে?

হোয়াট? ব্যাটল অব প্লাসি হয়েছিল সেভেন্টিন ফিফটি সেভেনে। তারপর হিষ্ট্রী অব বেংগলে আর একটি সাল—যে সালে ক্লীন মুন, মুরশিদাবাদের আকাশে পারমেনেণ্ট অমাবস্যা কায়েম করে দিয়ে মুরশিদাবাদ ছেড়ে চলে এসেছে ক্যালকাটা—ছাট ইজ নাইন্টিন হান্‌ড্রেড এ্যাণ্ড টোয়েন্টি ফোর। ইউ শালা, ফল্টলেস ডাংকি, ইউ ডোণ্ট নো ইট?

—তুমি কলিকাতায় রয়েছ?

—ইয়েস!

—মহারাজা নন্দীর চাকরি ছেড়ে দিয়েছ ?

—ইয়েস। তবে ছেড়ে দিইনি, ছাড়িয়ে দিয়েছে।

—ছাড়িয়ে দিয়েছে ? কেন ?

—ব্যবসা ফেল, পড়ো-পড়ো। রেড ল্যাম্প জ্বালবার জো করে তুলেছিলাম আমরা, মানে, মহারাজার স্নেহাস্পদ বিশ্বস্ত কর্মীবৃন্দ। অডিটারেরা বললে—ডে লাইটে থেপট নয়, রবারি ; লুট, যা বলবে তাই। অগত্যা মহারাজা ডেকে বললেন—দেখ রে, আমি তোদের দায়ী করতে চাইনে, কেস করতে চাইনে, তবে তোরা সব নিজে থেকে ব্যবসাগুলোর শোলডার থেকে নেমে রেহাই দিয়ে চলে যা। আমার যা গেছে তা যাক—

কথার মাঝখানে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম কত গেছে ?

তবে, থাউজ্যাণ্ডস, এ্যাণ্ড থাউজ্যাণ্ডস, সো মেনি থাউজ্যাণ্ড অব রূপীজ ! মে বি ওয়ান ল্যাক। মে বি টু ল্যাকস।

নিষ্ঠুর হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তুমি কত পেয়েছ তার মধ্যে থেকে ?

টেবিলের বনাতের উপর দৃষ্টি রেখে কথা বলেছিলো নির্মল, কথাটা শুনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সে নড়ল না, শুধু চোখের তারা দুটো ঠিক ভুরুর নিচে ঠিক যেন ঠেকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। সে কী ধারালো হাসি ! এবং তাতে কী অপার কৌতুক তার !

সেইভাবে চোখে চোখ রেখে বললে—থ্যাংক য়ু মাই ডিয়ার ডট-ডট শালা ! য়ু আর নো লংগার এ ফল্টলেস ডাংকি ! চাট্ ছুঁড়তে শিখেছ। এঁ্যা !

তার পরে হেসে বলেছিল—পেয়েছি বৈকি, কিছু নেবে ?

* * *

নির্মল পায়নি কিছু, শুধু বদনামের ভাগীই হয়েছিল, একথাটা পরে জেনেছি, কিন্তু সেদিন জানতাম না। সেদিন সে-কথা নির্মল বলেওনি। বলেছিল—যা পেয়েছি পুঁতে রেখেছি। কি করব ? ব্যাঙ্কে রাখলে ধরে ফেলবে। কারবার করলেও তাই ! ঠিক বলবে—এই দেখ সেই টাকা। বন্ধুকেও বিশ্বাস করেনি। বুঝেছ ! আমার সেই বজ্জাত ওয়াইফটা ছেলেপুলে ফেলে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে পালাল। কপাল হতভাগীর, থাকলে তাকেই দিতাম। তা দেখ না, মতিভ্রম দেখ না, মাগীর—

চমকে উঠলাম, বললাম, কি বলছ নির্মল ?

—কি বলছি ? তুমি শোননি ? নট হার্ড ?

—না।

—আরে খোদা, সে মাগী বত্রিশ বছর বয়সে পাঁচটা ছেলের মা হয়ে—

—নির্মল, চুপ কর তুমি। নির্মল—

—কেন চুপ করব ? এই বয়সে সব ফেলে মাগী পালাল, ওই সূর্যিঠাকুরের বেটা, ধর্মঠাকুর—যাকে তোমরা যম-টম কি বল যে গো, তার সঙ্গে।

এতক্ষণে হঠাৎ মিনিট খানেকের জন্যে গম্ভীর হয়ে বললে—হঠাৎ মরে গেল, হার্টফেল করলে।

আরও মিনিটখানেক চুপ করে থেকে অকস্মাৎ আবার শীতের মেঘলা আকাশের মেঘ কাটিয়ে রোদ ওঠার মত নির্মল আবার পূর্বের নির্মল হয়ে উঠল। বললে—যা মেরেছি, তা কি বের করতে আছে ? সে ব্রাইডগ্রুমই নয়, ক্লীন মুন। (অর্থাৎ সে পাত্রই নয় নির্মলচন্দ্র) শেষ মহারাজা ডেকে বললেন—দেখ, ব্যবসার লোকসানের জন্যে তোর দায় যাই হোক, সে থাক। কিন্তু তুই তিনবার আমার কাছে টাকা নিয়েছিস, দু'বার মাতৃশ্রাদ্ধ বলে, একবার পিতৃশ্রাদ্ধ বলে—অথচ বাপ তোর মরেছে অনেককাল আগে, আর মা তোর একজনই ছিলেন, কোন সৎমা ছিলেন না, আমি জানি। এর জন্যে তোকে বলছি, তুই চলে যা। ব্যাস্, লজ্জায় ওয়ান হ্যাণ্ড লং টাং (একহাত জিভ) বের করে ফাদার মাদার (বাপরে-মারে) করতে করতে চলে এসেছি কলকাতায়।

—কি করছ ?

—ঠিকেতে কয়েকটা কোম্পানীর এ্যাকাউন্টসের খাতা তৈরি করে দি অডিটের জন্যে। এ্যাণ্ড তার সঙ্গে ইনকাম-ট্যাক্স প্রুফ হিসেব বানিয়ে দি! তার সঙ্গে টী মার্কেটে গোডাউনের ঝড়তি-পড়তি ডাস্ট কুড়িয়ে কেনা-বেচা করি। সেটা কিছু নয়, সাইড বিজিনেস বলতে পার। ওই সন্ধ্যের স্পিরিটের দামটা, বিড়ি-সিগারেটের দামটা হয় আর কি! সন্ধ্যেবেলা জপতপ করি তো, তান্ত্রিক সন্তান। স্পিরিট না হলে স্পিরিচুয়াল ব্যাপার হয় কি করে ? এ্যাঁ।

সেদিন সাত নং সোয়ালো লেন থেকে একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম দুজনে। অবশ্য আমি ইচ্ছে করে তার সঙ্গে বের হইনি, সেই আমার

স্কন্ধ পরিত্যাগ করেনি। মনে পড়ছে সোয়ালো লেন থেকে রাধাবাজার ধরে লালবাজার স্ট্রীটে পড়বার পথে একটা দেশী-বিলেতী দুই রকমই মদের দোকান ছিল। অর্থাৎ সেখানে দু'রকম মদই পাওয়া যেত, অবশ্য মাঝখানে পার্টিশন ছিল একটা এবং সেখানে চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা ছিল; খুচরো খাইয়ে খদ্দেররা এখানে বসে খেতে পেত। সেই দোকানের সামনে এসে ক্লীন মুন আমাকে বলেছিল—কিঞ্চিং মানে সামথিং খসিয়ে ফেল গ্র্যাণ্ডপা। আমি তোমার গ্র্যাণ্ডসন, স্বর্গে বাতি দেব, গোল্ডেন মুনের মত হাত পেতেছি, আজকের সন্ধ্যের ইস্পিরিটের বৈবাহিকটা, মানে খরচাটা বা এক্সপেণ্ডিচারটা তোমাকেই দিতে হয় ব্রাদার-ইন-ল। বেশী নয়, স্রেফ এক পাঁট দশরথাত্মজের মানে রামের বা রমের দাম। হাতে তুড়ি দিয়ে বললে—মেক হেস্ট। জলদি করো ম্যান। প্লি—জ। এক পাঁট রামের দাম।

সেটা তখন কত ছিল তা জানি না, তবে খুব বেশী ছিল না, অর্থাৎ আড়াই টাকার মধ্যেই ছিল বোধহয়।

আমি স্যুট পরে থাকলেও বাড়িতে খদ্দর পরতাম এবং তকলী কাটতাম, সুতরাং আমার রাজী হওয়ার কথা নয়, রাজীও হইনি, একথা সহজেই বুঝবেন সকলে। কিন্তু ক্লীন মুন বলেছিল—তা হলে এই দেখ—

—কি?

সে বের করেছিল ছোট্ট একটা দু'আউন্সের শিশি। তাতে তখনও খানিকটা মদ্য, যা নাকি খাঁটি দেশজাত, তাই ছিল। নির্মল বলেছিল—মাইরি বলছি, এইটুকু তোমার গায়ে ছিটিয়ে দেব, ব্যাস্, তারপর যা হয় হবে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

সে বলেছিল—ডট-ডট-ডট, মাইরি তুমি তখন সাত-আট বছরের, তখন তোমাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছি, ঠাকুরদা বলেছি, আজও বলছি, তুমি ফাদার-ইন-ল'র আপিসে এ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেছ শুনে কত আনন্দে এতখানা বুক করে ছুটে এসেছি, আর তুমি তিনটে টাকা খরচ করে মাল খাওয়াবে না আমাকে?

—নির্মল।

—বেশী চালাকী কর না মাইরি। তা যদি কর, তাহলে এইটুকুতেই দুজনের গায়ে গন্ধ ছুটিয়ে 'চকার-বকার' করে তোমাকে নিয়ে লালবাজার থানার হাজতে গিয়ে ঢুকব। বুঝেছ!

আমাকে সেদিন সত্যই কয়েকটা টাকা খসাতে হয়েছিল, আত্ম-রক্ষার এবং টাকা ক'টা না-দেওয়ার মধ্যে যে আদর্শরক্ষার সংগ্রাম তাতে জয়লাভের কোন পথ না পেয়ে একান্তভাবে পরাজিতের মত আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল এবং বলতে হয়েছিল 'দোহাই ধর্ম, আমাকে রেহাই দাও।'

আজ মনে নেই রেহাই পেয়ে হন-হন করে ট্রাম রাস্তার দিকে অগ্রসর হবার সময় তার মৃত্যু কামনা করেছিলাম কিনা! কারণ, সেদিন ওইটুকুতে কয়েকটা টাকার বিনিময়ে রক্ষা পেলেও এর পর ভবিষ্যতের প্রতিটি মুহূর্তই যে আমার ওই ঠাকুরদাদাত্বের অপরাধে দণ্ড দেবার জন্য অশনিগর্ভ মেঘের মত চমকে-চমকে উঠে ইশারা দিয়ে শাসাচ্ছিল। দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত সে মেঘের বিস্তারের মধ্যে তো এতটুকু ফাঁক ছিল না। পালাব কোথায়? ওর বা আমার মৃত্যু ভিন্ন তো এই ঠাকুরদাদাত্বের অপরাধ থেকে আমার রেহাই সেদিন দেখতে পাইনি।

পাব কি? সেই দিনই ঘণ্টা খানেক পরে মামাশ্বশুরদের বাসায় বা তাঁদের কোম্পানীর মেসে নিজের ঘরে বসে লিখছিলাম। তখন নাটক লিখতাম, কবিতা লিখতাম। হঠাৎ লেখা আপনা থেকে থেমে গেল। নির্মলের কণ্ঠস্বর কানে এল। ওই মেসে তার এক খুড়ো থাকত; তার ঘরে এসেছিল সে। বা ওই খুড়োই তাকে সঙ্গে করে বাসায় এনেছিল। দুজনের দেখা হয়েছিল ওই দোকানে।

নির্মল আমাকে গান শুনিয়ে গিয়েছিল—

They call me a monkey
a very clever monkey—
Very pet grandson of an old donkey,
an old faultless donkey.
ট্রালা-ট্রালা-ট্রালা-ট্রালা—

তারপরই রামপ্রসাদীতে ঝেড়েছিল দু'কলি—ঠিক মনে নেই, তবে মোটামুটি কামনা জানিয়েছিল মায়ের কাছে, মা, এই ঠাকুরদাদার নাতি করো, তাহলে সন্ধ্যের ভাবনাটা আর থাকবে না।

* * *

ব্যাস, ওই দিনই। ওই একদিনই। এর পর আর নির্মল কোন

দিন এ জবরদস্তি, নির্মলের ভাষায়, shoulder climbingtrick স্কন্ধারোহণ কসরত আমাকে দেখায়নি।

তবে মধ্যে মধ্যে এর-ওর কাছে শুনতাম সে খোঁজ নেয়, আমি নারীপল্লীতে যাই-আসি কি না। অথবা ব্যবসা-বাজারের ফ্যাশন পানধর্মে দীক্ষাটীক্ষা নিয়েছি কি না। মধ্যে মধ্যে শুনতাম অসভ্য অশ্লীল গালিগালাজ দিয়েছে। দেওয়ার কারণটা ছিল, আমার হিতাকাঙ্ক্ষা। আমি আমার স্বভাব-ধর্মেই হোক আর আমার কোষ্ঠীতে অঙ্কিত জন্মকুণ্ডলীর অনুরূপ অদৃশ্যলোকে অঙ্কিত রাশিচক্রটির, বিশেষ ঘরে, বিশেষ গ্রহটির অবস্থান হেতুই হোক, আমি ঝগড়া করতাম আমার মামাশ্বশুরদের সঙ্গে। সেই কারণে সে আমার হিতা-কাঙ্ক্ষা করেই আমাকে গালাগালি করত।

কানে এসেছিল, বলেছে, কপালে ওর সইবে না। তিনপুরুষ হয়ে গেছে অনেক দিন। কেনারাম কেনে, রাজারাম রাজগী করে, তার বেটা বেচারাম বেচে। আমরা বাওয়া খাস নবাবী এলাকার লোক, অনেক নবাব দেখলাম, আমীর দেখলাম। সব শালাই ওই এক জাহান্নমে গেছে, ও-ও যাবে। রাবিশ কোথাকার। আর ওই যে স্বদেশী ঘানির পিওর মাস্টার্ড অয়েলের টেস্ট যে পেয়েছে না, তাকে ঘুরে-ফিরে ঘানি ঘোরাতেই হবে।

"ঘোর-ঘোর আমার ঘানি।
আমি শুধু চক্ষু মুদে কেবল টানি, কেবল টানি।"

স্লা, ভদ্দরলোক চারুদার মেয়েটা কষ্ট পাবে হে, নইলে কে গেরাহ্যি করত। দি র‍্যাম মানে মেড়া, চন্দ্র মানে মুন, ম্যাড়ামুন হে! অতঃপর ডট-ডট-ডট! অর্থাৎ গালাগালি। সে ঠিক শ্রাব্য নয়। এবং সে গালাগাল কাকে তাও নির্ণয় করা শক্ত। সে আমাকে হতে পারে, ঈশ্বরকে হতে পারে, বা পৃথিবীর যে কাউকে হতে পারে।

সেই নির্মল!

পত্র লিখেছে। তার পত্রের আরম্ভটুকু দিয়েই শুরু করেছি। পত্রখানা বেশ দীর্ঘ: পত্রখানা অবিকল নয়। কারণ নির্মলের পত্র, যে-পত্র আমার মত বয়সে ছোট এক ঠাকুরদা বা এই ধরনের কাউকে লেখা, তা অবিকল অবিকৃতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে চরিত্র-বৈচিত্র্যের শত-সহস্র দাবিতে প্রকাশ করা যায় না। এবং গুরুচণ্ডালী হবে

বলে খানিকটা কলমও চালিয়েছি। যে কোন পাঠক ধরতে পারবেন ওই 'বিচিত্র চরিত্র নামের পাগড়ী পরাইয়া' শব্দগুলি আমার। আরও আছে, বেশ কতকগুলোই আছে। সপিণ্ডীকরণ কথাটা তার, কিন্তু 'তিল মধু সহযোগে উপাদেয়' শব্দগুলো আমি বসিয়েছি। নির্মল লিখেছিল—'ফার্স্ট ক্লাস সপিণ্ডকরণ চটকেছ।' থাক। এখন নির্মলের আসল কথা বলি। নির্মল নিজের পিণ্ডির জন্যে ব্যস্ত নয়।

সে লিখেছে, দেখ গ্র্যাণ্ডপা, ক্ষ্যাপা বাউল থেকে শুরু করে 'রাধাখুড়ো' ( রাধাদা ) বিলিতী মাস্টার পর্যন্ত পড়ে বেশ লাগছিল হে। পুরনো লোকগুলোকে মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল এ্যালবাম দেখছি। হঠাৎ বিলিতী মাস্টারের পর তোমার 'মিলি' পড়ে মেজাজ আমার খারাপ হয়ে গেল হে। নারীচরিত্র অবশ্য পুরুষের কাছে উপাদেয় বটে, মৌমাছি ও ভ্রমরের কাছে ফুলের মধুর মত, ডেঁয়ো পিঁপড়ের কাছে গুড়ের মত, চাতকের কাছে ফটিকজলের মত; ও থেকেও ভাল উপমা কাঁচপোকার কাছে তেলাপোকার মত। এর আগেও তুমি নারীচরিত্রের পরিচয় দিয়েছ, কালো বউ পড়ে সারারাত্রি ঘুমোইনি। ভেবেছিলাম কালো বউ কে বলতো? আমি তো ওদের ওখানকার বহুজনকে চিনি। বয়স হিসেব করে দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল কালো বউ আমার বউয়ের বয়সীই হবে। অর্থাৎ কপালে থাকলে আমার বউই হতে পারত।

এমন ভাবনার রসায়ণ আমাকে খানিকটা চঞ্চল করে তুলেছিল হে। রীতিমত এক্সসাইটিং ব্যাপার। কিন্তু তোমার মলি পড়ে আমি-আমি-আমি—। কি বলব?

হয়েছে। আরব্য উপন্যাস নিশ্চয় পড়েছ? তাতে একটা গল্প আছে,—এক আমীরজাদা, একখানা তসবির, অবশ্যই তা এক তরুণীর, দেখে ক্ষেপে গেল। এবং বেরিয়ে পড়ল তার সন্ধানে।

হল না। হল না, গ্র্যাণ্ডপা। হল না। কি করে তোমাকে বোঝাই আমার অবস্থা! মাদার কালী, ফাদার শিবো হে! ( এসবগুলি নির্মলের অরিজিন্যাল, আদি ও অকৃত্রিম )। সে কাল হলে এক সিপ খেয়ে নিয়ে দেখতাম। মাথা শরীর চন-চন না করলে ওসব বেদবাণী আসবে কেন? কিন্তু আর তো সিপ করবার উপায় নেই গ্র্যাণ্ডপা। বয়স প্রায় ৮০র ধাক্কা। ছানি পড়েছিল চোখে, কাটিয়েছি। দাঁতগুলো

তুলে দু-দু পাটিই খাঁখিয়ে ফেলেছি। রাত্রিবেলা যখন খুলে টেবিলের উপর রাখি, তখন হঠাৎ অন্যমনস্ক অবস্থায় দেখে চমকে উঠি; মাথা চন-চন করে ওঠে। সিপের দরকারই হয় না! এবং তখনই সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতে বাঁ হাতের কব্জি ধরে নাড়ী দেখি। ভল্যুম কত?

প্রেসার বাড়ে। ভয় হয় গ্র্যাণ্ডপা। সুতরাং সিপ করবার তো উপায় নেই। করলে এক নিমিষে। বুঝেছ, হয়তো শূন্য-মণ্ডলে ঘুরে বেড়াব।

হয়েছে গ্র্যাণ্ডপা। হয়েছে। ইউরেকা। পেয়েছি।

পরশুরাম আমার প্রিয় লেখক, প্রিয়তম লেখক। ইউ আর নট। গাল দিয়ে লিখতাম। কিন্তু তুমি গ্র্যাণ্ডপা তুলসী পাতা, ছোট হলেও মাথায় করতে হবে। আমার ফাদারের ফাদার, গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান বরদাকান্তবাবু বলে গেছেন হে। তোমাকে এখন গাল দিতে গেলে পাপের ভয় হয়। থাকগে। যা পেয়েছি তা বলি শোন।

পেয়েছি 'ভূশুণ্ডীর মাঠ'। এবং সেই পেত্নীকে। যে লম্বা একগোছা ঝাঁটা হাতে ভূশুণ্ডীর মাঠের ঝরে পড়া পাতা ঝাঁট দিয়ে বেড়ায়।

শিবুর মত আমারও মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে কাকে জান? একজন সর্বনাশীকে। বুঝেছ? মলির কথা পড়ে তাকে মনে পড়ছে। তাই তোমাকে এত ঘটা করে চিঠি লিখছি।

গ্র্যাণ্ডপা, এ মেয়ে তোমার চোখে দেখা নয়, আমি লিখে তার কথা কতটা বলতে পারব? কতটা তাকে তোমার কাছে স্পষ্ট করতে পারব তা জানি না। তবে তোমাকে তাকে মলির চেয়েও উত্তমা করে আঁকতে হবে।

আদার ওয়াইজ।—নাঃ, খারাপ কথা বলব না গ্র্যাণ্ডপা। খারাপ কথা মনেও পড়ছে না। তবে তার আগে একটা কথা বলে নি। 'মলি' বড় ভাল মেয়ে।

এখন শোন।

ধর তার নাম 'কাজলরেখা'।

নামটা বড় কাব্যময় হওয়ার জন্য অবাস্তব অবাস্তব ঠেকছে? না? তা ঠেকুক। বলেই তো নিয়েছি নামটা আমার দেওয়া। এখন তার ডাকনামটা বলি—টুনু।

সে এক নাচওয়ালী মেয়ে। সেকালে বলতাম খ্যামটাউলী।

"খ্যামটাওয়ালী কাজল রেখা নাচতে এসেছিল আমাদের গ্রামে।" অর্থাৎ নির্মলদের গ্রামে। নির্মলেরই চিঠি থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

'গ্র্যাণ্ডপা, তোমার মেমারি খুব ভাল ; না-হলে লেখকই হতে না। তোমাকে সেকালের খ্যামটা নাচের কথা মনে পড়িয়ে দিতে হবে না। আজকালকার বিয়েতে তো স্রেফ ফেল কড়ি মাখ তেল। বউভাতে নেমন্তন্ন খেতে হলে নিদেন দু'টাকা মুল্যের একখানা বই। না-হলে এটা-ওটা যা হোক কিছু বউয়ের মুখ দেখে দিয়ে ভরাপেটে রাতদুপুর নাগাদ বাড়ি ফেরো। বর্তমানে তো পেটও খালি থাকে, গেস্ট কন্‌ট্রোল অর্ডার তো প্রায় পারমেনেণ্ট ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

সেকালে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ—অন্য দিকে নতুনখাতা, গৃহ-প্রবেশ, রথযাত্রা, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, রাস, ফাল্গুন-চৈত্র হোলী পর্যন্ত খ্যামটার সমাদরের কথা ঐতিহাসিক কাণ্ড। এ ছাড়া মেলা-টেলাতেও খ্যামটার ডাক পড়ত। বিয়েতে খ্যামটা নাচ না-হলে বিয়ে প্রায় সিদ্ধই হত না, অন্তত সমাজের চোখে অঙ্গহীন ঠেকত। বিশেষ করে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত-প্রধান গ্রামে।

গ্র্যাণ্ডপা, আমাদের গ্রামখানা একাধারে তান্ত্রিকের গ্রাম, আবার আমীরের গ্রাম ছিল। খাস মুরশিদাবাদ শহর থেকে মাইল কয়েকের মধ্যেই আমাদের গ্রাম। পুরনো কালের চৌধুরীবাবুরা সেই মুরশিদ কুলী খাঁর আমল থেকে চৌধুরী হয়েছেন, জমিদারি ও জায়গীর পেয়ে-ছিলেন। তবে মা-এলোকেশী কালো মেয়ের তন্ত্রমন্ত্রে উপাসক তারও অনেক আগের কাল থেকে। ক্রমে-ক্রমে জমিদার তান্ত্রিকরা কাছারীতে তক্তাপোশের উপর বসে তাকিয়া হেলান দিয়ে ফুরসিতে তামাক খেতেন, আর মনে-মনে কালী-কালী জপ করতেন। অন্দরে স্বামী-স্ত্রীতে পাশাপাশি আসন পেতে বসে কারণ-সহযোগে পুরশ্চারণ করতেন, আবার কাছারীবাড়ির পাশে বাঈ-খ্যামটা নিয়ে আমোদ করতেন। শাল-দোশালার নিচে মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা পরতেন। দাড়ি চুল ছিল অনেকের, তাতে আতর ঘষতেন।

এ হেন যে-গ্রাম, সে-গ্রামে বিয়েতে খ্যামটা নাচ ছিল—কলাগাছ, আমের শাখা, পূর্ণ ঘট, গায়েহলুদের হলুদ-তেল, রঙ পিচকারি, খাট-পালং, গন্ধদ্রব্য, তত্ত্বসামগ্রী, মাছ, মিষ্টি, দই, ক্ষীর, বিয়ের রাতের

খাওন-দাওন, বরের বাড়ির বউভাতের ভোজের সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি আইটেম। বরের জন্য বাসর আর বরযাত্রীদের জন্যে খ্যামটার আসর গুজনে সমান ভারী।

এদিকে মুরশিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, ওদিকে সিউড়ি-বর্ধমান থেকেই খ্যামটার দল বেশী আসত আমাদের এদিকে। আমাদের গ্রামটা একরকম জিয়াগঞ্জ-মুরশিদাবাদের খ্যামটাপটীর বায়নার এলাকা ছিল। সেবার বিয়ে হল আমাদের ওপাড়ার মুরলী ধরের। মুরলী আমার থেকে বয়সে ছ-সাত বছরের ছোট। আমারই মত চৌধুরীদের দৌহিত্র সন্তান। মুরলীর বাবা চন্দ্র মুখুজ্জে খাঁটি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, কড়া মেজাজের ঝাঁঝ-ওয়ালা ঘরজামাই। শৌখিন মানুষ, ফর্সা রঙ, টিকলো নাক, কোঁকড়ানো চুল, শুধু আমড়ার আঁটির মত চোখ দুটোর জন্য মানুষটিকে রাগী মানুষের চেহারা দিয়েছিল। আর তা তিনি ছিলেনও। এবং সেই রাগই তাঁর ঘরজামাই হিসেবে একমাত্র অস্ত্র বা সম্বল ছিল জীবনে।

কোন কাজ তিনি করতেন না। যে বিষয় তাঁর ছেলে পাবে, তাও তিনি দেখতেন না। বলতেন—ও আমার পোষাবে না।

আগেই বলেছি, খাঁটি ঘরজামাই। অক্ষরে-অক্ষরে তা মেনে চলতেন তিনি। বাড়িতে থাকতেন ঘরজামাইয়ের মত। স্ত্রী তাঁকে বাঘের মত ভয় করতেন। আরও বিবাহ তাঁর ছিল। কথা বলতেন জামাইয়ের মত। খেতেন জামাইয়ের মত। বাড়ির ভাত খেতেন, জলখাবার খেতেন, তামাকও খেতেন, এ বাড়ির জিনিস। কিন্তু সিগারেট খেতেন দিনে গোটা চারেক। আর পয়সা ছিল তাঁর নিজের। নিজের অর্থে তিনি এ বাড়ি থেকে বিবাহের সময়ের চুক্তিমত মাসে কুড়ি টাকা মাসোহারা পেতেন, সিগারেট তিনি তা থেকে কিনতেন। স্ত্রীকে কিনে দিতেন সাবান-টাবান কি-কি দ্রব্য। এই চন্দ্রবাবুই ছেলের বিয়েতে তাঁর নিজের জমান টাকা থেকে বাড়তি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাছাই করে নিয়ে এলেন এই খ্যামটার দল।

গাঁয়ে-গাঁয় বিয়ে। এ-পাড়ার ছেলে, ও-পাড়ার মেয়ে। সুতরাং খ্যামটা নাচের আসর পড়বে তিন দিন। কনের ঘরে বিয়ের রাত্রে। তারপর দু'রাত্রি বরের বাড়িতে।

কি বলব তোমাকে। খ্যামটার এই দলটি নেচে-গেয়ে রূপ-যৌবনের

ঝলকানিতে, বাঁকা চোখের ঝাপটায় যেন শীতকালে কাল-বৈশাখীর একটি ঘূর্ণি ঝড় বইয়ে দিলে।

খ্যামটা দলের নিয়ম তোমার বোধহয় জানা আছে। তোমার বিয়েতেও তো খ্যামটা নাচ হয়েছে। দলে সঙ্গতকারেরা পুরুষ। মেয়ে থাকে সচরাচর দুজন, তার সঙ্গে থাকে একজন মা বা মাসী-জাতীয় প্রৌঢ়া। সে বসে থাকে। নাচে দুটি মেয়েতে। গানও তারাই করে। দুটি মেয়ের একটি হল নয়নরঞ্জিনী, অপর জনটি মনোরঞ্জিনী। চোখজুড়ানী যিনি তিনি কাঁচাবয়সী এবং রূপসী। তাঁর বয়স হত কুড়ির নিচে। তিনি সামনে থাকেন। অপর জনের বয়স অপেক্ষাকৃত বেশী হয়, তার বয়সের উপরের সীমা তিরিশ কেন—আরও পাঁচ বছর চুরি করতে পারে, তেমন গাইয়ে নাচিয়ে হলে। নাচে-গানে তিনিই হন পারঙ্গমা। ছোট মেয়েটিকে কোনরকমে তালে পা ফেলতে হবে। আসরে দাঁড়িয়ে ফরাসের উপর ঘুঙুরসুদ্ধ পা তালে তালে বাজিয়ে কটাক্ষ হানতে হবে। একটু একটু হাসতে হবে। পায়ের বিক্ষেপে আসরে ধুলো তুলে ছোকরা থেকে বুড়ো পর্যন্ত সকলের হৃদয়ে জ্বলন্ত অনলকে ধুলো ছিটিয়ে নিভিয়ে দিতে হবে। বড় যেটি সে গান করবে, নাচের আসর মিইয়ে এলে সেই এগিয়ে এসে আসর রাখবে। মাথায় জলভর্তি কলসী নিয়ে তারাই নাচে। বয়স বেশী এবং রূপে কিছু মলিন হলেও মেক-আপ করে এরাও কম যায় না। অনায়াসে বলা যায় দু'টি খুকী নিয়ে খ্যামটার দল। বড়খুকী এবং ছোটখুকী। খ্যামটা দলের মেয়েরা খুকীপনা না-করতে পারলে পাস-মার্ক পায় না; প্যালা পড়ে না এক পয়সা। লোকে একটু বসেই উঠে চলে যায়। বলে, চল বাড়ি যাই, ঘুম পাচ্ছে।

এ দলের দু'টি খুকীই চমৎকার। অর্থাৎ ছোটখুকীটি শুধু বয়সেই কাঁচা এবং রূপেই রূপসী নয়, নাচে-গানে দুয়েই তার বেশ দখল আছে। কিন্তু বড়খুকী যেটি সেটির তুলনা নেই গ্র্যাণ্ডপা। যে লাল পদ্মটি গতকাল মাত্র ষোলআনা ফুটেছে—ঠিক তেমনি। যত গন্ধ, তত রঙ, তত কি তার ঝলমলানি।

ছোটটা ওর কাছে হেজাক আলোর কাছে একশো পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্বের লালচে আলোর মত মনে হল।

শীতকাল, আসরে এল সেকালের দিনে ওভারকোট পরে। ওভেই

আমাদের মাথা ঘুরে গেল। সে তোমার ধরগে—ধরগে কেন? ঠিকঠাক বলে দিচ্ছি সালটা, নাইন্টিন হান্‌ড্রেড এ্যাণ্ড ফিফটিন, সবে যুদ্ধ লেগেছে; ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের প্রথম, বাংলা মাঘ মাস। কি বলব তোমাকে; আমাদের গ্রামের আবালবৃদ্ধ যুবকেরই মনে হল উত্তরে বাতাস একেবারে উজান বইতে শুরু করেছে, দখনে বাতাস আসছে এবং সে বাতাসে কোন একটা বুনো ফুলের মাতালে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

চৌধুরীবাবুদের পঁয়ষট্টি বছরের সমর্থ বুড়ো বড়কর্তা বললেন—কাণ্ড দেখ তো! ফাল্গুন মাস পড়েছে, নেবারণ খানসামা হারামজাদা সে-কথা একবার বললে না; শীতের প্রথমে বের করেছিল, সেই কাশ্মীরী শালটাই কাঁধে চাপিয়ে দিলে। ডাক তো তাকে, নিয়ে যাক শালখানা, দিয়ে যাক কোঁচান ফরাসডাঙার উড়নী-চাঁদর।

গ্র্যাণ্ডপা, বুঝতেই পারছ, আমার স্বভাবমত এগুলো বলছি এবং ওর সঙ্গে তাল রেখে এরপর লিখতে হয়, আমি হঠাৎ ভেউ ভেউ করে বা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। বলতে হয়—কি হয়েছে, বুকের ভিতরটা কেমন করছে, বুঝতে পারছিলাম না আমি। না; তা আমি বলব না।

এবার খাঁটি বাস্তবে আসা যাক। তবে তামাশা নয়, হাসি-মস্করা নয়, রঙ্গরসিকতা নয়। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি বা আবেগ—যা অত্যন্ত গম্ভীর—অত্যন্ত মারাত্মক—অত্যন্ত প্রচণ্ড। একটা পুরুষ turns mad for a woman—মনে হল, ওই মেয়েটার জন্য আমি পাগল হয়ে গেলাম।

তারপর, সে গাইলে, নাচলে এবং আসরে কালবৈশাখীর ঘূর্ণিঝড় তুলে দিলে পুরুষদের হৃদয়ে। তোমাকে মিথ্যে বলব না, আমার হৃদয়ে আমার বউয়ের জন্যে গড়া ঘরখানা, মাটির দেওয়াল, খড়ের চালাঘর ছিল না, দস্তুর মত ইঁটের গাঁথনী ঘর, তাও কাদার গাঁথনী নয়, চুন-সুরকীর গাঁথনী ছিল এবং সামনের এ্যালিভেশনে পঙ্ক চুনের কাজ করা ছিল। প্রথম যৌবনেই বিয়ে হয়েছিল, বউপাগলা বলে আমার অখ্যাতি ছিল। ভূমিকম্পে সে ঘরখানা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। বউ ছুটে বেরিয়ে পথে দাঁড়াল।

ভূমিকম্পটা বলতে পারি বেহারের ভূমিকম্পের চেয়েও প্রচণ্ডতর ছিল ঠাকুরদা!

মেয়েটার জন্যে দেওয়ানা হয়ে গেলাম ঠাকুরদা। ও একখানা গান গেয়েছিল—'ও কালা, তোর তরে কদম তলায় চেয়ে থাকি।' গানটা সেকালের খুব চলতি গান। তুমিও শুনেছ। রেকর্ড হয়েছিল। আমার মনে হল, মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়েই, মানে আমাকেই যেন কথাগুলো বললে, গানের ছলে। শুধু আমি না, বোধহয় সবাই ঐ কথা ভেবেছিল সেদিন।

বড়কত্তা ঝপ করে প্যালা দিয়ে ফেললেন পাঁচটা টাকা। তারপর চারিদিক থেকে। দু'টাকা, চার টাকা, এক টাকা পড়তে লাগল। প্যালার টাকা নিয়ে হাত বাড়াতে-না-বাড়াতে ছুটোর একটা মেয়ে এসে প্যালা নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ও যার হাত থেকে নিচ্ছিল না, তার মনে হচ্ছিল দূর-দূর-দূর—লোকসান হয়ে গেল।

আমি প্যালা দিতে ভুলে গিছলাম। আমার হার্টের মধ্যে তখন আর্থকোয়েক চলছে. সে আগেই লিখেছি। আমি তখনই ভাবতে শুরু করেছিলাম, ওকে আমার চাই। এ না হলে আমার সব মিথ্যে। দুনিয়াতে জীবনের মানে-টানে কখনও খুঁজিনি ঠাকুরদা। বরাবরই সোজাসুজি ভাবি এবং জানি—

জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে চিরস্থির কোথা নীর হায়রে জীবন নদে।

জন্মেছি, বেঁচে আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি তার জন্যে কাজকর্ম করছি, ছেলেপুলে হচ্ছে—হবে, বুড়ো হব, তারপর ওয়ান ডে নয়ন মুদে দেব—ব্যস। কিন্তু সেদিন মনে হল, এই মেয়েটিকে পাবার জন্যেই সংসারে জন্মেছি। গতজন্মে জন্মেছিলাম ওই ওকে পাবার জন্যেই, কিন্তু পাইনি। তার আগের জন্মেও তাই। তার আগের জন্মেও তাই। বুঝেছ? কোন জন্মে শুধু খুঁজেই মরেছি, দেখাই পাইনি। কোন জন্মে দেখা পেয়েছি, কিন্তু কাছে পৌঁছুতে পারিনি। সেও কেঁদেছে, আমিও কেঁদেছি। দু'জনেই বলেছি, আসছে জন্মে। এ-জন্মে দেখা পেয়েছি, কাছে এসেছে। ভগবান ভাগ্য-দেবতা আমাদের পরীক্ষা করবার জন্যে আমাকে করেছেন গৃহী সংসারী, আর ওকে করেছেন বেশ্যা খ্যামটাউলী।

এমন কথাই ভাবছিলাম।

হঠাৎ মেয়েটা গাইতে-গাইতে সামনে এসে দাঁড়াল। খ্যামটার

রেওয়াজ মনে কর, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কলি গেয়ে দিয়ে থেমে নাচ শুরু করে। অথবা একজন বসে গান গায় আর একজন মৃদু-মৃদু নাচের সেই প্রথম পা এক দুই তিন, এক দুই তিন, ছন্দে পা ফেলে। তবলার ঠেকার ছাঁদে ঝুম-ঝুম-ঝুম শব্দে পায়ের ঘুঙুর বাজায়। সামনের দর্শকদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে, হাসি-মস্করার উত্তরে মুচকে মুচকে হাসেও।

ছোট মেয়েটাকে গান ছেড়ে দিয়ে ও ঘুরে নাচের পালা নিয়েছিল, তার কারণ প্যালা সংগ্রহ। ছোট মেয়েটার কাছে এ সত্যটা যতই অপ্রীতিকর হোক যে, লোক তার বয়স কম সত্ত্বেও প্যালা ওই টুনুকেই দিয়ে খুশী হচ্ছে, তাতে কিছু এসে যায়নি। বলতে পার, লোকের এ মেজাজ মেনে নিয়েছিল তারা সকলেই। প্যালা কুড়োতে-কুড়োতে আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ বললে—কই? আপনি তো প্যালা দিলেন না?

চমকে উঠেছিলাম। কারণ আমি ওকে দু-চার টাকা বকশিশ দেবার কথা ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম সব দিয়ে ওকে কেনার কথা। বলতে পার, নিজেকে ওকে দিয়ে হারিয়ে যাওয়ার কথা।

—কি? কথাই বলছেন না? দিন প্যালা। সকলে দিচ্ছেন, আপনি দেবেন না কেন?

পকেটে হাত পুরেও দুষ্ট বুদ্ধি গজাল।

আমার একটা দুষ্ট বুদ্ধি আছে, যেটা খুব বেশী কথা বলে বক-বক করে। সে ছেলেবেলা থেকে। বলে বসলাম—ভাল না লাগলেও দিতে হবে?

—ভাল লাগেনি আপনার?

—না।

—মিথ্যে কথা।

—মানে?

—কিছু না। বাজে বকবক করবেন না। প্যালাটা দিয়ে ফেলুন।

—না।

—না বললে শুনব কেন আমরা? আমাদের যে পাওনা এটা। আপনার বাড়ি এসেছি। রূপ-যৌবন বিকি্র করে নাচছি-গাইছি। আপনারা প্যালা দেবেন না কেন? আপনারা চোখ মারছেন,

ফিসফাস করে আমাদের নিয়ে কথা বলছেন। তার দাম আমরা পাব না কেন?

হেসে বললাম, আমি তার কিছুই করিনি।

—সবার থেকে বেশী করেছেন আপনি।

—না।

—হ্যাঁ। ওরা তো কেউ চোখ মেরেছে, কেউ হেসে ইশারা করেছে, কেউ-কেউ ফিসফাস করেছে, আপনি আমাকে চোখ দিয়ে গিলতে চেয়েছেন।

ঠাকুরদা, আমি ছেলেবেলা থেকেই ইঁচড়েপাকা যাকে বলে তাই এবং অত্যন্ত প্রগল্‌ভ, এবং এ সম্পর্কে আমি খুব সচেতন অর্থাৎ কনসাস। তুমি জান এবং আমিও জানি, অশ্লীল বাক্য বলে আমার একটা কেমন তৃপ্তি হয়। সেটা এমনিতর নাচের আসরে প্রশ্রয় পেয়ে চরমে ওঠে। অন্তত এককালে উঠত। আমাদের গ্রামে এর আগে খ্যামটার আসরে আমিই তার স্ট্যাণ্ডার্ডটা হাই বা হাইয়েস্ট করে তুলেছিলাম। একটি নাচের আসরে, তখন রাত্রি দুটো বাজছে, তবু বুড়োরা উঠছে না দেখে চটে-মটে পদ্মাসন হয়ে বসে মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা তুলে চেঁচিয়ে বলেছিলাম, এবার আমাদের ছোকরাদের আসর। ঘাটে আমরা লা ভিড়িয়েছি, পান খাব। বড়োরা উঠে যান।

ওই ধরনের একটা গান আছে বোধহয় জান, না জানলে মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। সে গানটা গাইতে বরাত করেছিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে কত্তারা উঠে সরে পড়েছিলেন।

কিন্তু সেদিন মেয়েটা আমাকে বেকুফ করে দিলে। বললে—"আপনি আমাকে চোখ দিয়ে গিলছেন।"

আমি নির্বাক হয়ে গেলাম।

উত্তর খুঁজে পেলাম না। কারণ এক-একটা সময় আসে যখন মিথ্যে কথা কোনমতেই গলা দিয়ে বের হয় না। হয়তো বা অন্তরাত্মা যাকে বলি, আমার সে টুঁটি টিপে ধরে বলে, সত্যকথা বলতে সাহস না হয় চুপ করে থাক, কিন্তু মিথ্যেকথা বলিসনে। বললে চিরকালের মত মিথ্যেবাদী হয়ে যাবি।

সে আমার আরও কাছে এসে দাঁড়াল।

হেসে বললে—কি হল? মুখ যে শুকিয়ে গেল।

অভ্যাস যাবে কোথায়? কথায় বলে স্বভাব মূর্ধনি বর্ততে।

মিথ্যাকথাই বললাম, ওর চার্জ অস্বীকার করবার জন্য নয়। বললাম—সকলেরই কি প্যালা দেবার ক্ষমতা থাকে? তা বলে গরীবেরা কি তোমার এমন সুন্দর নাচ-গান দেখতে-শুনতে পাবে না?

সে বললে—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না বাবুসাহেব।

—তার মানে?

—যার এমন চেহারা—

—তোমার থেকে ভাল নয়—

—সে মানি। তাতেও তো একথা বলছিনে যে, আমি ইতর মুদ্দোফরাসের মেয়ে।

—কিন্তু গরীব তো হতে পারে।

—পারে। কিন্তু আপনার আঙুলের ওই লাল পান্নাটার দাম অন্তত আড়াইশো-তিনশো টাকা। আপনি গরীব?

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ঠিক দামই বলেছে ও। আমি খুব শখ করে কিনেছিলাম পাথরটা।

সে বললে—ওসব চিনতাম এক সময়। দিন—দিন। দুটো টাকা তো দেবেন। তার জন্যে এত! বাবাঃ—

পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে ওর হাতে দিলাম।

একেবারে বাঁদীরা যেমন করে গুড়ি হয়ে কুর্নিশ করে তেমনি করে হাসতে-হাসতে চলে গেল। প্যালার থালায় টাকাটা দিয়ে অন্যজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সেইদিনই ভোরবেলা নাচের আসর ভাঙলে ওদের বাসায় গেলাম। বললাম—কাজলরেখা কই?

দলের লোকেরা আমাকে চিনে রেখেছিল আসর থেকে। হেসে ওদের দলের মাসী, ওই ছোট মেয়েটির মা বললে—এস বাবা। ওলো টুনী!

—কি মাসী?

—কাপড় ছাড়া হল তোর?

—হল আর। কেন বলতো?

—সেই বাবু লা।

—নাকি? আসছি আমি।

কোনরকমে একখানা কালাপেড়ে ফরাসডাঙার শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে এল। এবং হেসে বললে—আসুন। আপনি তো মোটা মাইনের চাকরে গো। কাশিমবাজারে চাকরি করেন। এখানে জমিদারবাড়ির ছেলে। আবারও বকতে এসেছেন বুঝি?

—চুপি-চুপি বলব।

—মাসী, সর গো বাছা। বাবু চুপি-চুপি বলবে।

বললাম—আংটিটা তোমাকে দিতে এসেছি।

—বকশিশ?

—না।

—তবে?

—সে-সব কথা এখানে হবে না; তোমার কুঞ্জে যেদিন যাব সেদিন হবে।

সে হেসে বলেছিল—

কালা তোর তরে কদম তলায় চেয়ে থাকি।
পথের পানে চেয়ে-চেয়ে ক্ষয়ে গেল
আমার কাজল-পরা জোড়া আঁখি।
চেয়ে থাকি।

দেখবেন, যেন সত্যিই আমার চোখের কাজল ধুয়ে না যায়। হ্যাঁ!

অবশ্যই বলতে হবে না যে, এসব ওদের মুখস্থ করা বক্তৃতা। জগতরঙ্গমঞ্চে নটী সেজে যেদিন বুকের কাঁচুলী চোখের কাজল ঠোঁটের রঙকে সার করে স্টেজের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে ঢুকেছে সেদিন থেকে ক্রমাগত একই কথা সকল জনকেই বলে আসছে। কিন্তু সেদিন তা আমার মত ওভারবার্ণ্ট ব্রিক অর্থাৎ ঝামা হওয়া মন—এই ক্লীন মুনেরও মনে হয়নি।

নির্মলের চিঠি অনেক বড়। তা থেকে তার কাজলরেখার মাপ নিয়ে ছবি আঁকতে গেলে সিনেমাঘরের দেওয়ালে আঁকা ছবি হয়ে যাবে।

নির্মল মুখে কাটা-কাটা কথা বলে (অন্ততঃ এককালে বলত), কিন্তু তার ইমোশনের চেহারা কেমন, সেটা আগে কখনও দেখিনি। তার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ দেবার সময় একটা চেহারা তার দেখেছিলাম বটে, কিন্তু টুনুর সম্পর্কে যা সে লিখেছে, তা একেবারে আলাদা কাণ্ড। আলাদা এবং এলাহি।

সে বাদ দিয়েই তার সারাংশ নিয়ে টুনুর একটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করছি।

টুনু, বাঈ বা বিবি, ছুটোর একটাও নয়। টুনু নেহাতই খ্যামটাউলী। তবু বাজারে ওর খাতির ছিল গাইয়ে বলে, এবং তার সঙ্গে রূপও ছিল। লোকে বলত টুনুবাঈ বা কাজলবিবি।

যখনকার কথা হচ্ছে, কাজলবিবির বয়স তখন বছর তিরিশ হবে। কিন্তু ধরা যেতো না। মনে হ'ত অনেক কম। বাইশ-তেইশ।

নির্মল লিখেছে, কি ধরনের চেহারা জান? বেতের মত। ছিপছিপে। একটু কাঠ-কাঠ মনে হ'ত কিন্তু তাতেই ওর রূপের খোলতাই হয়েছিল বেশী। মুখখানা একটু লম্বাটে হয় এমন চেহারায়; সেই লম্বাটে মুখে নাকটা ছিল যেন মাপে একটু ছোট, ডগাটা একটু টেপা, যেন একটু গোল হয়েছে ডগাটা এবং চোখ ছুটো আশ্চর্য। সে যেন আশ্বিন মাসের ছুটো জলভরা বিল। তারা ছুটোকে দেখে মনে হ'ত ছুটো নিটোল ব্ল্যাক মুন জলে স্থির হয়ে ভাসছে। গাল একটু ভাঙা, চোখের কোলে হনুর হাড় দেখা যায় কিন্তু তা উঁচু নয়।

দেখে মনে হয় সত্যযুবতী। এবং দেহে একটু কাঠ-কাঠ শক্ত ভাব। যাক, নির্মলের বর্ণনা থাক।

আগেই বলেছি, বাজারে ওর গাইয়ে বলে খাতির ছিল। বৈঠকী গান কাজলবাঈ মোটামুটি ভাল গাইত। গলাখানা ছিল একটু তীক্ষ্ণ কিন্তু খেলতো খুব ভাল।

নির্মল প্রথম দিন ওর বাড়িতে গিয়ে বসেছিল, পকেটভর্তি টাকা নিয়ে। লোকে বলত, নির্মল মোটা মাইনে পেত, কিন্তু সে কত? ছুশো টাকা হলেই ১৯১৫/১৬ সালে কপালে-চোখ-তোলানো রকমের মোটা মাইনে হ'ত। প্রথম মহাযুদ্ধ সবে লেগেছে তখন। তখনও একশো পঁচিশ টাকায় ভাল বিলিতি বাইসিক্ল মেলে। নির্মল প্রথম দিনই কাজলবাঈকে একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে মিলার কোম্পানির সাড়ে তিন অক্টেভ অর্গান কিনে দিয়েছিল।

আবার নির্মলের চিঠি থেকে না তুলে পারছিনে। না-হলে ঠিক বুঝানো যাবে না। নির্মল লিখেছে—মতলব ছিল স্রেফ জাহানকোষা তোপের এক গোলাতে কেল্লা ফতে করে ছেড়ে দেব।

কাজলবাঈকে বোকা করে দেব তার জন্তে হেভেলং ঝাঁপ দিয়েছিলাম আমি। এবং সে ঝাঁপ একেবারে কালীদহের জলে।

নির্মল লিখছে—ঠাকুরদা, নির্মল এক জায়গায় সত্যিই নির্মল ছিল। টাকাকড়ির ব্যাপারে ভেরি স্ট্রেট এ্যাণ্ড ক্লীন। স্টেনলেস স্টিলের মত মেটাল। ওয়ান পাইস ধার পর্যন্ত ছিল না কারুর কাছে, মিথ্যে বলব না, বন্ধু-বান্ধবের পাঁচ টাকা দশ টাকা নিয়েছি, নিয়ে দ্রব্যি মানে কারণবারি কিনে খেয়েছি, সে টাকা নিয়েই সঙ্গে-সঙ্গে বলে দিয়েছি, দেখ বাবা ব্রাদার-ইন-ল, এ টাকা আমি kill করে দিলাম, অর্থাৎ মেরে দিলাম। নো ক্লেম তোমার।

এর থেকে একটুকুও বেশী নয়। আজ নগদ কাল ধার দোকানে লেখা থাকে। কিন্তু তোমার এই গ্র্যাণ্ড চাইল্ড তখনও পর্যন্ত আজ নামক দিবসটিতেই বেঁচে ছিল; কাল নামক ধারের দিনটির প্রভাত হতে দেয়নি। সেই দিন প্রথম কালকের প্রভাত উদয় হল। নির্মলচন্দ্রের প্রভা ফেড আউট করলে। দোকান থেকে ধারে কিনলে ওই অর্গানটা, আর বেনারসী শাড়ি, ব্লাউজপিস প্রভৃতি উপহারদ্রব্য। তারও উপর যা করলাম তাতে, তাতে ব্ল্যাক সীতে চান মানত করতে হল clean moon-কে। আপিসের টাকা সরালাম।

অসুবিধে ছিল না। আমার উপরওয়ালারা তখন আমাকে লুকিয়ে এ কর্ম করছেন; আমিও নির্ভয়ে দেড়শো টাকা পকেটে পুরে উপর-ওয়ালার হাতখানা চেপে ধরে বললাম—কেমন কাজ হয়ে গেল সার আজ থেকে।

সন্ধ্যাবেলা টুনীর বাড়ি গেলাম বেশ সেজেগুজে, কিন্তু দোরবন্ধ গাড়িতে চেপে। টুনী সেজেগুজে অপেক্ষা করছিল। তরিবৎ করে সাজিয়ে রেখেছিল নানান দ্রব্য। ফুল, ফলকাটা। নানারকম সেদ্ধ স্যালাড, মাছভাজা, মেটে চচ্চড়ি, তার সঙ্গে বেঁটে বোতল।

আমাকে দেখে হেসে বললে—বসুন।

আমি বসলাম, সে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম—তুমি বস। সে বললে—কোথায় বল? হৃদ্‌কমলে না চরণতলে? তার পর বললে—আমরা তো ভাই যতদিন পায়ে রাখ ততদিন দাসী নইলে কেউ নই।

* * *

সেদিনের যে বিবরণ নির্মল দিয়েছে তা তুলে দিলে পাঠকের চোখ বন্ধ হবে। শীতের দিনে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠবেন। কেউ-বা অশুচিবোধ করতেও পারেন। নির্মল টুনীর কাছে প্রথম দিনেই হার মেনেছে।

এবং যা লিখেছে তার সারমর্ম হল, ঠাকুরদা, এ মেয়েটার মূল খুঁজতে গেলে জীবন-সরোবরের তলায় যে পাঁক জমে আছে, তারও তলদেশে যেতে হবে। এবং গিয়ে দেখা যাবে যে, পৃথিবীতে কিংবা আমাদের এই বঙ্গদেশে মনুর যে-কন্যাটি বহুজন পরিচর্যা লালসায় এবং নেশায় পথের ধারের গৃহ-দ্বারটিতে দাঁড়িয়ে কুটিল কটাক্ষে পথচারী পুরুষকে আহ্বান করেছিল, তারই অবিচ্ছিন্ন বংশানুক্রমে এসেছে এই কন্যাটি।

নির্লজ্জতা এবং বারবনিতার গুণাবলীর প্রাচুর্যে এবং দক্ষতাতেই শুধু নয়, অর্থশোষণ-দক্ষতা এবং পারঙ্গমতাতেও বটে।

নির্মল নিয়ে গিয়েছিল নগদ দেড়শো টাকা। সে আমলের দেড়শো টাকা। ফিরে এসেছিল শূন্য পকেটে।

নির্মল লিখেছে, অতঃপর এক দিবসেই বা প্রথম দিবসেই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবার কথা, হওয়াও উচিত ছিল, কিন্তু আশ্চর্য ঠাকুরদা, ওই যে আশ্চর্য মনোহারিণী বারবনিতা-কন্যাটি আমার চোখে যে কি কাজল পরিয়ে দিলে, তা কি বলব, চোখের ছানি অপারেশন হল কিন্তু দুনিয়ায় সাদা আলো দেখতে পেলাম না।

সেই বিল্বমঙ্গলের ব্যাপার, ঠাকুরদা! কিন্তু চিন্তামণি, তুমি অতি সুন্দর।

তুমি বারাঙ্গনা, তুমি হৃদয়হীনা, তুমি কখনও ভালবাসনি, তবু—তবু চিন্তামণি, তুমি অতি সুন্দর।

*　　*　　*

ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার।

আমাদের এই বঙ্গদেশে কলকাতা মহানগরীতে রামবাগান, সোনাগাছির বিবরণ নিয়ে যাঁরা নেড়ে-চেড়ে দেখেছেন, তাঁরা জানেন এই পাড়াটির এলাকার মধ্যে যে টাকার লেন-দেন হয়েছে, তাতে রাজার রাজ্য বিকিয়ে গেছে, জমিদারের জমিদারি নীলাম হয়েছে, ব্যবসাদারের ব্যবসা হয়েছে ভরাডুবি। কত মর্যাদাময় মানুষ নিজের মর্যাদা পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে শেষ জীবনে এদেরই পাড়ায় কারুর বাড়ির এক-পাশে ভিক্ষুকের মত পড়ে থেকেছেন। কত খুন হয়েছে, কত জখম হয়েছে, কত জোচ্চুরি হয়েছে, জুয়াখেলার এত বড় আসর আর পড়েনি এদেশে, জীবন দান রেখে জুয়ো চলেছে। খুন-জখম এ এলাকায় যত হয়েছে বাকী কলকাতার খুন-জখম জুড়েও তার সমান হবে না।

বিচিত্র কথা এই যে, যাদের পায়ের তলায় পুজো হিসেবে এই এত

ধন-সম্পদ, রাজ্য-জমিদারি, বুকের রক্ত ঢালা হয়েছে, তারাও শেষ জীবনে ভিক্ষে করেছে, নয় খুন হয়েছে। রূপ-যৌবন যতক্ষণ থেকেছে ততক্ষণ এরা সোনার খাটে বসে মুক্তোর ঝালর দেওয়া কিংখাবের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে মুক্তোভস্ম-করা চুন দিয়ে সাজা পান খেয়েছে, সারা অঙ্গে হীরা-পান্না, মণি-মুক্তো ঝলমল করেছে; বিড়াল-কুকুরের বিয়েতে হাজার-হাজার টাকা খরচ করেছে, ঘুড়ির মরসুমে দশ টাকার নোট গেঁথে ঘুড়ি তৈরি করে উড়িয়েছে। সে একখানা নয়, খানার পর খানা। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সে-ই ভিক্ষে করেছে এবং মরবার পর ঘাটে গিয়ে চিতার কাঠের কড়ির অভাব হয়েছে। ওরাই নিজেরা চাঁদা দিয়ে কোনোরকমে দেহটা অর্ধদগ্ধ করে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে।

তবে নির্মলের মত যারা গিয়ে ওদের পায়ে সব ঢেলে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের কথাই আমরা বড় করে দেখেছি এবং বলেওছি। এবং এও সত্য যে, যারা এই সব দেহ-ব্যবসায়িনীদের আবাসে গিয়ে একটি রাত্রির মত তার দেহের জন্য সমুচিত পণ তারা দিয়েছে, যতদিন অন্ততঃ এই দেহ-কেনাবেচা সমাজ এবং রাষ্ট্রবিধানের সম্মতি অনুসারে প্রচলিত থাকে, ততদিন কোন অপরাধ করে না। অপরাধ হয় তখনই যখন টুনির মত কেউ রাক্ষসী-গ্রাসে খরিদ্দারকে কৌশলে ঠকিয়ে তাকে সর্বস্বান্ত করে অথবা খরিদ্দারদের কেউ যখন গভীর রাত্রে একান্ত অসহায় অবস্থায় পেয়ে ওই হতভাগিনীদের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে যায় তখনই।

* * *

নির্মলের দীর্ঘপত্র হ্রস্ব করে বলাই ভাল। কারণ, মেয়েটিকে নির্মলের এত ভাল লেগেছিল যে, এই মেয়েটিকে দীপ্তিতে এবং বর্ণ-সুষমায় উজ্জ্বলতম ও মোহিনীরূপে অনুরঞ্জিত করে ফুটিয়ে তোলবার জন্য এত বেশী উজ্জ্বল রং এবং বার্নিশ যুগিয়েছে যে তার সবটা ব্যবহার করতে গেলে টুনু আর খেমটাউলী থাকবে না। শাপভ্রষ্টা অপ্সরা হয়ে যাবে। অথবা বারাঙ্গনা-জন্ম নিয়ে যেন লীলাপরায়ণা দেবীতে পরিণত হয়ে শেষ পর্যন্ত তেল সিন্দুর মেখে কোন গাছতলায় নিজের আসন পাতবে। নির্মলকে বিশ্বাস নেই, ও সেখানে দেবাংশী হয়েও বসতে পারে।

নির্মল তার চরিত্রের আরও কতকগুলো বর্ণনা দিয়েছে। কিভাবে টুনু তাকে উত্তরোত্তর মোহ-মুগ্ধ করেছে তারও বিবরণ আছে।

কতখানি মদ্যপান করে সে স্থির থাকতে পারত, মদ্যপান করে নির্মল ক'দিন বেহুঁশ হলে সে কেমন সেবা করেছিল, কোনো একদিন গ্রীষ্মের চাঁদনী রাত্রে গঙ্গাবক্ষে নৌকার উপর কেমন সে নেচেছিল, 'এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভালো—সে মরণ স্বরগ সমান' গানখানা গাইতে গাইতে কতখানি চোখের জল ফেলেছিল—সেইসব বিবরণ সে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গেছে। মধ্যে মধ্যে লিখেছে—গ্র্যাণ্ডপা, তান্ত্রিকের ছেলে তান্ত্রিক আমি—মায়ের নাম নিয়ে দিব্যি করে বলছি—এক বিন্দু বাড়িয়ে বলছি না।

সে লিখেছে শুধু একটা জিনিস ভারী খারাপ ঠেকত।

সেটা হল কাজলের টাকা-টাকা এবং জিনিস-জিনিস স্বভাব। ঠাকুরদা, আমি ব্যবসা থেকে ব্যাকডোর দিয়ে দু-হাতে টাকা সরিয়ে ওর হাতের আঁজলা ভরে দিয়েছি—ওর হাত ছাপিয়ে পড়ে গেছে, মেয়েটা উপুড় হয়ে পড়ে দু-হাত টেনে নিয়ে বুকের তলায় ঢাকা দিয়ে আবার দু-হাত পেতেছে—দাও। আরও দাও। আর মুখে কী মোহিনী হাসি! সত্যি সত্যিই মধ্যে মধ্যে মেয়েটা হাত পেতে বলতো—দাও না আরও কিছু। দেখ না, কেমন রাঙা হাত পেতেছি।

আমি বুঝতাম না তা নয়। বুঝতাম। বুঝতাম ওই হাসির যে মূল্য আমি দিলাম—তার জন্য একদিন আমাকে হয়তো বিষ খেতে হবে। কিন্তু তা হোক। এটা ওদের ধর্ম।

শুধু তাই নয়। প্রায় নিত্য সন্ধ্যেবেলাই ওর বাড়ি আসতাম—আমি না এলে ভাল লাগত না। আসবার সময় কিছু জিনিস নিয়ে আসাই ছিল আমার শখ বা চালও বলতে পার। মিষ্টি, ফল এই সব দ্রব্য আর কি। যারা খেতে ভালবাসে তারা খাওয়াতেও ভালবাসে। বেলডাঙ্গা কান্দীর মনোহরা আমার ভারি ভাল লাগে; আমি আনাতাম —একেবারে খাস জায়গা থেকে। আড়াই সের পাঁচ সের-এর কমে আনানো যায় না। তাই আনিয়ে নিয়ে যেতাম। তাছাড়া কমলালেবুর সময় কমলালেবু—আমের সময় আম; কপি, মটরশুঁটি তখন এত সাধারণ এবং সুলভ জিনিস হয়নি, ঠাকুরদা। শীতের সময় কপি, মটরশুঁটি, গলদা চিংড়ি, ভেটকির দাম ছিল। নামেই রীতিমত জিভে জল সরতো। সেইসব দ্রব্য নিয়ে যেতাম। ইলিশের সময় ইলিশ নিয়ে গিয়ে ঠাকুরদা সে একেবারে গায়েহলুদ ফুলশয্যের তত্ত্ব কিংবা ইংরেজ কোম্পানির বড়-সাহেবের ক্রীসমাসের ডালি সাজিয়ে দিতাম। কোন কোন দিন শাড়ি

বা শৌখীন জিনিস কিছু। কিন্তু টুনু খাবার জিনিসেই খুব বেশী খুশী হ'ত। পাড়াটায় এর জন্য আমার নাম ছিল। এবং আমার ইচ্ছে ছিল নামটা আরও সৌরভ ছড়াক। হোক না কেন ইভনিং ইন প্যারিসের গন্ধের সঙ্গে স্কচ হুইস্কি কি আমাদের দেশী রামের সুরভি-মেশানো গুরুচণ্ডালী গন্ধ। আমার ইচ্ছে হ'ত, এত জিনিস দিয়ে ও কি করবে —ও বিলি করুক। করত না এমন নয়। তা করত। সেটা আমার মন রাখতে করত। এবং কিছু বিলি করেই সরিয়ে রাখত—বলত—থাক। ও হবে'খন। যেমন তোমার কাণ্ড! কি হবে ওদের খাইয়ে? —কতদিন বলেছি—তোমারই নাম করবে।

আঃ! তাতে আমি চতুর্ভুজ হয়ে গেলাম আর কি! দরকার নেই।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম,—আমি আবিষ্কার করলাম না;—এ ও সে, কে বা কারা যেন কানের কাছে ফিসফিস করে কিছু বলে গেল। বলতে পার ইয়ার ড্রামে—ফিসফিস করে কানে কু কি সুড়সুড়ি দিয়ে বলে দিলে—ইডিয়ট কোথাকার! টু এ্যাণ্ড টুতে ফোর হয় জান না? গ্যাঞ্জেসের ওয়াটার সব বাঁধ ভেঙে সমুদ্রে যায় তা বোঝ না? বাবা স্বয়ং শিব-যে-শিব সে জটার মধ্যে বেঁধে রাখতে পারলে না; মহারাজ শান্তনু—ভারতের সিংহাসনে বসিয়ে বাঁধতে পারলে না। সবখান থেকে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে এসে তবে সে শান্ত। এ তো তাই বাবা। খোঁজ কর, টুকরী দারুণে মালগুলো যায় কোথায়? কে খায়?

খোঁজ পেলাম। এরপর আর খোঁজ পেতে বিলম্ব হবার কথা নয়। সংসারে কেউ কারুর কাছে কিছু লুকোতে পারে না, আসলে আমরাই বোকার দৃষ্টি দিয়ে দেখি—অর্থাৎ দেখেও দেখিনে বা মানেটা বুঝতে চাইনে। বলতে পার চোখে ভেল্কি লাগিয়ে দেয়। ভেল্কিই বটে। এতদিনে বুঝলাম খাবার জিনিসগুলো যায় কোথায়।

সেগুলো যেত একজনের বাড়ি—সে নাকি ছিল ওর উপার্জনের বাজারের বাইরের মানুষ, অর্থাৎ ভালবাসার লোক, জীবনের গোপন নায়ক। যার আনাগোনা খিড়কি-পথে এবং রাত্রির সেই গভীরতম সময়ে, যখন মানুষেরা প্রায় একশো জনের মধ্যে আটানব্বুই জন ঘুমোয়। জেগে থাকে দু'জন। তার একজন এসে দরজায় টোকা দেয় এবং অন্যজন সেই টোকার উত্তরে নিঃশব্দে উঠে এসে দরজাটি খুলে দিয়ে হেসে বলে—এস।

এবার বুঝলাম—কেন টুনু আমার কাছে আবদ্ধ হয়ে থাকতে রাজী হয় না। আবদ্ধ বুঝেছ ওল্ডম্যান? বাংলা মানেটা ভালগার। ইংরিজী শব্দটা বলি—। যাকে আমরা কেপ্ট 'kept' বলি।

নির্মল লিখেছে, কত বার তাকে একান্তভাবে আমার নিজস্ব করে রাখতে চেয়েছি। কিন্তু সে সোজা বলত—না। ও আমি থাকব না। আমার পোষাবে না।

আমি বলেছি—পুষিয়ে দেব আমি। বল না কিসে পোষাবে।

—না। তার মানে টাকা তো দেবে তুমি। হয়তো মোটা টাকা দেবে। কিন্তু টাকাই সব নয়। আমি কারুর কেনা দাসী হতে পারব না। বাবাঃ! সে তো তোমাদের বিয়ে-করা বউ আছে। টাকা দিয়ে কি বউ কেনা যায়? দূর! তা হলেই রঙ চটে যাবে। খড়-মাটি বেরিয়ে পড়বে।

একটু হেসে নরম করে বলত—কেন? এসব বেয়াড়া ঝোঁক তোমার কেন বলতো? এইগুলো ছাড়।

আমি ঠাকুরদা, clean moon নির্মলচন্দ্র যে নাকি একটা অদমনীয় বাক্যবীর বলে সকলজনের দ্বারা স্বীকৃত—সেও নির্বাক হয়ে যেত, ভাবত—বলছে কি?

সে হেসে বলেছিল (একদিনের কথা বলছি)—কি হ'ল? এমন করে তাকাও কেন? দেখ কি?—

—দেখি? দেখি তুমি অতি সুন্দর। কিন্তু—।

—বল। অতি সুন্দর তো চিন্তামণি। কিন্তুটা কি?

—চিন্তামণি তুমি বাঁচলে হয়। হ'ল কি তোমার?

—কি হল?

—বলছ—টাকা সব নয়।

—বলব না? টাকা তুমি বড্ড অপব্যয় কর।

বিস্মিত হয়েছিলাম। অপব্যয়ের জন্য আমার উপর টুনির দরদ দেখে। সব বিবরণ অবগত হলাম। টুনির ভালবাসার লোক আছে এবং সে প্রায় নিত্যই আসে। আসে আমার প্রস্থানের পর।

এ এক বিচিত্র সত্য দেহ-ব্যবসায়িনীদের জীবনে; ওদের জীবনে, ওদের জগতে ও সার্বজনীন সত্য। যারা দেহ নিয়ে ব্যবসা করে তারাই আশ্চর্যভাবে তাদের মনটিকে এক নিভৃতে একান্ত নির্জনে রক্ষা করে—এই জনটির জন্য। দেহ নিয়ে যতই নীলেম হোক না কেন,

যতই দর উঠুক, কাড়াকাড়ি চলুক না কেন, দেহ-ব্যবসায়িনীর মন ধ্যান-মগ্নের মতই শুদ্ধ থাকে ; তপস্যা সে করে বা ধ্যান করে সে না-আসা পর্যন্ত ধ্যানমগ্ন চোখ খোলে না।

নির্মল লিখেছে—ঠাকুরদা, সেদিন আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি টাকায় বাঁধা পড়তে চাও না। কিন্তু তুমি নাকি বিনা টাকায় বাঁধা আছ ? তোমার ভালবাসার লোক—

ঠাকুরদা, সে একেবারে নাগিনীর মত ফণা তুলে দাঁড়াল মুহূর্তের মধ্যে। একেবারে ফণিনী পুচ্ছবিমর্জিত। স্থির চোখে তাকিয়ে উত্তর দিলে ; একবারও জিভে এতটুকুর জন্যে আটকালো না সে উত্তর। বললে—হ্যাঁ, আছে। তুমি আসবার অনেক আগে থেকে আছে। আর তুমি এসো বা না-এসো, সে থাকবে। ইচ্ছে না-হয় তুমি এসো না।

—ভাগ্যবান লোকটি কে ?

সঙ্গে সঙ্গে একখানা ফটো বের করে দেখিয়ে বলেছিল—নাম শুনে কি করবে ; এই দেখ তার ছবি।

সবল স্বাস্থ্যবান একটি যুবকের ছবি। কিন্তু মুখখানা নিষ্ঠুর কঠিন। চোয়ালের হাড় দুটো শক্ত হয়ে উঠে রয়েছে ছবির মধ্যে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—দাম কত লোকটির ? কিস্মত কেত্‌না ?

উত্তরে সেও মুরশিদাবাদী বুলিতে বলেছিল—না ঘাবড়ানা সাব, না তড়পানা। ওর কিস্মত রূপেয়াতে হয় না গো মিয়া। হয় আসনাইতে। ভালবাসায়। তাও ওর নয়, আমার।

নির্মল স্থান-কাল ভুলে গিয়ে একটা কঠিন কথা বলেছিল—একেই বলে জাত—তাই ! মানে বারবনিতা।

সঙ্গে সঙ্গে সাপিনী ছোবল মেরেছিল। আঙুল দিয়ে বার দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল—দরজা খোলা আছে, বেরিয়ে যাও।

আরও কয়েকটা ওই অঞ্চলের কুৎসিত বাদ-প্রতিবাদের পর নির্মল বেরিয়েই এসেছিল। টুনু বিবি বলেছিল—কোনোদিন যদি আমার দরজা মাড়াও তাহলে মেথর দিয়ে জুতো মারাব আমি।

* * *

নির্মল লিখেছে—মোহ ছুটল ঠাকুরদা। সেই চলে এলাম। প্রতিজ্ঞা করে এলাম—ওর বাড়ি আর যাব না আমি। দেখি কে ওকে আমার মত টাকা দেয়। কিন্তু সেটা আমার নেহাতই গর্দভের

মত ভাবা হয়েছিল। কারণ—সংসারে আমার মত গর্দভ আমি 'ওন্‌লি ওয়ান' নই ; আরও অনেক আছে। লক্ষহীরার গল্প জান? যে দেহ-ব্যবসায়িনীটি নাকি প্রতি রাত্রে এক লক্ষ গোল্ড মোহর নিত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—তার ঘরে কোন একটি সিংগল সন্ধ্যায় আগন্তুকের অভাব হয়নি।

গ্র্যাণ্ডপা, দেওয়ালীর সময় শ্যামাপোকার মরণ দেখেছ? একটা আলো জেলে রাখলে সকালবেলা দেখতে পাবে, এক রাত্রে একটা আলোয় যত শ্যামাপোকা মরে পড়ে আছে, তত মানুষ একটা সাধারণ যুদ্ধে মরে না।

থাকগে। যা হ'ল তাই বলি। ঠিক এই সময়েই বেরিয়ে পড়ল যে, আমরা কোম্পানির টাকা নিয়ে বিলকুল বরবাদ করে দিয়েছি। কোম্পানি টলছে। মূলধন সাফ হতে বসেছে।

বসে গেল গোপন তদন্ত।

আমি শেষপর্যন্ত ভেবেচিন্তে ওই মহান পুরুষটি যিনি নাকি এই বঙ্গদেশে কলিযুগে দাতাকর্ণের অবতার হয়ে জন্মেছিলেন তাঁর সামনে গিয়ে হাতজোড় করে দণ্ডায়মান হলাম।

একটু বিষণ্ণ হেসে তিনি বললেন, খালাস তোকে দিচ্ছি। আমি সবই জানি। খবর সবই পেয়েছি। তা তুই চলে যা। চাকরি ছেড়ে রেজিগ্‌নেশন দিয়ে চলে যা এখান থেকে। মামলা-মকদ্দমা হবে না—আমি বলে দেব।

শুধু আমার জন্যেই নয় ঠাকুরদা, আরও বড় বড় মক্কেল ছিলেন। তাঁদের পুণ্যে বা তাঁদের জন্যেও বটে। কিন্তু সে সব অন্য বিবরণ। বড় মক্কেলরা যে মার দিয়েছিলেন, যে খামচ বসিয়েছিলেন, সে হ'ল বাঘের থাবার খামচ। সেখানে আমাকে বড়জোর নেকড়ে বলতে পার। আমি আর কতটুকু মারতে পেরেছিলাম? হিসেব করে দেখেছি, তা হাজার-দশেক কি বড় বেশী হলে হাজার-বারো, তার বেশী নয়। তবে সে তোমার আজকের কথা নয়—তখন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়েছে। পুরো ইনফ্লেশন চলছে এবং সামনে আসছে ডিপ্রেশন। গান্ধীজী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করছেন—সেই সময়ের ব্যাপার। বারো বা দশ যত হাজারই হোক, তার দাঁতগুলো খুব লম্বা এবং শক্ত, সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক রকমের ধারালো ছিল।

থাকগে, মহাপুরুষকে মনে মনে প্রণাম করে টুপিকে সেলাম

করে চলে এলাম ওখান থেকে। 'ফেস' দেখাতে লজ্জাও হ'ল আর মেয়েটাকেও ভয় হয়ে গেল। কানাঘুষো শুনলাম, টাকা ভাণ্ডার বিবরণটা নাকি ওরই এই নবনাগর যথাস্থানে কানে তুলে দিয়েছে।

চলে এলাম কলকাতায়। জীবনে নতুন দান ফেলব। এ-লাইফে যা করি তা করি, কিন্তু আর ওই ভাড়াটে-জলের গ্লাসে মুখ দেব না। বউ মরে গেছে। নতুন নিজস্ব গ্লাসেও দরকার নেই।

তান্ত্রিকের ছেলে, কারণ আছে আর তারা আছে—'তনয়ে তারো তারিণী' বলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। শেষ পর্যন্ত না হয় একটা কোন বাবা-টাবা সেজে বসব। ব্যস!

ওই তার কিছুদিন পর তুমি এলে শ্বশুরের আপিসে। প্রথম দিনের সে-দেখা নিশ্চয় মনে আছে তোমার। তোমার কাছে কারণের খরচ আদায় করেছিলাম।

আমি নিশ্চয় জানি, তুমি আমার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলে—আমি নারী সন্ধান করে ফিরি কি না। বলেছিল আমার এস-কে খুড়ো।

আমিও তোমার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলাম। এবং হতাশ হয়ে হ্যাপি হয়েছিলাম, এটা এতকাল পরে তোমাকে জানাচ্ছি। বিশ্বাস কর। হতাশ হয়ে হ্যাপিই হয়েছিলাম আমি।

যাকগে। টুনীর কথা বলি।

মন থেকেই মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম টুনীকে। কিন্তু তা ঠিক পারিনি। একটা রাগ-বিদ্বেষ ঘৃণা-ঘৃণা জড়িয়ে ওকে মনের আঁস্তাকুড়ে সরিয়ে দিলাম। মনের স্মৃতির যাদুঘরে একটা ডাইনী বা রাক্ষসীর মত তার মূর্তিটা দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ গ্র্যাণ্ডপা—সব গোলমাল হয়ে গেল। মেয়েটা খুন হয়ে গেল।

এসব মেয়েরা খুন হয়; সেকথা তো জান এবং আমিও চিঠিতে বলেছি। টুনুও খুন হ'ল। কিন্তু ওতেই সব উল্টেপাল্টে তছনছ হয়ে কাণ্ড হয়ে গেল। পিশাচীর মত টুনীর কালো জীবন ভেদ করে একটা আলোর ঝলকের মত টুনীর আত্মা আকাশে মিলিয়ে গেল। আমার সৌভাগ্য আমি সেদিন শহরে উপস্থিত ছিলাম।

সকালবেলায় চা খাচ্ছি—একজন বন্ধু এসে খবর দিলে—টুনী খেমটাওলী খুন হয়ে গেছে কাল। তোমার টুনী হে!

প্রথমটা ঠিক ধরতে পারিনি। কারণ মন থেকে ওকে একেবারে মুছে ফেলবার চেষ্টাই করেছি। তবু খট্ করে লাগল কথাটা। তোমার টুনী হে।

খট্ করে লাগবার পর চমকে উঠলাম। কে? কে খুন হয়েছে?

সে আবার বললে—টুনীবিবি, কাজলবাঈ। তোমার টুনী। সেই টুনী।

মনে পড়ল। মনের যাদুঘরে একটা মায়াবিনী ডাইনীর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমি একটা কালো কাপড়ের ঢাকনি দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম আড়াল করে। সেটা খসে পড়ে গেল এক মুহূর্তে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কে খুন করলে? কি ব্যাপার?

—ব্যাপার আবার কি? সেই পুরাতন গল্প। রাত্রে কে খুন করে গেছে। সকালে দেখা গেল ঘরের মেঝের উপর রক্তমাখা দেহে পড়ে আছে। নিঃশেষ হয়ে মরেনি, হাসপাতালে নিয়ে গেল, দেখে এলাম স্বচক্ষে।

—কিন্তু খুনটা করল কে?

—কে আবার? লোকে বলছে তার সেই ভালবাসার মানিক। সে আসত রাত্রি দেড়টা-দুটোয় এবং শেষরাত্রিটা থেকে চলে যেত। সে ছাড়া আর কে হবে?

—সেই যে-লোকটার বাড়িতে জিনিসপত্তর পাঠিয়ে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করত টুনী?

—হ্যাঁ। সেই মহাপুরুষ। অন্তত: তাই সকলে বলছে।

—ধরেছে তাকে?

—খুঁজছে। বাড়িতে তাকে পায়নি।

নির্মল লিখেছে—ঠাকুরদা, টুনী হাসপাতালে গিয়ে বাঁচল না, মরল।

একটা বেলা বেঁচে থেকে মরল। হয়তো ওই ভালবাসার লোকটাকে বাঁচাবার জন্যেই মেয়েটা ছোরা খেয়েও ওই একটা বেলা বেঁচে ছিল।

মেয়েটা ডাইং ডিক্লারেশন দিয়ে গেল—আমার ঘরে কাল একজন অজানা বাবু এসেছিল। টাকা খরচ করেছিল অনেক বলে সারা-রাত্রিই ঘরে রেখেছিলাম। তাছাড়া আমার ভালবাসার লোক কাল

তার নিজের বাড়ি....গ্রামে গিছল; তাই লোকটাকে রেখেছিলাম। শেষরাত্রে আমার মুখ চেপে ধরে গয়না খুলে নিচ্ছিল—আমি তাকে জাপটে ধরেছিলাম। সে শেষে একখানা ছোরা—আমার বালিশের তলায় থাকত যেটা, সেটা বের করে বুকে বিঁধে দিয়ে চলে গেছে।

এরপর আর সে মুখ খোলেনি। মুখ বন্ধ করেই চোখ বুজেছে।

* * *

ভালবাসাটা অত্যন্ত আশ্চর্য বলতেই হবে।

তবে এর জন্যেই কিন্তু টুনী সম্পর্কে এমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে চিঠি লেখেনি নির্মল। টুনীর এই আচরণ-বৈচিত্র্যের জন্যেই বিচিত্র আসরে টুনীর ছবি বা চরিত্রটিকে স্থান দিতে অনুরোধ করেনি সে। সে লিখেছে সেই হারামীকে ভালবেসে বাঁচিয়ে মরেছে বলে আমি বিগলিত হইনি। এত অল্প তাপে আমি গলিনে। ননীর দেহ আমার নয়।

আরও আছে। তার জন্যই সে টুনীর আচরণের সকল ক্ষুদ্রতা, সকল তিক্ততা ভুলে গিয়ে তাকে স্মৃতির যাদুঘরে বিস্ময়ের আসনে বসিয়েছে। টুনীর রূপকে যত ভালবেসেছিল, তার স্মৃতিকে সে তার থেকে বেশী ভালবেসেছিল। লিখেছে—'ঠাকুরদা, সে টেম্পারেচারে রীতিমত ভুল বকে। বলতে পার—১৭৫ ডিগ্রী।'

'পরে সব জানতে পারলাম ঠাকুরদা। আগে জানতে পারলে ব্যাপারটা অন্যরকম হ'ত।'

টুনী দেহ-ব্যবসায়িনীর কন্যা, দেহ-ব্যবসায়িনী নয়। ওর জন্ম নারীত্বের এই লাঞ্ছনার পঙ্কপল্বলে নয়। জন্মেছিল ও শ্যামসাগর বা রামসাগর বা দেবীসাগরের মত কোন একটা প্রতিষ্ঠা করা দীঘি-সরোবরে। টুনীর জন্ম গৃহস্থঘরে, ব্রাহ্মণকুলে। নেহাৎ দরিদ্র-কন্যাও নয়, দরিদ্র-ঘরের বধূও নয়। তবুও টুনীকে হয়তো ভাগ্যের নির্দেশে হতে হয়েছিল খ্যামটাওয়ালী। একদা প্রথম যৌবনে বিবাহের দুটো বছরের মধ্যেই গৃহত্যাগ করে এ-পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়েছিল ওই ভালবাসার লোকটি যে শেষ পর্যন্ত হ'ল তার প্রাণহন্তা, তারই হাত ধরে। সে ছিল তার দেওর। স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর।

আরও একটু খুলে বলি ঠাকুরদা।

কাল হ'ল টুনীর গান-পাগলামি।

টুনীর বাপের বংশে ছিল কয়েক পুরুষ ধরে অবিচ্ছিন্নক্রমে প্রবাহিত সঙ্গীত-বিদ্যার বংশগত বা রক্তগত ধারা। ওর পিতামহ ছিল খুব বড় তবলাবাজিয়ে, গাইতেও পারত; বাপ ছিল সুকণ্ঠ গায়ক। টুনী এবং টুনীর ভাই-বোন—এদেরও কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল সুর, মস্তিষ্কে ছিল জন্মলব্ধ সুরবোধ এবং সঙ্গীতের ব্যাকরণজ্ঞান। আর সারা অন্তর ভরে ছিল একটা গান-পাগলামি। একটা দুর্নিবার আকর্ষণ। গান শুনলেই শিখে ফেলত। এবং ঘরকন্নার কাজ করতে করতে গুনগুন করে সেই গান গাইত আপন মনে। বাপের গ্রামে সঙ্গিনীদের মধ্যে নাচ দেখাত, রঙ্গ করত, মেয়ের বিয়ের বাসরে যেচে গিয়ে গান শুনিয়ে আসত বরকে।

একাল হলে বাপ এ-মেয়ের বিয়ে দিত না; মেয়েও বিয়ে করত না, ঠাকুরদা। গ্রামোফোন কোম্পানি, রেডিয়ো, ফিল্মের প্লে-ব্যাকেই মেয়ে মেতে থাকত এবং বাপও অর্থ এবং গৌরবের জন্য মেয়ের বাপ হয়েও কৃতার্থ হ'ত। মেয়েটার বোধহয় ওই গানের পথটাই ছিল ভাগ্যের পথ। ওরা হয়তো সতীও নয়, অসতীও নয়—ওরা গান গাইতে আসে। তার জন্যে ভাগ্যে যা ঘটে, তাই ঘটে; ওদের অঙ্গে দাগ অবশ্য লাগে, কিন্তু সে চাঁদের কলঙ্কের মত।

থাকগে ঠাকুরদা, মতামত নিয়ে বেশী কচলাকচলি করব না, তেতো হয়ে যাবে, তার থেকে যা ঘটেছিল তাই বলি।

গেরস্ত ঘরের মেয়ে। যে সে জাত নয়, বামুনের ঘর। এবং সে-কাল। মেয়ের গান নিয়ে যখন ধুয়ে খাবার কোন পথ নেই, বরং যুবতী মেয়ে গান গাইতে পারে এবং গাইতে ভালবাসে কথাটা রটলে যখন বিয়ের পথে গাঁট পড়বার আশঙ্কা, তখন বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল বাপ। বাপকে দোষ দেবার কিছু নেই। জলে ফেলে দেওয়ার মত বিয়ে দেয়নি। ভাল বিয়ে দিয়েছিল। দস্তুরমত লেখাপড়া-জানা পাত্র এম-এ ফেল। একটা ইস্কুলের এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। বয়স একটু হয়েছে; বছর সাতাশ-আটাশ। প্রথম পক্ষের স্ত্রী সন্তান হতে গিয়ে সদ্য মারা গেছে। একটু বয়স্কা মেয়ে খুঁজছিল, টুনীকে 'পছন্দ হ'ল। বিয়ে হয়ে গেল। লোকে বললে—ভাগ্যিমানী মেয়ে। এম-এ-পড়া বর হ'ল গো। দেখ কেমন পাতা-চাপা কপাল।

পাতা-চাপা কপাল বটে। যে-কপালটা বাইরে ছিল, সেটা পাতার মতই উড়ুক্কু ছিল। এক ঝাপটাতেই সেটা উল্টে গিয়ে আসলটা বেরিয়ে পড়ল।

ওই যে এম-এ পাস বরটি যিনি ইস্কুলের এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার তিনি লেখাপড়া-জানা ব্যক্তি তো। তার উপর মাস্টার। তার উপর ১৯১০।১১ সালের শিক্ষিত ব্যক্তি। সে-কালের ফ্যাশন ছিল স্ত্রী-বিয়োগের পর বিয়ে না-করা। করলেও, বিগত স্ত্রীর বিরহে আধা-সন্ন্যাসীর মত থাকা। এবং নববিবাহিতার দিকে না-তাকানো।

নির্মল বেশ লিখেছে এখানটায়—'ঠাকুরদা, আমাদের মনসার ব্রতের কথায় আছে, মর্ত্যের কন্তে বেনে বেটীকে স্নেহবশে নাগরাজ্যে এনে মা-মনসা তাকে একটা জ্বলন্ত উনোন, এক কড়া দুধ, একটা হাতা এবং হাজারটা বাটি দিয়ে বললেন—এই নাও উনোন নাও, কড়াভর্তি দুধ নাও; নিয়ে দুধ নাড়ো, দুধ চাড়ো, সহস্র নাগের সেবা কর। সবদিক পানে তাকিয়ো, শুধু দক্ষিণ দিক পানে তাকিয়ো না।....ব্যাপারটা ঠিক তাই হ'ল। এই মাস্টারমশায়টি মেয়েটিকে গ্রহণ করলেন কিন্তু নিজেকে দান করলেন না। তাকে বাসার ভাঁড়ার দিলেন, রান্নাঘর দিলেন, উল দিলেন, কাঁটা দিলেন, সেলাইয়ের কলও একটা দিলেন; আর দিলেন কিছু বই। স্কুলের বই। বললেন—পড়ো তুমি। আমি পড়াব। আর বললেন—আমি এম-এ পরীক্ষাটা দেব, আমাকে যেন বেশী বিরক্ত করো না।

চঞ্চলা সঙ্গীতানুরাগিণী মেয়েটি কি করবে?

তাও সে নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণ দিকের দরজাটা খোলেনি। ওদিকে সর্বনাশা বাতাসকে সে নিজে থেকেও ঢুকতে দেয়নি। তা দেয়নি। কিন্তু তবু ঢুকল। হ'ল কি জান?

মাস্টারের পোষ্য ছিল একটা বখাটে খেলোয়াড় ভাই। ডাম্বেল ভাঁজতো আর ফুটবল খেলত। আজ এখান কাল ওখান করে খেলে ঘুরে বেড়াত। মুসাফেরখানা ছিল দাদার বাসা। ফিরে-ঘুরে এসে মাসে কয়েকটা দিন শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিত। রেস্ট নিত। পায়ের সেবা করত। কখনও নুনের পুঁটলির সেঁক, কখনও গুলার্ডস্ লোশন, কখনও নিজেই পায়ে মালিশ করত। আর একটা বাতিক ছিল—কলকাতায় নাটক দেখা এবং সেই সব নাটক সুর করে পড়া।

বড় ভাই কড়া মানুষ, সে এ-সব খুব পছন্দ করত না, কিন্তু উপায় ছিল না। কারণ ছোট ভাইয়ের পিছনে বরাভয়দায়িনীর মত মা দণ্ডায়মানা ছিলেন। ওই ছেলেটাকে কোলে নিয়েই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। তাকে কিছু বললেই তাঁর স্বামীশোক উথলিত হ'ত,

সরবে এবং সকরুণ সুরে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শুনিয়ে কাঁদতে শুরু করতেন—"ওগো তুমি আমায় এ কি করে গেলে গো। দেখে যাও, আমার দশাটা তুমি দেখে যাও গো!" তাতেও জ্যেষ্ঠ পুত্র অটল থাকলে তিনি মাথা ঠুকতেন—"এই নে এই নে এই নে।"

বড়দার বিয়ের পর থেকে তার আসা-যাওয়া কিছু বেড়েছিল। মা সব সময়ে বাসায় থাকতেন না। গ্রামের মানুষ। ধান তোলার সময় ধান পোতার সময় মা গ্রামে যেতেন, দেখেশুনে সব করাতেন। ছোট ছেলে তাঁদের মাকুর মত যেত-আসত। আসত-যেত।

সে-আমলের নতুন বউ, এত বড় দেওরকে ভাসুরের মতই খাতির করত। ঘোমটা দিত। ঘাড় নেড়ে কথাবার্তার জবাব দিত। নইলে বাড়ির যে বাসন মাজার ঝি তাকে দিয়ে কথার উত্তর দেওয়াতো।

বাইরে যাই ঘটুক, অন্তরালে আর একটা স্রোত বইত।

এই গান-পাগল বউটি আপন মনে গুনগুন করে গান গাইতো। সে গুনগুন গীতিগুঞ্জব মনুষ্যগন্ধলোলুপ তীক্ষ্ণ-ঘ্রাণ নরখাদকের মত এই দেবরের কান এবং মন দুইকেই আকর্ষণ করেছিল। আরও সে আবিষ্কার করেছিল যে, এই বধূটি ওই তার সুর করে নাটক পড়া অন্তরালে দাঁড়িয়ে শুনতে ভালবাসে।

ভালবাসতো সেটা সত্য কথা। পাশের ঘরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে প্রায় অবশতনু হয়ে শুনত। কারণ ওই লুব্ধ শয়তানটি বেছে বেছে শুধু সে-আমলের বক্তিয়ার খাঁ আর রিজিয়ার প্রেম-নিবেদনের মত বক্তৃতাই পড়ত।

পাষাণ হৃদয় তোর রে পাষাণী—
আমার রক্তাক্ত হিয়া চরণে দলিয়া চলে যাস।
বল বল কতকাল আমি তোর ধাইব পশ্চাতে
লয়ে এই তপ্ত আঁখিজল—
আর তুই শুধু চলে যাবি
ফিরায়ে বদন—।

টুনীর জীবনে দক্ষিণা বাতাসের তৃষ্ণাকে সে কৃত্রিম উপায়ে ঘরে কয়লার উনোন জ্বেলে বাড়িয়ে তুলেছিল। টুনী ক্লান্ত এবং তৃষ্ণায় অধীর হয়ে নিষিদ্ধ দক্ষিণ দিকের দুয়ারটির অর্গল খুলে তাকিয়েছিল সেই দিকে। কখন আপনার অজ্ঞাতে মুগ্ধদৃষ্টিতে এই বক্তৃতাপারঙ্গম দেবরটির দিকে তাকিয়েছিল সেটা দেবর লক্ষ্য করতে ভোলেনি। এবং

একদা দ্বিপ্রহরে তার দাদা যখন ইস্কুলে এবং বধূটি যখন অবশতন্দ্র হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, একটু তন্দ্রা এসেছে, তখনটিতেই দেবরটি বন্ধ ঘরের দরজার ফাঁকে ছুরি ঢুকিয়ে খিল খুলে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অসম্বৃত বধূটির উপর। এবং আক্ষরিক অর্থে ধর্ষণ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পালিয়েছিল।

তার ভয় ছিল, বধূটি বলে দেবে।

কিন্তু না। তা সত্য হয়নি। টুনী বলে দেয়নি। এর যে অর্থ হয়, কর। আমি অর্থ করি টুনী এটা চেয়েছিল। বুভুক্ষুর জীবনে উচ্ছিষ্টের মত বা জাতিপাতের মত খাদ্য পেয়ে সে প্রত্যাখ্যান না করে খেয়েছিল—খেতে চেয়েছিল। কারণ ঐ একদিনেই এর শেষ হয়নি। এই কদাচার চলতেই থেকেছিল এর পরেও। এবং বেশ কয়েক মাস পর এটা আবিষ্কৃত হ'ল। আবিষ্কার করলে বাসার ঝি, তারপর টুনীর সেই বিদ্যানুরাগী স্বামী এম-এ পরীক্ষার্থী এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারটি। কিন্তু তাতে এরা ভয় পেলে না। কারণ তখন দেহভোগবাদে এরা প্রমত্ত। সকলের রক্তচক্ষু এবং সকল দণ্ডবিধানের শেষ এবং চরম দণ্ড —নির্বাসনকে নিজেরাই বেছে নিয়ে হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়িয়েছিল নারীদেহ পণ্যশালায়। এবং কিছুদিনের মধ্যেই টুনী এই পঙ্কতলে মূল বিস্তৃত করে পদ্মফুলের মত ফুটল। গান-বাজনার ক্ষেত্র পেয়ে সে কিছুদিনের মধ্যেই হ'ল কাজলবাঈ—টুনীবিবি।

দেবরটি এবার অসহায় হ'ল। সে নিজেই হ'ল—আপনা থেকেই হয়ে গেল। না হয়ে উপায় ছিল না। খিড়কির দরজা ছাড়া তার বাড়ি ঢুকবার যে অধিকার নেই সেটা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল নিষ্ঠুরভাবে তখন তার আর কিছু করবার ছিল না। এবং তাকে মেনেও নিতে হ'ল। তার জন্য টুনী তাকে ক্ষতিপূরণ দিলে। ব্যবসা করে দিলে। বিয়ে করতে বললে। সংসার পেতে দিলে। তার নতুন বউকে একসেট গয়না গড়িয়ে দিলে। এবং নিত্য রাত্রি তৃতীয় প্রহরে তার পিছন দিকের গৃহদ্বার তার জন্য অবারিত রেখে দিলে।

ঠাকুরদা, আগেই বলেছি—নিত্যই তার বাড়িতে উপঢৌকন পাঠাতো টুনী। কমলা কপি মটরশুঁটি ফলমূল মিষ্টি। তার নিজের ঘরের আয়োজনের অগ্রভাগ পাঠাতো তাকে। এ ছাড়া কাপড়চোপড় জামা এমন কি বউয়ের জন্য স্নো পাউডার পর্যন্ত। বলেছি তো আবিষ্কার যখন করলাম তখন বুঝলাম কলস্বরা জলময়ীতনু জাহ্নবী যিনি

তিনি শিবেরও নন শান্তনুরও নন—তিনি সমুদ্রের। এবং সে সমুদ্রটি একটি অমিতশক্তিধর বর্বর।

হঠাৎ বছর আঠারো পর আর একটা নূতন ঘটনা ঘটল। যে ঘটনায় সব ওলটপালট হয়ে গেল।

মারা গেলেন সেই এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টারটি। তখন তিনি আর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টারও নন। এ্যাসিস্ট্যাণ্ট টীচার। সেকালের সেকেণ্ড মাস্টার। এম-এ পাস করা আর হয়নি তাঁর। মাথার মধ্যেও কেমন যেন সব বিগড়ে গিয়েছিল। কোনমতে ছ'কুড়ি-সাতের খেলা খেলে জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে এরপর তিনি নূতন বিয়ে করে সতর্ক হয়েছিলেন, নিষ্ঠুর শাসন ছিল স্ত্রীর উপর, ছেলেমেয়েদের উপর, কিন্তু অবহেলা ছিল না।

লোকটি হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল। রেখে গেল বিধবা স্ত্রী, বিবাহযোগ্যা এক কন্যা এবং ছ'টি ছেলে। আর তাদের জন্য রেখে গেল সামান্য কয়েক হাজার টাকা আর কয়েক বিঘা জমি।

মেয়েটি বিবাহযোগ্যা। এবং তার বিবাহ হচ্ছে একটি প্রাইমারী ইস্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে যার অর্থ হ'ল মেয়েটিকে ভাসিয়ে দেওয়া।

খবরটা দিলে ওই দেবর। ব্যঙ্গচ্ছলে তার সেই এম-এ পরীক্ষার্থী শিক্ষিত মূর্খ দাদাটিকে ব্যঙ্গ করেই খবরটা দিলে টুনীকে। ভেবেছিল, টুনী একটি উৎসব করবে সেদিন। কারণ সময়ে অসময়ে এই ব্যক্তিটির কথা উঠলে টুনী উগ্র হয়ে উঠত। কখনও কখনও থুথুও ফেলেছে। থু—থু—থু!

মানুষ বিচিত্র, ঠাকুরদা; মাপেতে মানুষ ছ'ফুট সাড়ে ছ'ফুট পর্যন্ত কদাচিৎ হয়, গড়ে সাড়ে পাঁচ ফুট, তার বেশী নয়। কিন্তু মনের মাপে এর নাগাল কোন জরিপের চেনেই পাওয়া যায় না। এমন কি, অঙ্কের হিসেবেও না। ওখানে সব ক্ষেত্রে তুই আর তুইয়ে চার হয় না। তুই থেকে তুই বাদ দিলেও শূন্য হয় না। শূন্য হয়তো পূর্ণ হয়ে যায়। হিসেবে তুমি তাকে মিলাতে পার বা না পার ওই পূর্ণের মূল্যকে তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। ব্যাপারটাতে ঠিক তাই হ'ল। রেশমপোকা যেমন গুটী তৈরি করে তার মধ্যে বন্দী হয় এবং আবার একদিন গুটীকে কেটে বেরিয়ে আসে প্রজাপতি হয়ে, টুনী ঠিক তাই করলে। তার যেন ডানা গজাল, সে আর একরকম হয়ে গেল।

সে চিঠি লিখলে সতীনকে। লিখলে—"আমি তোমার সতীন। আমার কথা তুমি নিশ্চয় শুনেছ তাঁর কাছে। আমার যা হয়েছে, যা আমি করেছি তার পাপ আমার, পরলোকে তার সাজাও পাব। তবে বিশ্বাস করো পাপটা আমার ইচ্ছাতে আমি করিনি। বৃষোৎসর্গের গরুর গায়ে যেমন লোহা তপ্ত করে দেগে দাগী করে দেয় তেমনি করেই আমাকে দেগে দিয়েছিল। দোষও আমি কাউকে দিচ্ছি না। এখন আমার অপরাধটা তোমাকে ক্ষমা করতেও বলছি না। বলছি—মেয়ের বিয়ের জন্যে যা খরচ হবে সেটা আমি ভাই, তোমাকে দেব। তুমি সেটা নাও, নিয়ে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দাও। বিশ্বাস করো, যা দেব তা পাপের টাকা নয়। আমার রেকর্ড আছে তুমি জান, তাতে বেশ টাকা পেয়েছি। তাই দেব।"

সতীনটিকে বুদ্ধিমতীও বলতে পার আবার হৃদয়বতীও বলতে পার। ওর দুটোতেই আমি সমান বিশ্বাসী, ঠাকুরদা। মেয়েটি সতীনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেনি। সে তার দান মান্য করেই নিয়েছিল। ব্যাস্, তাতেই হয়ে গেল। কি যে হয়ে গেল তা কেউ বলতে পারবে না। তবে সকলে দেখলে টুনীবিবি পালটালো। একেবারে পালটালো। দেহ ভাঙিয়ে উপার্জন করা ছাড়লে। শুধু গান করলে মূলধন। আর সতীন, যে তাকে ওই দেবার সুযোগ দিলে সেই সুযোগকে টুনী দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তাদের দিতে শুরু করলে দু'মুঠো ভরে। শেষ তাদের বাড়ি করে দিলে। পাকাবাড়ি।

দেবরটি এবার চমকে গেল। সে আর বরদাস্ত করলে না। সে বললে—না।

টুনী বললে—কি না?

—দিতে পাবে না।

টুনী বিরক্ত হয়ে বললে—তোমায় তো কম দিইনি।

—কম আর বেশী কী! এ সবই আমার। ওদের দেবে কেন?

—না কি? খোকার আবদার তো মন্দ নয়! সব আমার?

এবার চমকে উঠেছিল দেওর। এবং রাগে ফুলে উঠে হাত চেপে ধরে বসেছিল—তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। ভাল হবে না।

—আমাদের পাড়ার খ্যাঁদাগুণ্ডাকে ডাকব নাকি? তাকে মাসে মাসে টাকা দিই সে তো জানো। একবার জোর করে মাথা খেয়েছ আমার, তাতেই বুঝি ভেবেছ চিরকাল তাই চিবিয়ে চলবে? হাত ছাড়ো।

দেবরটি আস্তে আস্তে হাত সেদিন ছেড়ে দিয়েছিল। এবং ঝগড়াটা সেদিন ওখানেই মিটেছিল। একটা নাকি আপসও হয়েছিল। অর্থাৎ টুনীর টাকা-কড়ির কতটা ওই দেওর পাবে তার একটা হিসেব করে মৌখিক কথাও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা নেহাতই মৌখিক। দেওরটি সব কিছু লিখিয়ে নিয়ে তাকে শেষ করবার একটা গোপন মতলব সেইদিন থেকেই ফেঁদে রেখেছিল মনে মনে।

বাইরে নিরীহের মত ভজিয়েই আসছিল টুনীকে।

কিন্তু টুনী তাতে কান দেয়নি। সে দেবেই সতীনের ছেলে-মেয়েকে। ঢেলেই দেবে। সব দেবে। সম্প্রতি একখানা বাড়ি কিনে দিয়েছে এই শহরে।

সেইটেই হ'ল বিস্ফোরকে আগুনের স্পর্শ।

বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে দেবরটি এই কাজটি করে বেরিয়ে গেছে নিরাপদে। খুনের দিন সকালে সে এখান থেকে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপেছে, দুটো স্টেশন গিয়ে নেমে রাত্রে ফিরে টুনীর বুকে টুনীর ছুরি বসিয়ে দিয়ে চলে গেছে—এ শহর থেকেই চলে গেছে। ফিরেছে খুনের পরদিন দুপুর নাগাদ।

পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাকে এ্যারেস্ট করে টুনীর সামনে হাজির করেছিল।

টুনী বলেছিল—ও নয় গো, ও নয়। কতবার বলব—ও নয়—ও নয়—ও নয়!

তারপর চোখ বন্ধ করেছিল।

নির্মলের চিঠির ওখানেই শেষ। শেষের দু'ছত্রে লিখেছে—"ওর বিছানার তোষকের তলায় একখানা উইল পাওয়া গেছে ওর। তাতে ওর যা কিছু আছে দিয়ে গেছে সতীনের ছেলেদের।"

আর লিখেছে নির্মল—ঠাকুরদা, এরপর মেয়েটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছে। আজ বয়স হ'ল অনেক, সাতের ঘরে। অনেক পুরানো যৌবন-আমলের কথা হলেও আজও ভুলতে পারিনি ওকে। ভুলব কি, দিন দিন যেন বেশী ভালবাসছি। তোমার এইসব বিচিত্র চরিত্র পড়তে পড়তে মলির কথা পড়ে এই টুনীর চরিত্রের মালমসলা তোমাকে যোগালাম। খুব ভাল করে ওকে তুমি এঁকে দাও। এইটে আমার আর্জি তোমার কাছে।

আমি নির্মলের উপাদান ছবির ক্যানভাসে চড়িয়ে তুলি হাতে ভাবছি কোন্ রঙে চুবিয়ে কেমন টান দিয়ে শেষ টান দেব ?

ব্যাসদেব পঞ্চকন্যাকে স্মরণ করলে মহাপাতক নাম হয় বিধান দিয়ে পঞ্চকন্যাকে পাশের এলাকা থেকে তুলে দেবী করে দিয়ে গেছেন। আমি তা করব না।

. পাপ-পুণ্যে গড়া ওই টুনী মেয়েটিকে আলোয়-কালোয় এঁকে শুধু শুধু পাপেরই নয়, পাপ-পুণ্য দুই এলাকার বাইরে যে একটি জীবনের এলাকা আছে সেই ক্ষেত্রের একটি মহিয়সী মনোরমা নাম দিয়ে তুলে ধরলাম।

## মেলা

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা দীঘির চারি পাড় ঘিরিয়া মেলাটা বসিয়াছে। কোনও পর্ব উপলক্ষে নয়, কোন এক সিদ্ধ মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণের তিথিই মেলাটির উপলক্ষ।

দোকানীরা বলে, বাবার মাহাত্ম্য আছে বাপু। যা নিয়ে আসবে ফিরে নিয়ে যেতে হয় না কাউকে।

সত্য কথা, দোকানের জিনিসও ফেরে না, যাত্রীর ট্যাঁকের পয়সাও না।

সিউড়ির এক ময়রা নাকি তিন বছর আগে এগারশ টাকা লাভ পাইয়াছিল। গত বছরের মত মন্দা বাজারেও তাহার দু'শ টাকা মুনাফা দাঁড়াইয়াছে। সিউড়ির দোকানের পাশেই লাভপুরের দু'খানা মিষ্টির দোকান। একখানা হরিহরের, অপরখানা রাম সিং-এর। রাম সিং-এর দোকানের পরই পশ্চিম পাড়ের দোকানের সারি পূর্ব মুখে উত্তর পাড়ে মোড় ফিরিয়াছে।

উত্তর পাড়ে মনিহারীর দোকান সারি বাঁধিয়া চলিয়া গেছে। প্রথম দোকান ঘনশ্যাম ঘোষের। ঘনু আপনার দোকানে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। খরিদ্দার তখনও জুটে নাই। রাম সিং-এর দোকান তখন সাজিয়া উঠিয়াছে। মাথার উপর সুন্দর একখানি চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে। নীচে তক্তপোশের উপর পাটাতনের সিঁড়ি। শুভ্র এক-

খানি চাদরে ঢাকা সেই সিঁড়ির উপর হরেক রকম মিষ্টি বড় বড় পরাতে সুকৌশলে সাজানো। বরফিগুলি যেন পাথরের জালি; রঙীন দরবেশের চূড়া উঠিয়াছে। বড় বড় খাজাগুলি শ্বেত পাথরের থালার মত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সম্মুখেই গামলায় রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পান্তোয়া ভাসিতেছে। তারও আগে পথের ঠিক সম্মুখেই মুড়ি-মুড়কি চূড়া দিয়া রাখা হইয়াছে।

বাজারের পথে অল্প দুই-দশটা যাত্রী এদিকে যাওয়া আসা করিতেছিল। তাহাদের উদাসীনতায় ঘনশ্যাম বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পোড়া বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে রাম সিং-এর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

—বিকিকিনি যা-কিছু কাল থেকেই শুরু হবে, কি বল সিং?

রামদাস কহিল—সন্ধ্যে থেকেই লোক জুটবে। আনন্দ-বাজার এবার জমজমাট—দেখেছ তুমি?

ঘনশ্যাম উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল—সে আমি দেখে এসেছি। এবার একশ চৌত্রিশ ঘর এসেছে। চার দল ঝুমুর। মেয়েগুলো দেখতেশুনতে ভালো হে। চটক আছে।

সিংও সায় দিল—হ্যাঁ, গোটা বিশ-পঁচিশেক এরই মধ্যে বেশ। চার-পাঁচটা খুবই খপসুরত।

ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল—কমলি আর পটলি বলে যে দু'জন আছে, বুঝেছ। ফেশান কী তাদের! টেরি-বাগানো ছোকরাদের ভিড় লেগে গেছে এরই মধ্যে।....কি চাই গো তোমাদের?

একজন যাত্রী পথে দাঁড়াইয়াছিল। সে চলিতে শুরু করিল।

সিং কহিল—ডাইস কত টাকায় ডাক হ'ল জান?

অন্যমনস্ক ঘনশ্যাম কহিল—এ্যাঁ? ডাইস? দেড় হাজার।

—কে ডাকলে?

ঘনশ্যাম উত্তর দিল না।

একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছিল। তাহার পিছনে একটি ছয়-সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে। মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরিয়া টানিল। ছেলেটি কহিল, কি?

ঘনশ্যামের দোকানে দড়িতে ঝুলান নাগরদোলায় মেম-পুতুল তখনও দমের জোরে বন বন শব্দে ঘুরিতেছিল। মেয়েটি আঙুল দিয়া পুতুলটা দেখাইয়া দিল। ছেলেটিও দাঁড়াইল। পকেটে হাত পুরিয়া কহিল—আয় আয়, ও ছাই।

ঘনশ্যাম তাহাদের দেখিয়াই গল্প বন্ধ করিয়াছিল। সে কহিল—এস খুকী, এস। পুতুল নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে সে দম দিয়া এরোপ্লেনটা দোলাইয়া দিল। দমের জোরে টিনের প্রপেলারটা ফর ফর শব্দে ঘোরে, এরোপ্লেনটা দোলে, ঠিক মনে হয় এরোপ্লেনটা উড়িতেছে। মেয়েটি আবার কহিল—দাদা?

ঘনশ্যাম ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, এরোপ্লেন নিয়ে যান। দেখুন কেমন উড়ছে।

ঘনশ্যামের কথাবার্তার ভব্যতায় ছেলেটি খুশী হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—কত দাম?

—কিসের? পুতুল, না এরোপ্লেনের?

কথার উত্তর দিতে গিয়া ছেলেটি বোনের মুখপানে তাকাইল; বোনটিও দাদার মুখপানে চাহিয়াছিল।

ঘনশ্যাম আবার প্রশ্ন করিল— কোন্‌টা নেবেন বলুন?

—দুটোই।

—দুটোর দাম দেড় টাকা।

ছেলেটি আর একবার পকেটে হাত পুরিয়া কি ভাবিযা লইল পরমুহূর্তে বোনটির হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—আয় মণি।

সঙ্গে ঘনশ্যাম কহিল—এরোপ্লেনটাই নিয়ে যান খোকাবাবু। দু'জনেই খেলা করবেন। ওটার দাম এক টাকা।

সে হাঁটুর উপর ভর দিয়া খেলনাটার দড়িতে হাত দিয়াছিল।

ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু মেয়েটি গিন্নীর মত দিব্য মিষ্টস্বরে কহিল—না মানিক, আমাদের কাছে এত পয়সা নাই।

একদল বাউল একতারা, গাব্‌গুবাগুব, খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—'রইলাম ডুবে পাঁকাল জলে কমল তোলা হ'ল না।'

পিছনে পিছনে—একদল সংকীর্তনের পুরোভাগে একটি শ্রীমান সন্ন্যাসী নীরবে চলিয়াছে।

ময়রারা বাতাসা ছিটাইয়া দিল। দু'পাশের লোক উঠিয়া প্রণাম করিতেছিল। ঘনশ্যামও উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতাসার লোভে সংকীর্তনের পিছনে পিছনে ছেলের দল কোলাহল করিতে করিতে চলিয়াছিল। তাহাদের পাশে পাশে কয়টা জীর্ণ মলিনবসনা নীচজাতীয়া নারী।

সংকীর্তন পার হইয়া গেল।

মেয়েটি তখনও বলিতেছিল—না বাপু, আমাদের কাছে দু'টি আনি আছে শুধু।

ঘনশ্যাম কহিল—দেখ দেখ, কড়াই দেখ। বড় বড় কড়াই আছে। আঃ যাও না ছোকরা, সামনে দাঁড়িয়ে ভিড় কর কেন?

পিছনে তখন কয়জন যাত্রী দাঁড়াইয়া পরস্পরকে কড়াই দেখাইতেছিল।

মেয়েটির নাম মণি। মণি দাদাকে কহিল—এস দাদাভাই, চলে এস। বকছে ওরা সব।

সিং-এর দোকানে একদল মুসলমান দাঁড়াইয়া মোরব্বার দর করিতেছিল।

সিং বলিতেছিল—চেখে দেখুন আগে, ভালো না হয় দাম দেবেন না আপনি।

দোকানের ফাজিল ছোকরাটা হাঁক দিয়া কহিল—খেয়ে দাম দেবেন, খেয়ে দাম দেবেন। ক্যাওড়া-দেওয়া জল।

মণি দাদাকে কহিল—মোরব্বা খাবে না দাদা?

দাদা মণিকে টানিয়া লইয়া আর একটা দোকানের পটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

সিং তখন বলিতেছিল—কি বলেন! বাসী? ফল কি কখনও বাসী হয় আজ্ঞে?

ছোকরাটা কহিল—চাখ্‌না মিষ্টির দাম যান দিয়ে মশায়। আপনি খারাপ বললেই খারাপ হবে নাকি?

মণি চলিতে চলিতে হাসিয়া দাদাকে কহিল—সবাই তোমাকে বলছে খোকাবাবু। তোমার নাম জানে না কেউ, অমরকেষ্ট বললেই হয়।

—চুপ কর মণি। কাউকে নিজের নাম, বাড়ি বলতে যেয়ো না। চুরি করে পালিয়ে এসেছি মনে আছে তো। খবরদার!

—দিন না বাবু, হিলটা একদম ছেড়ে গেছে, লাগিয়ে দিই।

জুতাপটির পথের দু'পাশে মুচীর সারি বসিয়াছিল। অমরের জুতাটির অবস্থা দেখিয়া একজন ওই কথা বলিল।

অমর কথা কহিল না। গোড়ালি-ছাড়া জুতাটায় সত্য সত্যই তাহার বড় কষ্ট হইতেছিল কিন্তু সম্বলের কথা স্মরণ করিয়া সাহস হইতেছিল না। সে মণির হাত ধরিয়া আগাইয়া চলিয়াছিল। মুচীর

দল কিন্তু নাছোড়বান্দা। অমর যত আগাইয়া চলে, দু'পাশ হইতে তত অনুরোধ আসে—আসুন না বাবু! দিন না বাবু! একদম নতুন বানিয়ে দেব বাবু!

মণি কহিল—কেন বাপু তোমরা বলছ? আমাদের পয়সা নাই—না, আমরা যে বাড়ি থেকে—

অর্ধপথে মণি নীরব হইয়া গেল। দাদার কথাটা তাহার মনে পড়িল।

মুচীটা হাসিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, হিলটা আমি ঠুকে দিই। পয়সা লাগবে না আপনার।

অমরের মাথাটা যেন কাটা যাইতেছিল। সে ঠাস করিয়া একটা চড় মণির গালে বসাইয়া দিল। মণি কাঁদিয়া উঠিল। মুচীটা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মণিকে ধরিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মণি কান্না থামাইয়া কহিল—না না বাপু, ছুঁয়ো না তুমি, অবেলায় চান করতে পারব না।

হঠাৎ চড়টা মারিয়া অমর লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিল না। বেশ গম্ভীরভাবে কহিল—আয় আয় মণি, চলে আয়।

মণি ক্রোধভরে কহিল—যাবে তাই? কিছুতেই যাব না আমি, সবাইকে বলে দোব সেই কথা।

অমর এবার আগাইয়া আসিয়া মণির হাত ধরিয়া কহিল—লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। এস, আবার বাড়ি যেতে হবে।

—মারলে কেন তুমি?

ওদিকে কোথায় ডুম ডুম শব্দে বাজির বাজানা বাজিতেছিল। অমর তাড়াতাড়ি মণিকে আকর্ষণ করিয়া কহিল—আয়, আয়, বাজি দেখিগে আয়।

মণি চলিতে চলিতে সহসা থামিয়া কহিল—মখমলের চটি কেমন দেখ দাদা।

অমর কহিল—আয় আয়। ওর চেয়েও ভালো চটি তোকে কিনে দেব।

মণি কহিল—আর বছরে তো তুমি কলকাতায় পড়তে যাবে। আমাকে এনে দেবে, নয় দাদা?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, দোব।

অমর সিক্সথ ক্লাসে পড়ে।

ভিড় যেন ক্রমশ বাড়িতেছিল।

বড় বড় দোকানগুলির সম্মুখে পথের উপর ছোট ছোট দোকান বসিয়াছে। তাহারা হাঁকিতেছিল—

—শাঁকালু, পালংশীষ !

—পয়সা-বাণ্ডিল বিড়ি বাবু।

—লাঙলের কাঠ নিয়ে যাও ভাই।

একজন যাত্রী বলিল—লাঙলের কাঠ কত করে ভাই ?

—দশ আনা, বারো আনা। খাঁটি বাবলা কাঠ।

লাঙলের দোকানের পাশেই ছোট একটি কাচের কেসে কেমিকেলের গহনা লইয়া একজন বসিয়াছিল। সে কয়জন নিম্নশ্রেণীর দর্শককে ডাকিয়া কহিল—তিন পাথরের আংটি একটি করে নিয়ে যেতে হবে যে দাদা ! বেশী নয়, চার পয়সা করে।

লোক কয়জন চলিয়া গেল না। তাহারা আংটি দেখিতেই বসিল। দোকানদার বলিল—বস দাদা, বস।

লাঠির মাথায় কার, ফিতা, গেঁজে ঝুলাইয়া একটি লোক পথে হাঁকিয়া চলিয়াছিল—চার হাত কার দু'পয়সা, বড় বড় কার দু'পয়সা, রকম রকম দু'পয়সা—জামাই-বাঁধা কার দু'পয়সা। টানলে পরে ছিঁড়বে না, চুল বাঁধলে খুলবে না, না নিলে মন ভুলবে না, দু-দু পয়সা, দু-দু পয়সা।

পটিটার মোড় ফিরিতেই নিবিড় জনতার স্রোত কলরোল করিতেছিল। অমর ও মণি সেই জনতার মধ্যে ডুবিয়া গেল। জনতার গতিবেগ দুইদিকে চলিয়াছিল। একদিকে বাজির বাজনা বাজিতেছিল। সারিবন্দী তাঁবুগুলো দেখা যাইতেছিল। অমর মণির হাত ধরিয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল—ওই দেখ মণি, বাজির ঘর সব। মণি আঙুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

কহিল—কই দাদা ?

আরও পিছনের দিকে চলিয়াছিল জনতার আর একটা প্রবাহ। সন্ধ্যার আলো তখন জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। এই জনতা-প্রবাহের লক্ষ্যস্থানে সমচতুষ্কোণ করিয়া চারিটি বড় ডে-লাইট জ্বলিতেছিল।

উজ্জ্বল আলোক কয়টির চারিপাশে সমচতুষ্কোণ করিয়া ছোট ছোট খড়ের ঘরের সারি, বেষ্টনীর মধ্যের অঙ্গনটি লোকে লোকারণ্য হইয়া আছে। দলে দলে মানুষ চঞ্চল হইয়া অঙ্গনে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থানটায় প্রবেশ করিতেই নানা দ্রব্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি উৎকট গন্ধে মানুষের বুকটা কেমন করিয়া উঠে। মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট, সস্তা এসেন্সের তীব্র গন্ধে বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যে জনতার স্রোত আগের মানুষের ঘাড়ের উপর মুখ তুলিয়া নিবিড়ভাবে ওই ঘরগুলির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বাঙালী, খোট্টা, উড়িয়া, মাড়োয়ারী, কাবুলীওয়ালা, হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল সব ইহার মধ্যে আছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী সব যেন এখানে একাকার হইয়া গিয়াছে।

এইটাই আনন্দ-বাজার অর্থাৎ বেশ্যাপটি।

প্রতি ঘরের দরজায় ছোট ছোট চারপায়ার উপর এক-একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। আর তাহদের লেহন করিয়া ফিরিতেছিল অন্তত পাঁচশ জোড়া ক্ষুধাতুর চোখ। সস্তা অশ্লীল রসিকতায় মুহুর্মুহু উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

এইখানে, তারপর ওই দরজায়, আবার আর একটা দরজায়....মোট কথা, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

মাতালের চীৎকার, আস্ফালনে আকাশের বুকের নিস্পন্দ অন্ধকার পর্যন্ত যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল।

সমস্ত সমবেত কোলাহল ছাপাইয়া মাঝে মাঝে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল জুয়ার আড্ডার উন্মত্ত উল্লাসরোল। অঙ্গনটির ঠিক মধ্যস্থলে আলোটির নীচে জুয়াখেলা চলিতেছে। কোন ঘরে নারীকণ্ঠে অশ্লীল গান আরম্ভ হইয়া গেছে। বাহিরের জনতা সে অশ্লীল গান শুনিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

মানুষের বুকের ভিতরকার পশুত্ব ও বর্বরতা পঙ্কিল জলস্রোতের ঘূর্ণীর মত মুহুর্মুহু পঙ্কিলতর হইয়া এখানে আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

ওদিকে কোথায় শব্দ হইল—ওয়াক ওয়াক!

একটি মেয়ে বমি করিতেছিল। সেই দুর্গন্ধে দাঁড়াইয়াই দর্শকের দল কৌতুক দেখিতেছিল আর দেখিতেছিল অসম্বৃত-বাস নারীর দেহ।

বমির উপর বসিয়াই মেয়েটা গান ধরিয়া দিল—

মরিব মরিব সখি নিশ্চয়ই মরিব।

জনতা হাসিয়া উঠিল—হো-হো-হো

একজন পানওয়ালা হাঁকিতেছিল—মনোমোহিনী খিলি বাবু, মনোমোহিনী খিলি। সে যে-বয়সে খাবে সে সেই-বয়সে থাকবে।

প্রজাপতির মত সুবেশা একটি সুশ্রী মেয়ে অঙ্গন দিয়া যাইতে যাইতে গান ধরিয়া দিল—পান খেয়ে যাও হে বঁধু—

একজন দর্শক সঙ্গীকে বলিল—দেখেছিস ?

অপরজন কহিল—এর চেয়েও ভালো আছে। তার নাম কমলি। ফড়িং বললে আমায়।

মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

প্রথমজন বলিল—কি নাম তোমার ?

মেয়েটি বলিল—চেহারা দেখে নাম বুঝে নাও। কমলিনী ফুলরাণী।—বলিয়া হেলিতে দুলিতে আপন ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

—শোন-শোন। দক্ষিণে—

—সিকি আধুলিতে কমল-মালা গলায় পরা হয় না নাগর। গোটা গোটা।

একজন কহিল—মদ খাবে তো !

—খাওয়ায় কে ? বলি, বকে বকে মুখ তোতো হয়ে গেল। পান খাওয়াও দেখি নাগর !—

একটা ঘরের সম্মুখে কলরোল উঠিয়াছিল।

কোনো বন্ধুর গোপন অভিসার বন্ধুর দল ধরিয়া ফেলিয়াছে। কুৎসিত ছন্দে উলঙ্গ নৃত্যে বর্বরতার পায়ে বীভৎসতার নূপুর বাজিতেছিল।

কমলি বলিতেছিল—টাকা দিলেই নাচতে পারি। পয়সা দিয়ে হুকুম কর, আমি তোমার পায়ের দাসী।

একটা ঘর হইতে একটি প্রায়-উলঙ্গ মাতাল একটি স্ত্রীলোককে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল। মেয়েটিও মাতাল হইয়াছে। পুরুষটি মত্তকণ্ঠে কহিতেছিল—আমায় ভালবাসবি না তুই ? তোর নামে নালিশ করব। ডিফার্মেশন স্যুট !

মেয়েটি কহিল—যা যা যাঃ আমি হাইকোর্ট থেকে উকিল নিয়ে আসব।

সহসা মাতালটার কোন খেয়াল হইল কে জানে, সে মেয়েটিকে

ছাড়িয়া দিয়া কহিল—আমি আর সংসারেই থাকব না। সন্ন্যেসী হব আমি।

স্খলিত কাপড়খানাকে টানিতে টানিতে সে চলিয়া গেল। মেয়েটি নেশার তাড়নায় বসিয়া পড়িয়া তখনও আস্ফালন করিতেছিল—তোকে আমি জেলে দেব। ব্যারিস্টার আনব আমি। কই যা দেখি তুই সন্ন্যেসী হয়ে!

বাজির ওখানে আসিয়াই মণি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওই দেখ দাদা, ওই দেখ!

সে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। ভিড়ে ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবার ভয়ে অমর তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। একটা বাজি-ঘরের সম্মুখে একটা লোক নাক লম্বা মুখোশ পরিয়া নাচিতেছে। পরনের পোশাকটাও তার অদ্ভুত। হাতে এক জোড়া প্রকাণ্ড করতাল।

মণি আবার তাহার জামা ধরিয়া টানিল—ভূত, দাদা, ভূত। ঐ দেখ ভূত আঁকা রয়েছে। অমর উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্য সত্যই সাইনবোর্ডটায় কতকগুলো বড় বড় চামচিকার মতো ভূত নৃত্য করিতেছে। ছবিগুলোর নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, 'ভৌতিক বিদ্যা ও ভোজবাজি'।

অমর চুপি চুপি মণিকে কহিল—জানিস মণি, এটা ভূতের খেলা, দেখবি?

মণি ঘাড় নাড়িয়াই আছে।

অমরের কিন্তু এত সহজে মন স্থির হইল না। অল্প পয়সায় সবচেয়ে ভালো বাজিটা দেখা তাহার ইচ্ছা।

এটার পরই একটা গেরুয়া রঙের তাঁবু। সেটার বাহিরে কিছু লেখা নাই। কিন্তু তাঁবুর মধ্যে অনবরত টিং টিং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছে।

দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটা লোক চীৎকার করিতেছে—এই ফুরিয়ে গেল। চলে এস ভাই। এক পয়সা।

তার পরেরটায় ইংরাজীতে লেখা 'ইণ্ডিয়ান....'। তারপর কি অমর তাহা বানান করিল কিন্তু উচ্চারণ করিতে পারিল না—পি, ইউ, ডাবল জেড, এল, ই।

মণি তখন আবার নাচিতে শুরু করিয়াছে।

—ও দাদা, ও দাদা, নারদ মুনি সায়েব সেজে নাচছে দেখ। অমর ফিরিয়া দেখিল, মণি মিথ্যা বলে নাই। সত্যই বুড়া নারদ মুনির মতো দেখিতে। তেমনি দাড়ি, তেমনি গোঁফ, আবার ফোকলা মুখের সম্মুখে দু'টি নড়বড়ে দাঁত। নারদ মুনি সাহেবের পোশাক পরিয়া বাজনার তালে তালে ঘাড় দোলাইতেছিল আর গোঁফ নাচাইতেছিল। মণি কহিল—চল দাদা, এইটে দেখি ভাই।

অমর তখন পাশের তাঁবুটার সাইন-বোর্ড পড়িতেছিল। 'কাটামুণ্ড অফ বোম্বাই'। একপাশে একটা কবন্ধ, ওপাশে দুইটা মাথাওয়ালা একটা মানুষ, মধ্যে রক্তাক্ত মুণ্ড।

অমরের এই 'কাটামুণ্ড অফ বোম্বাই' দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু আরও ওপাশে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। মণি অমরের হাত ধরিয়া, ওই ব্যাণ্ডের দিকে টানিয়া কহিল—ওই দাদা ইংরিজী বাজনা বাজছে।' আয়, আয়। ওদিকে বড় বড় বাজি আছে।

পিছন হইতে জনতা সকলকে সম্মুখের দিকে ঠেলিতেছিল। নিবিড় জনতার মধ্যে শিশু দু'টি চলিতেছিল ঠিক যেন নদীর স্রোতে অর্ধমগ্ন কুটার মত। বাজির তাঁবুর সম্মুখে একটি পরিসর জায়গায় তাহারা আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বাঁচিল।

প্রকাণ্ড তাঁবুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। একটা মাচার উপর দুজন ক্লাউন নমুনা হিসাবে রিঙের খেলা দেখাইতেছিল। আর একজন ক্রমাগত হাঁকিতেছিল—চল, চল, দো-দো পয়সা।

সহসা বাজনা থামিয়া গেল। বড় ক্লাউনটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিতে আরম্ভ করিল—বাবু লো-ক—

—হাঁ—হাঁ।—ছোট ক্লাউনটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। অমর ও মণি হাঁ করিয়া ক্লাউনদের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি?

—কি ভাবচেন মশা?—ঠিক সম্মুখের লোকটির নাকের কাছে ছোট ক্লাউন হাত নাড়িয়া দিল।

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ছোট ক্লাউন কহিল—যান, ভিতরে যান। ওই দেখুন খেলা শুরু হোয়ে গেল যে।

তাঁবুর সম্মুখের পর্দাটা খুলিয়া গেল। ভিতরে থিয়েটারের রঙ-চঙে স্টেজ দেখা গেল। দর্শক দল একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অমর আঙুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

স্টেজের উপর তখন নর্তকী-বেশী দু'টি মেয়ে দেখা দিয়াছে।

ক্লাউন হাঁকিল—হরেক রকম, রকম রকম দেখবেন। ভিতরে যান, ভিতরে যান। ক'জন ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটা বন্ধ হইয়া গেল। মেয়ে দু'টি ভিতরে তখন গান ধরিয়া দিয়াছে।

আবার ক'জন ঢুকিল।

সহসা পিছনের জনতার মধ্যে কোলাহল উঠিয়া পড়িল—সরে যাও, হাতি—হাতি!

ঠং ঠং শব্দে ঘণ্টা দোলাইয়া জমিদারের হাতি বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। চঞ্চল জনতা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মণির কাপড় ধরিয়া অমর অনেক দূর পর্যন্ত জনতার চাপে চলিয়া আসিল। একটু খোলা জায়গায় আসিতেই কাপড়ে ঝাঁকি দিয়া কে কহিল—কাপড় ছাড় না হে ছোক্‌রা!

অমর সবিস্ময়ে দেখিল—অপরিচিত একজনের কাপড় সে ধরিয়া আছে। সে কাপড় ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুল হইয়া চারিপাশে চাহিল। কিন্তু কোথায় মণি?

শুধু মণি কোথায় নয়, এতক্ষণে অমরের হুঁশ হইল দিন চলিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে কালো আকাশ তারায় তারায় আচ্ছন্ন। চারিপাশে দোকানে দোকানে উজ্জ্বল আলোয় পণ্যসম্ভার ঝকমক করিতেছে।

অমরের কান্না পাইল। মণি! কোথায় মণি!

অমর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। মেলাটা তখন লোকে লোকারণ্য হইয়া গেছে। নিজের কোলটুকু ছাড়া ছোট্ট অমর আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। ধাক্কায় ধাক্কায় জনতার মধ্যে কোথায় সে আসিয়া পড়িল কিছুই বুঝিতে পারিল না।

আনন্দ-বাজারের অঙ্গনমধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত উচ্ছ্বাস তীব্রতম হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল জনতার মধ্যে একস্থানে নাচ-গান চলিতেছিল। অমর বহু কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবাক হইয়া গেল।

একজন পুরুষের গলা ধরিয়া সুশ্রী একটি মেয়ে উন্মত্তার মত নাচিতেছিল। বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খাইতেই পুরুষটি মেয়েটিকে

ছাড়িয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল। উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাস্যে জনতা উল্লাস প্রকাশ করিল।

অমর আর একটা জনতার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে ডাইস খেলা চলিতেছে। পয়সা টাকা জলস্রোতের মত ঝমঝম করিয়া পড়িতেছে। খেলোয়াড় হাঁকিতেছিল—এক টাকা দিলে হু'টাকা, হু'টাকায় চার টাকা।

অমর ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিয়া গেল। আপনার পকেটে হাত দিয়া নাড়িতে আরম্ভ করিল।

কে একজন তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল—খোকা, তুমি জুয়ো খেলতে এসেছ? অমর দেখিল আঠার-উনিশ বছরের একটি খদ্দর-পরা ছেলে, মাথায় গান্ধী টুপি।

জুয়া খেলোয়াড় চটিয়া গিয়াছিল, সে কহিল—কেন মশায় আপনি এমন করছেন? আমি দেড় হাজার টাকা জমিদারকে গুণে দিয়ে তবে খেলা পেতেছি। ধর খোকা, ধর, এক ঘুঁটিতে ডবল, হু'ঘুঁটিতে চার গুণ, তিন ঘুঁটিতে ছ-গুণ পাবে, ধর ধর।

অমর ছেলেটির মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ছেলেটি তাহার হাত ধরিয়া কহিল—এস, আমার সঙ্গে এস। কি, হয়েছে কি তোমার?—পিছনে ডাইসওয়ালা তখন হাঁকিতেছিল—চোরি নেহি, ডাকাতি নেহি। নসীবকে খেলা হ্যায় ভাই। খোদা দেনেওয়ালা। ধর ভাই, ধর।—ভিড়ের বাহিরে আসিয়া ছেলেটি অমরকে জিজ্ঞাসা করিল—কার সঙ্গে এসেছ তুমি? বাড়ি কোথা?

অমর ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল—আমার বোন হারিয়ে গেছে।

সচকিতভাবে ছেলেটি প্রশ্ন করিল—বোন? কত বড় সে? তোমার চেয়ে ছোট না বড়?

—আমার চেয়ে ছোট। ছ'বছর বয়েস তার।

—গায়ে তার গয়না-টয়না আছে নাকি?

—হাতে হু'গাছা বালা আছে শুধু।

—কি নাম তার?

—মণি তার নাম। খুব চালাক সে। পিঠে বিনুনি বাঁধা আছে।

আনন্দ-উন্মত্ত যাত্রীর কোলাহলে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়াছে। নিকটের কথাবার্তা দুই-চারিটা শুধু স্পষ্টভাবে কানে আসিয়া ধরা দেয়।

তাহা ব্যতীত যে শব্দ শোনা যায়, সে যেন বিরাট একটা মধুচক্রের অগণ্য মধুমক্ষিকার গুঞ্জন।

অমর প্রাণপণ চীৎকারে ডাক দিয়া চলিয়াছিল।

বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে ছোট্ট মেয়েটি লোকের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল বাজিকরের তাঁবুর মধ্যে। সেখানে এদিক ওদিক চাহিয়া মণি দেখিল তাহার দাদা নাই। মণির বড় কৌতুক বোধ হইল। দাদা ভারি ঠকিয়া গিয়াছে। সে ঢুকিতে পারে নাই। থাক সে বাহিরে দাঁড়াইয়া। পরক্ষণেই মনটা তাহার কেমন করিয়া উঠিল। আহা—দাদা দেখিতে পাইবে না যে!

মণি দাদাকে ডাকিতে ফিরিল। কিন্তু সে অবসর আর তাহার হইল না। ঠং ঠং শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিল স্টেজের উপর একটা ঘোড়া পিছনের দু'পায়ে দাঁড়াইয়া নাচিতেছে। মণি অবাক হইয়া গেল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! কুকুরে ডিগবাজি খায়, বাঁদরে ঘোড়ায় চড়ে, টিয়াপাখীতে বন্দুক ছোঁড়ে! একটা লোক আবার সং সাজিয়া কত রঙ্গই দেখাইয়া গেল, মণির হাসি আর থামে না।

ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া স্টেজের উপর পর্দা পড়িয়া গেল। খেলা শেষ হইল। জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মণি বাহিরে আসিয়া চারিদিক দেখিল, দাদা তো নাই! কয়েক মুহূর্ত মণি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সে জনতার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ভারি দুষ্টু তাহার দাদাটা!

দূরে নাগরদোলা ঘুরিতেছিল। মণি সেই দিকে চলিল। ওইখানে সে নিশ্চয় আছে। তাহাকে ফাঁকি দিয়া সে নিশ্চয়ই নাগরদোলায় চাপিয়াছে!

পথে একটা দোকান, দোকানী হাঁকিতেছিল—চলে এস ভাই, চলে এস। কাবাব রুটি। গোস্ পরোটা! চিংড়ি-কাঁকড়া,—এই এই, ভিড় ছাড়, ভিড় ছাড়!

ভিড় কমিল না। লোকটা অকস্মাৎ অতি বিকট চিৎকারে বলিয়া উঠিল—এই বড় বাঘ!

মণি চমকিয়া উঠিল। আর্তস্বরে সে ডাকিয়া উঠিল—দাদা!

আবার পিছন দিক হইতে রব উঠিল—এই সরো, এই সরো।

কে কহিল—এই সরোই বটে রে বাবা—গাড়ি আসছে, গাড়ি আসছে।

জনতা দুই পাশে বিভক্ত হইয়া জমাটভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। ভিড়ের মধ্যে যে কেমন করিয়া কোন্ দিকে চলিয়াছিল তাহা মণি বুঝিল না। যখন সে হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইল তখন দেখিল তাহার চারিপাশে অন্ধকার আর মেলার বাহিরে একটা খোলা মাঠে সে দাঁড়াইয়া আছে।

পিছনে দোকানের পর্দায় ঢাকা আলোকোজ্জ্বল মেলাটা বিপুল কলরবে গম্‌গম্ করিতেছে। উপরে নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের নীচে মেলার উৎক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি সাদা কুয়াশার মত জাগিয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে চারিপাশে দূরে দূরে কাহারা চলিয়াছে। কে যেন তাহার দাদার মত হুইসিল বাঁশী বাজাইতেছে মণি চীৎকার করিয়া উঠিল—দাদা!

দূর মাঠ হইতে কে একজন উত্তর দিল—দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইক ঘরে, দাদা গেছে বৌ আনতে ওপারের চরে।

মণি বিষম রাগে তাহাকে গালি দিল—মর, মর, মর তুমি।—কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করিল। সম্মুখেই খড় দিয়া ঘেরা ছোট ছোট ঘরের সারি। ঘরগুলার অন্ধকারময় পিছন দিকটা দেখা যাইতেছিল। পাশে সম্মুখের দিক উজ্জ্বল আলোয় আলোকময় হইয়া আছে।

মণি আসিয়া আলোকিত জায়গাটার ভিতরে যাইবার রাস্তা খুঁজিল, রাস্তা নাই। তবে ঘরগুলির পিছন দিকে একটি করিয়া দরজা রহিয়াছে। মণি একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারিল।

সঙ্গে সঙ্গে কে বলিয়া উঠিল—কে? কে?

মণি তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। ঘরের মধ্য হইতে কে আবার বলিল—চোর, চোর নাকি?

মণি এবার কাঁদিয়া ফেলিল। ততক্ষণে ঘরের মেয়েটি বাহিরে আসিয়া মণির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—কে রে?

মণি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটা দেশলাই জ্বালিয়া সে মণির মুখের সম্মুখে ধরিল; মণির ফুটফুটে মুখখানি দেখিয়া মেয়েটির মুখ-চোখ কোমল হইয়া আসিল। মণিরও ভয়ার্ত ভাব যেন কাটিয়া গেল, যে তাহাকে ধরিয়াছিল সেও বড় সুন্দর।

মেয়েটি মণিকে জিজ্ঞাসা করিল—কাঁদছ কেন খুকী ?

তাহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া মণি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—আমি যে দাদাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

গভীর স্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া মেয়েটি কহিল—ভয় কি? তুমি কেঁদো না। সকালেই তোমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দেব।

—রাত হয়ে গেছে যে।

—হোক না, তুমি আমার কাছে থাকবে আজ।

মণিকে বুকে করিয়া মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ওদিকের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে কে ডাকিতেছিল—কমলমণি, কমলমণি।

আবার একজন কহিল—এ ঘরের লোক কই গো।

মণিকে বিছানায় বসাইয়া দিয়া মেয়েটি কহিল—বস তো মা একবার।

তারপর রুদ্ধ দ্বারটা খুলিয়া দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া কহিল—কি' চেঁচাচ্ছ কেন ?

কে একজন কহিল—পুজো করব বলে।

জনতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মেয়েটি দুয়ার টানিয়া দিল।

বাহির হইতে আবার কে কহিল—শুনচ! কমল!

কমলি কহিল—অনেক নরকের দোর তো খোলা রয়েছে, যাও না আমি পারব না!

—একবার শোনই না!

কমলি কহিল—বেশী উপদ্রব করলে পুলিস ডাকব আমি।

মণি আবার ভয় পাইয়া গিয়াছিল, সে চুপি চুপি কাঁদিতেছিল।

কমলি তাহার গায়ে গভীর স্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল—কেঁদো না খুকী, কেঁদো না।

মণি কান্নার মধ্যেই কহিল, আমার নাম তো খুকী নয়, আমার নাম মণি—

—মণি! তা হ্যাঁ মা মণি, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে ?

—হ্যাঁ।

ঘরের কোণের একটা হাঁড়ি হইতে কচুরী-মিষ্টি বাহির করিয়া কমলি মণির হাতে দিল।

তাহার মুখপানে চাহিয়া মণি কহিল—তোমাকে কি বলে ডাকব ?

কমলি যেন অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল—মা।

মণি কহিল—না, মা যে আমার ঘরে আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি জল গড়াইতে বসিল। মণি কহিল—তোমায় আমি মাসী বলব, কেমন ?

জল গড়ানো রাখিয়া দিয়া মেয়েটি মণিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, মাসী মা—মাসী মা—

মণি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাসীমার সহিত মণির নিবিড় পরিচয় হইয়া গেল। মায়ের কথা, বাবার কথা, দাদার কথা, বুড়ো দাদুর কথা, ছোট বোনটির কথা পর্যন্ত বলিতে সে বাকী রাখিল না। এমন কি সেই দুষ্টু দোকানীটার কথা পর্যন্ত বলিতে সে ভুলিল না। এরোপ্লেন, নাগরদোলা, পুতুল দু'টি কত ভালো তাহাও সে বলিল। মখমলের চটিও কেমন, তাও অপ্রকাশ রহিল না।

কমলি মণির মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। ছোট্ট ফুটফুটে মুখখানি তাহার বড় ভালো লাগিতেছিল।

সহসা সে কহিল—তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাক তো মণি। আমি একটু ঘুরে আসি। কেঁদো না যেন, বেশ!

মেয়েটি চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ কক্ষে বাহিরের কোলাহল প্রচণ্ডরূপে শিশুর কানে আসিয়া বাজিতেছিল। মণি ভয়ে একখানা কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

পিছনের দরজা ঠেলিয়া কমলি ফিরিয়া আসিল, মৃদুস্বরে ডাকিল —মণি!

মুখ হইতে কম্বলের আবরণটা সরাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া মণি সাড়া দিল—উঁ:

কমলি আঁচল হইতে কতকগুলা জিনিস বাহির করিয়া দিল। মণি সাগ্রহে একেবারে সমস্তগুলা কাছে টানিয়া লইল। এরোপ্লেনটা ঠিক তেমনি, বোধ হয় সেইটাই! নাগরদোলার পুতুলটা কিন্তু সেটার চেয়েও ভালো। মখমলের চটিটা নতুন ধরনের।

কমলি জিজ্ঞাসা করিল—পছন্দ হয়েছে মণি ?

মণি ঘাড় নাড়িল। কমলি সাগ্রহে কহিল—একটি চুমু দাও দেখি তবে।

মণি গাল বাড়াইয়া দিল। চুমা দিয়া মণিকে বুকে ধরিয়া কমলি কহিল—তোমার মা ভালো, না আমি ভালো?

একটুক্ষণ ভাবিয়া মণি উত্তর দিল—মাও ভালো, তুমিও ভালো।

কমলি একটু হাসিল।

মণি সহসা কহিল—তুমি বিড়ি খাও কেন মাসী? মা তো খায় না।

মেয়েটির মুখ যেন কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মণির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারিয়া কহিল—ঘুমোও দেখি দুষ্টু মেয়ে।

মণি কহিল—তুমি শোও।

হাসিয়া কমলি মণিকে বুকে টানিয়া শুইয়া পড়িল।

মণির চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। কমলি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

পিছনের দরজার বাহিরে কে তাহাকে ডাকিল—কমলি!

কমলি উঠিতে উঠিতে আহ্বানকারী আগড় ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

কমলি কহিল—মাসী!

আগন্তুক মেয়েটি কহিল—হ্যাঁ। ঘরে শুয়ে রয়েছিস যে? কি হয়েছে তোর? এর পর কিন্তু টাকা দিতে পারব না বললে আমি শুনব না। জমিদারের টাকা আমাকে গুণতে হবে।

কমলি কোনো উত্তর দিবার পূর্বেই আবার সে কহিল—ও কে লো? কার মেয়ে?

কমলির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল—জানি না।

—কারুর হারানো মেয়ে বুঝি? কোথায় পেলি?

—ঘরের পেছনে।

—কেউ জানে?

বিবর্ণ মুখে ঘাড় নাড়িয়া কমলি জবাব দিল—না।

—বেশ, তবে ভোরের আগেই ওকে সরিয়ে দিতে হবে। সরকারকে বলে আসি আমি। ভালো করে আগড়টা সরিয়ে দে।

ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধা বাহির হইয়া গেল। কমলি আগড়টা আঁটিয়া দিতে গিয়া আগড়ে হাত রাখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। মাসী ইঙ্গিতে যেকথার আভাস দিয়া গেল সেকথা সে ভাবিতেও পারে নাই। সে

শিহরিয়া উঠিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ওদিকে বাহিরের কোলাহল ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল। দুই-একটা উচ্চ জড়িত কণ্ঠের শব্দ বা কাহারও আহ্বানের শব্দ শুধু শোনা যায়। বাজি, সার্কাসের বাজনা নীরব হইয়া গেছে।

কমলি পিছনের আগড় খুলিয়া একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার থম থম করিতেছে। পথিকের আনাগোনাও বিরল হইয়া আসিয়াছে।

কমলি আবার ঘরে ঢুকিল। তারপর একমুহূর্ত সে বিলম্ব করিল না। মণিকে সে বুকে তুলিয়া লইল। আঁচলে সেই খেলনাগুলি জড়াইয়া পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সে মাঠের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

## কালো-বউ

হঠাৎ কেন এবং কেমন করে কালো-বউকে মনে পড়ল বলতে পারি না। কিন্তু পড়ল। যে-মানুষের সঙ্গে দীর্ঘকাল যোগাযোগ নেই, দেখাশুনো নেই, যার সঙ্গে জীবনের কোন স্বার্থের বা কোনক্রমে কোন কাজকর্মের কোনরকম বাঁধন নেই—বা যে-মানুষ কতদিন আগে ম'রে গিয়ে বিস্মৃতির দহে তলিয়ে গেছে—সে-মানুষ হঠাৎ অকারণে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে কেন—এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। হয়তো পণ্ডিতেরা মনঃসমীক্ষা ক'রে বলতে পারেন, অন্তত একটা উত্তর বের ক'রে দিতে পারেন—সে পছন্দ হোক বা নাই হোক। কিন্তু এত বিতর্কে না-গিয়ে এ-কথা সংশয় এবং দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, লোকটি বাইরে থেকে আসেনি, মনের ভেতর থেকেই হঠাৎ জেগে উঠে বেরিয়ে এসে উঁকি মেরেছে। আমার মনের ঘরে তার একটা দখলী ঠাঁই আছে; তার নিজের স্বত্ব বলে—সৃষ্টি-সংসারের চরম-আদালতে পাওয়া ডিক্রী থেকে কায়েমী স্বত্বে সে সেটার উপর দখলীকার হয়ে আছে।

মানুষের জীবনের অদেখা রাজ্যে একটা এলাকা আছে, সে-এলাকায় বিচিত্র মানুষেরা নিষ্কর-স্বত্বে বসবাস করে; তাদের উপরে আমার কোন হাত নেই—না পারি তাদের এলাকা বাড়িয়ে দিতে না পারি কমিয়ে দিতে বা উচ্ছেদ করতে।

যে কালো-বউকে হঠাৎ মনে পড়ল সেই কালো-বউই এর সব থেকে সেরা দৃষ্টান্ত। কালো-বউকে দেখেছি ছেলেবেলা থেকে। কালো-বউ-মারা গেছে, সেও হ'ল প্রায় কুড়ি বছর। আমার বয়স তখন আটচল্লিশ ঊনপঞ্চাশ। একটা দূরসম্পর্ক ছিল—সে বউদি আমি দেওর। আমার থেকে প্রায় দশ বছরের বড়।

কালো-বউ নামে কালো-বউ; কিন্তু একরাশ কালো চুলের পট-ভূমিতে সোনার মত গায়ের রঙ, বড় বড় দুটো চোখ, নাকটি খানিকটা খেঁদা-খেঁদা, ঠোঁট দুটি একটু মোটা, পুরুষ্ট—টুকটুকে ফলের মত। গালে টেপা গোটা-দু-তিন দোক্তা-মিশানো পান, পরনে ফিতেপেড়ে কাপড়, খালি হাত। সব নিয়ে সে যা ছিল, তাতে সে কালো-বউ ছিল না। আসলে তার স্বামীর ডাকনাম ছিল 'কালো'—কালোবরণ, তাই লোকে বলত—কালোর বউ। তা থেকে কালো-বউয়ে পরিণত হয়েছিল। কালো-বউয়ের আরো নাম ছিল; আড়ালে লোকে বলত—কলঙ্কিনী কালামুখী; সামনে বলত আমের শাখা অর্থাৎ সর্বঘটে আমের শাখা; সখীরা সমবয়সীরা বলত—দেখন-হাসি।

কলঙ্ক তার সত্য কি না বলতে পারব না। সুতরাং কালামুখী নামটা নিয়েও কিছু বলব না, তবে বাকী সব ক'টা নামই সত্য—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। গ্রামে যে আসরই বসুক না, সে যাত্রাগানের হোক, খেমটা নাচের হোক—এমন কি সে-আমলে কংগ্রেসের মিটিং হোক—কালো-বউ সব থেকে আগে সামনে আসর জাঁকিয়ে বসতেন। এছাড়া মেয়ের বিয়ের বাসরে, ছেলের বিয়ের ফুলশয্যার আসরে—সেখানেও কালো-বউ সর্বাগ্রে থাকতেন, বরের কোলে (সে-আমলে) কনেকে বসাতেন, কনের ঘোমটা খোলাতেন, তাদের গান গাওয়াতেন, তিনি নিজে গাইতেন, দরকার হলে নাচতেনও। এছাড়া কার বাড়িতে মেয়ের পাকা দেখা, কার বাড়িতে শখের খাওনদাওন, কার বাড়িতে নতুন জামাই ফিষ্টি দিচ্ছে, কার বাড়িতে মেয়ের বা বউয়ের সাধের খাওয়া খাচ্ছে সেখানে রান্নাশালে কালো-বউ আছেনই। সে একেবারে ময়দায় জল দেওয়া থেকে মাছের খান করানো থেকে রান্না সেরে খাইয়ে-দাইয়ে হাত না ধুয়ে—খুব একচোট হেসে ভেঙে পড়ে ফিরতেন কিছু খাদ্য হাতে নিয়ে।

গঙ্গাস্নানে যাবে যাত্রীরা দশহরায়—সর্বাগ্রে থাকতেন কালো-বউ। মেলা দেখতে যাবে—সে সদর শহরে—কৃষি প্রদর্শনীর মেলা

পর্যন্ত, সেখানেও তিনি সর্বাগ্রে। এবং সামান্য যে-কোন কথায় হাসি আরম্ভ হ'ত—খিল-খিল-খিল, সে যেন নিখিলবিশ্ব কাঁপত তাঁর দেহের কাঁপনের সঙ্গে।

আমার বিয়ের বাসরেও কালো-বউ ছিলেন, ফুলশয্যার রাত্রেও ফুলশয্যার ঘরে কালো-বউ ছিলেন। আমার বিয়ে হয়েছিল গ্রামে। প্রায় পাশাপাশি বাড়ি। বাসরে বউয়ের সম্পর্কে তিনি খুড়ী-টুড়ী হতেন, কিন্তু বাসরে ঢুকেই বললেন—এই দেখ ভাই, কেউ যেন পেঁতে খুলে বসো না। আমি ভাই কারুর কিছু হই না। কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমি কালো-বউ, শুধু কালো-বউ; নাচতে জানি, গাইতে জানি, হাসতে জানি, ভাসতে জানি—কাঁদতে জানি না। থিয়েটার বিরহপালায় গান শুনেছ গোলাপীর। "হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়, কে জানে কার কখন সন্ধ্যে হয়।" সেই যে রাধা ভটচাজ গোলাপী সেজে কোমরে কলসী নিয়ে নেচে নেচে গাইত—। না দেখেছ তো দেখ—দাও না হে একটা কলসী দাও না।—

কলসী কালো-বউ নিয়ে এসেছিলেন। বাইরে রাখা ছিল। ভেবেচিন্তে বন্দোবস্ত করেই বাসরে ঢুকেছিলেন।

বলেই গান শুরু করেছিলেন। কলসী কাঁখে দাঁড়িয়ে নাচের ভঙ্গি করেছিলেন।

আবার আমার ফুলশয্যার দিন আমার ঘরে একমুখ হাসি নিয়ে ঢুকে বলেছিলেন—এটা কি হ'ল? বলি হ্যাঁ হে, এটা কি—হ'ল?' কাজটা ঠিক হ'ল? কই বল, তুমি আমাকে বিয়ে করবে বল নাই; বল? আমি ভাই এত আশা করে রয়েছি—তারা মন্দোদরীর মত —দেওর আমার বড় হলে তাকে বিয়ে করব। শেষে এই?

কথাটা পরিষ্কার করে বলি। কালো-বউ বিধবা হয়েছিলেন অল্প বয়সে। যখন আমার বিয়ে হচ্ছে তখনই তাঁর বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ অর্থাৎ পূর্ণ যুবতী, তার উপর সন্তানহীনা বন্ধ্যা, তাঁর রূপ-যৌবন তখন ঝলমলে গৌরবে সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত। এর আগে যখন আমার বয়স পাঁচ-সাত এবং যখন বউদির বয়স ষোলো-সতেরো (তখন তিনি সধবা, কালোদা তখন জীবিত) তখনই বউদি আমার সঙ্গে বর-কনে সম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন। আমি নিতবর ছিলাম তাঁর বিয়েতে।

কালো-বউয়ের এই বর-কনে সম্পর্ক একলা আমার সঙ্গে পাতানো ছিল না। তাঁর যত পাঁচ-ছ'বছরের দেওর ছিল, তাদের সঙ্গে

পাতিয়েছিলেন। এবং পরে যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, ততদিনই যত পাঁচ-সাত বছরের নাতি পেয়েছেন সম্পর্কে, সবার সঙ্গে বর-কনে সম্পর্ক পাতিয়েছেন। দেখা হলেই ওই পাঁচ বছরের নাতি-বরকে কোলে করেছেন। এবং থুত্‌নি ধরে গান গেয়েছেন।

কালো-বউয়ের আর একটি গুণ ছিল, তাঁর যেমন মিষ্টি গলা ছিল, তেমনি তিনি গান বাঁধতে পারতেন নিজে, নাতি-বরকে কোলে নিয়ে থুত্‌নি ধরে গান গাইতে গিয়ে কত যে দু'কলি তিনকলি গান বেঁধেছেন, তার হিসেব কেউ রাখেনি। কয়েকটা গানের দু'কলি-তিনকলি এখনও মনে আছে আমার। আমাকে কোলে নিয়ে একবার গেয়েছিলেন—"ও আমার সোনার নাগর কোথা তোমায় বসাই বলো—বুকের মাঝে তুফান উঠে টলোমলো হৃদ্‌কমলো! কোথা হায় বসাই বলো।" আর একটা গান মনে আছে—"বঁধু হে করলে একি? চোখে যে ঘুম আসে না, স্বপনে তোমায় দেখি। ছি-ছি বঁধু করলে একি?"

এছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে গান বাঁধতেন তিনি। রজনী নামে একটি ছেলে একটি মেয়েকে লোকজন নিয়ে বাড়ি থেকে তুলে এনে জোর করে বিয়ে করেছিল, ফলে তাই নিয়ে মামলা-মকদ্দমা হয়েছিল। তাতে গান বেঁধেছিলেন,—"একি বিয়ে করলি রজনী? শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। বাসর হবে জেলখানাতে, ঘুরে হায় টানবি ঘানি।" এমনিতরো অনেক গান কালো-বউ বেঁধেছিলেন, সে-সব তাঁর স্মৃতিতেই ছিল, সে-সব তাঁর সঙ্গেই সমাধিস্থ বা ভস্মের কালস্রোতে ভেসে চলে গেছে।

এখন শুনি আমার বয়সী প্রবীণারা বলেন—কালো-বউ তাঁদের কাছে এমন অনেক গান গাইতেন এবং এমন ভঙ্গিতে নাচতেন যার কথা বলতে এই ষাটের উপর বয়সেও তাদের মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে-কালে তার আভাস যে পাইনি, তা নয়। পেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিয়ে কিছু বলতে পারা সহজ ছিল না। তবু আমার সুযোগ হয়েছিল। আমি একবার বলেছিলাম, বলেছিলাম ঠিক নয়, এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম।

তখন তিনি প্রবীণা হয়েছেন, বয়স তখন পঞ্চান্ন বছরের কাছে, তবু তখনও এই বন্ধ্যা বিধবাটির রূপ ও দেহ বয়সের মতো ম্লান বা বিষণ্ণ হয়নি। কষকষে কালো চুলের মধ্যে কিছু কিছু রূপোলী চুল ঝিক্-মিক করছে, কপালে গালে একটু-আধটু কালচে ছোপ যেন ধরছে-

ধরছে। আমার বয়স তখন ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ। সাহিত্যের আসরে খ্যাতি হয়েছে। এবং সাহিত্য থেকে আমি উপার্জন করি। অনেক বই বেরিয়েছে। থাকি কলকাতায়। একবার বাড়ি গিয়েছি, খবর পেয়ে তিনি এসেছিলেন। দেখতে এসেছিলেন।

আমি হেসে উঠে তাঁকে প্রণাম করেছিলাম, বলেছিলাম—ভাল আছ ?

কালো-বউদি গান গেয়েছিলেন—সেই পুরনো দিনের মত থুত্নি ধরে—মুখপানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গেয়েছিলেন—

"তোমার কুশল শুনি। তোমার ভালয় আমার ভাল—তোমার কুশল বল হে শুনি।"

তারপর হেসে থুত্নি ছেড়ে বললেন—ব্রজ বলে মনে পড়ল ? তারপর বলেছিলেন—বলি হ্যাঁ হে, তোমার এখন খুব নাম তো শুনি। খুব নাকি ভাল লেখ। বই লেখ, গল্প লেখ। বলি, গানটান লিখেছ ? —গান শোনাতে পার ?

বলেছিলাম—পারি বউদি, রেকর্ড হয়েছে, শোনাতে পারি।

—শোনাও দেখি।

আমি 'কবি' ফিল্মের গানগুলির রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম।

—ও আমার মনের মানুষ গো,
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর।
রোদের ছটায় ঝিকিমিকি তোমার ইশারা
আমায় হেথা টানে নিরন্তর।

গানখানা শুনতে শুনতে চোখ ছুটো দপ্-দপ্ করে উঠল তাঁর। আমার হাতখানা চেপে ধরলেন।

গান শেষ হলে বললেন—ভাল গান। খুব ভাল।

শেষ গান "এই খেদ আমার মনে মনে—ভালবেসে মিটল না আশ —পূরিল না এ জীবনে—হায় জীবন এত ছোট ক্যানে এ-ভুবনে।"

শুনে ফট্ করে যেন কেঁদে ফেললেন। কবি বইখানা পড়তে নিয়েছিলেন। ফিরে দেবার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভেবে ভেবে লিখেছ ? না—। হেসে ইশারা করে বলেছিলেন—ভালবেসেছ এমনি করে ? বলেছিলাম—লোক পাইনি বউদি।

—তাহলে আমারই মত। দূর দূর দূর !

তারপর হঠাৎ সেই কালো হাসি হেসে হাসিতে ভেঙে পড়ে বললেন

—আঃ হায় হায় হায় দেওর—আমার জন্মটাও তাই হে, ভালবাসার লোক পেলাম না!—বলে বললেন—আমি একটা গান বেঁধেছিলাম, শোন—

এমন যৌবন রূপ আমি তুলে দিতে
মানুষ পেলাম না।
মাটিতে সব ঢেলে দিলাম বাকী ফেললাম দাম
নিলাম না!

ওই বউদির সঙ্গে শেষ দেখা। তারপরই তিনি মারা গিছলেন। আজ হঠাৎ তাঁকে মনে পড়ে গেল। কবি বইখানা ওল্টাচ্ছিলাম, মনের ভিতর থেকে কালো-বউদি তাঁর কায়েমী স্বত্বের এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন।

●